মাসুদ রানা

প্রবেশ নিষেধ

কাজী আনোয়ার হোসেন



দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

প্রবেশ নিষেধ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

গোপন এক অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে অতি সন্তর্পণে অ্যামস্টার্ডামের শিফল এয়ারপোর্টে নামল রানা।
কিন্তু মাটিতে পা দিয়েই টের পেল সে প্রতিপক্ষের ক্ষমতা।
টের পেল, ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছে ওরা।
টের পেল, শুধু আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারীই নয়, ড্রাগরিঙের পিছনের আসল ব্যক্তিটি ভয়ঙ্কর এক ম্যানিয়াক—ধ্বংস আর মৃত্যু যার আনন্দের একমাত্র খোরাক।
অনুভব করল, সর্বক্ষণ রাখা হয়েছে ওকে নিঃশব্দ পিস্তলের মুখে।
জলে নেমে কুমীরের সাথে বিবাদ বেধেছে রানার।
মাঝ-নদীতে। একটা নয়, অসংখ্য কুমীর—ও একা, ফলে পাগলের মত একের পর এক মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হচ্ছে ওকে।
যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যা খুশি।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

প্রবেশ নিষেধ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

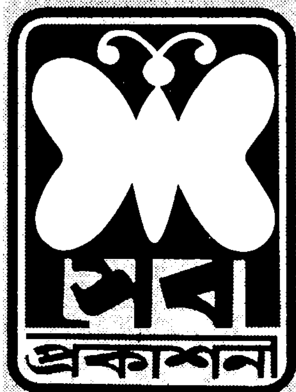




সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7044-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫
রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
-mail. alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩
Masud Rana
PROBESH NISHEDH
Part: I & II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain



আটান্ন টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ংকর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা!+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইনকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

প্রবেশ নিষেধ-১

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭৫

এক

বিশাল ডানা মেলে কে এল এম ডিসি এইট নেমে এল শিফল এয়ারপোর্টের রানওয়ের ওপর, মাইল দেড়েক দৌড়ে গতিটা একটু সামলে নিয়ে ধীরে সুস্থে এসে দাঁড়াল এয়ারপোর্টের টারমিনাল বিল্ডিং ঘেঁষে। শেষবারের মত ছোট্ট গর্জন ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন।

সবার আগে সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল রানা। সোহানা চৌধুরী এবং তার পাশে বসা, তারই মত চোখা সুন্দরী মারিয়া ভুক্লজের দিকে একটি বারও না চেয়ে হালকা এয়ার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সে এগজিট লেখা দরজার দিকে। যেন চেনেই না ওদের।

স্টুয়ার্ডেসের মিষ্টি হাসির প্রত্যুত্তরে যতটা না হাসলেই নয় সেটুকু হেসে ডিজএমবার্কেশন টিউবে উঠে পড়ল রানা। হাসি আসছে না ওর। কয়েকটা দুশ্চিন্তা এক সঙ্গে ঘুরছে মাথার মধ্যে। প্রথমত, সোহানা এবং মারিয়া এই দুই বোঝা দুই কাঁধে চেপে যাওয়ায় যার-পর-নাই বিরক্ত হয়েছে সে মনে মনে, কিন্তু কিছুই বলার উপায় নেই—একজনকে চাপিয়েছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান, অপরজনকে ইন্টারপোলের নার্কোটিকস ডিভিশনের কট্টর চীফ ফিলিপ কার্টারেট। এঁরা মনে করেছেন রানার এবারের বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে ডাইভার্শন তৈরি করতে হলে দুজন মেয়েকে সাথে নিয়ে যাওয়া ওর একান্ত দরকার। দুই সুন্দরীই জীবনের প্রথম পা রাখছে অ্যামস্টার্ডামের মাটিতে। প্রতি পদে কাজে বাধার সৃষ্টি করবে এরা, সুবিধের চেয়ে অসুবিধে যে কত বেশি হবে নিজে বুঝতে পারছে রানা পরিষ্কার, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারেনি সে দুই বুড়োর একজনকেও। এদের দুজনই কাজ করছে ড্রাগসের ওপর বেশ কয়েক বছর ধরে, তথ্যের দিক থেকে এরা একেকজন তিনটে মাসুদ রানার সমান জ্ঞান রাখে। কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে জ্ঞান··· যাকগে, মেনে যখন নিতেই হবে, মেনে নিয়েছে রানা—আসল কাজের সময় এদের কিভাবে দূরে সরিয়ে রাখবে সে প্ল্যানও ঠিক করে নিয়েছে আগেই; আসল দুশ্চিন্তা এরা নয়, ইসমাইলের পাঠানো কোডেড মেসেজটা। রওয়ানা হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পেয়েছে মেসেজ: বিশেষ জরুরী কিছু তথ্য নিয়ে অপেক্ষা করবে ইসমাইল শিফল এয়ারপোর্টে। মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো নাকি রানার দরকার, এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পরিবর্তন করা দরকার প্ল্যান-প্রোগ্রাম। এই রকম একটা মেসেজের আগামাথা

কিছুই বুঝতে পারেনি রানা, তবে এর মধ্যে একটা জরুরী ভাব যে রয়েছে সেটা অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি ওর। কি আবার ঘটল এখানে যার জন্যে বারণ সত্ত্বেও এইভাবে এয়ারপোর্টে দেখা করতে চাইছে ইসমাইল ওর সঙ্গে? এইভাবে রানাকে এক্সপোজ করে দেয়ার ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে কেন লোকটা?

ইসমাইলের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন রকমের কোন সন্দেহ নেই রানার। ঘুঘু লোক সে। গত তিনটে মাস ধরে কাজ করছে সে অ্যামস্টার্ডামে রানার সুবিধের জন্যে কিছুটা গ্রাউন্ডওয়ার্ক করে রাখবার জন্যে। একটা মাস চুপচাপ থেকে হঠাৎ কি এমন জরুরী তথ্য পেয়ে গেল লোকটা যে গোপনীয়তার ইস্পাৎদৃঢ় নিয়ম ভঙ্গ করবার দরকার হয়ে পড়ল ওর? যোগ্যতা আছে ঠিকই, কিন্তু ভুলও তো মানুষের হয়—রানার ভয়টা ওখানেই। এই লাইনে সামান্য কোন ভুল যে কত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাল করেই জানা আছে ওর।

কোরাগেটেড ডিজএমবার্কেশন টিউব ধরে এগিয়ে চলেছে রানা টার্মিনাল ফ্লোরের দিকে। দুটো চলন্ত প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেল সে সামনে—ইমিগ্রেশন থেকে একটা এদিকে আসছে, আরেকটা এদিক থেকে চলেছে ইমিগ্রেশনের দিকে। ওদিক থেকে যে প্ল্যাটফর্মটা এদিকে আসছে সেটার এদিকের মাথায় রানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝারি উচ্চতার এক শুকনো-পাতলা নিষ্ঠুর চেহারার লোক। মাথায় ঘন কালো চুল, মুখে বয়সের ভাঁজ—খুব সম্ভব চুলগুলো কালো করা হয়েছে ডাই করে। দুই চোখের নিচে ফুলে আছে দুটো থলে। কালো একটা স্যুটের ওপর কালো ওভারকোট চাপানো, হাতে একটা সদ্য-কেনা এয়ারব্যাগ। এক নজরেই অপছন্দ হলো রানার লোকটাকে। মনে মনে ঠিক করল, এই ধরনের লোকের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না সে কোনদিন—অবশ্য, যদি কোনদিন তার মেয়ে হয়।

বেশ অনেকটা কাছে এসে রানা দেখতে পেল, ইমিগ্রেশনের দিক থেকে প্ল্যাটফর্মে চড়ে জনা চারেক লোক আসছে এইদিকে। সবার আগে ছাইরঙা স্যুট পরা দীর্ঘ, একহারা লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল সে—ইসমাইল। অবাক হলো রানা লোকটার অস্থিরতা দেখে। এখানে এল কি করে? ইমিগ্রেশন ডিঙিয়ে এতদূর আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ইসমাইলকে। ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ না হলে এত কষ্ট করতে যেত না সে। এতই জরুরী, যে বাইরে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য নেই, চলে এসেছে ভিতরে, একেবারে প্লেনের গায়ের কাছে—ব্যাপার কি?

রানাকে দেখেই একগাল হেসে হাত নাড়ল ইসমাইল, রানাও হাত নাড়ল—কিন্তু কেন যেন পলকের জন্যে কালো একটা অশুভ ছায়া পড়ল ওর মনের আয়নায়। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ওর মুখের হাসি। কেন ব্যাপারটা ঘটল; কি দেখে কি বুঝল সে, কিছুই বলতে পারবে না রানা, কিন্তু মুহূর্তে সজাগ সতর্ক হয়ে উঠল ওর চোখ কান।

ইসমাইলের চোখের দৃষ্টি সামান্য একটু বাঁকা হতেই ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে নিষ্ঠুর লোকটাকে দেখল সে আবার। লোকটা এখন আর রানার দিকে

মুখ করে নেই, একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইসমাইলের মুখোমুখি। এয়ারব্যাগটা এখন আর লোকটার হাতে ঝুলছে না, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ধরা আছে বগলের নিচে। চট করে ইসমাইলের মুখের দিকে চেয়ে ভীতি দেখতে পেল রানা, এবং পরিষ্কার ভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝাঁপ দিল সামনের দিকে।

চোখের পলকে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। প্রস্তুত ছিল লোকটা। রানা ঝাঁপ দিতেই সাঁই করে ব্যাগটা ঘুরিয়ে মারল সে রানার নাভীর ছয় ইঞ্চি ওপরে, সোলার প্লেক্সাসে। এয়ারব্যাগ সাধারণত নরম হয়, কিন্তু এটা সেরকম না—অত্যন্ত শক্ত কিছু জিনিসের প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। তীব্র ব্যথায় গোঙাবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল সে। জ্ঞান হারাল না, কিন্তু সারা শরীর অসাড় অবশ হয়ে গেল ওর মুহূর্তে। দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু চোখ ছাড়া আর কিছু নড়াবার ক্ষমতা নেই।

পরবর্তী কয়েকটা সেকেন্ড রানার মনে হলো যেন স্লো মোশন ছায়াছবি দেখছে। চারপাশে চাইল আতঙ্কিত ইসমাইল, কিন্তু পালাবার পথ পেল না কোনদিকে। তিনজন লোক, যেন কি ঘটতে চলেছে কিছুই টের পায়নি, দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসমাইলের পিছনে। পিছনে পালাবার রাস্তা নেই। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোনো ছাড়া আর কোন পথ নেই ইসমাইলের।

এদিকে এয়ারব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কালো নলের মাথা। চিনতে পারল রানা—সাইলেন্সার সিলিন্ডার। এরই গুঁতোয় অবশ হয়ে গেছে ওর সর্বশরীর। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে, পারল না। লোকটার ডান হাত এয়ারব্যাগের মধ্যে। আর একটু উঁচু হলো হাতটা। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করবে বলে বাড়ি থেকে স্থির করে এসেছে যেন লোকটা। প্রফেশনাল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইসমাইলের মুখটা। কি ঘটতে চলেছে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে ভয়ে, কিন্তু তারই মধ্যে ডান হাতটা চলে গেল ওর কোটের ভিতর। পিছনের তিনজন লোক ঝপ করে বসে পড়ল একসঙ্গে। পরমুহূর্তে হাতটা বের করে আনল ইসমাইল কোটের ভিতর থেকে, হাতে পিস্তল। ঠিক সেই সময় 'দুপ' করে আওয়াজ হলো একটা এপাশ থেকে, মৃদু। একটা গর্ত দেখা দিল ইসমাইলের কোটে। বাম পাশে, বুকপকেটের ঠিক নিচে। কেঁপে উঠল ওর শরীরটা চমকে ওঠার ভঙ্গিতে, তারপর এলোপাতাড়ি পা ফেলে দু'পা সামনে এগিয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। চলন্ত ট্র্যাভেলেটার বয়ে নিয়ে এল লাশটা, ধাক্কা খেলো সেটা রানার গায়ে।

যাদুমন্ত্রের মত কাজ করল রানার মধ্যে মৃতদেহের স্পর্শটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে, ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে শক্ত করে। পিস্তল নেই রানার সাথে, গোপনে ওটাকে কাস্টমস ব্যারিয়ার পার করবার জন্যে পুরে দিয়েছে সুটকেসের তলার এক গোপন কম্পার্টমেন্টে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় খুনীর পেছনে ধাওয়া করা ঠিক হবে কি হবে না ভেবে-চিন্তে-বুঝে নেয়ার আগেই টলতে টলতে এগোল সে ইমিগ্রেশনে যাওয়ার

প্ল্যাটফর্মের দিকে। বমি আসছে রানার, মাথা ঘুরছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে এগোচ্ছে সে, মনে হচ্ছে দুলছে সবকিছু, ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না চোখে। থেমে দাঁড়িয়ে চট করে একহাতে চোখ মুছল রানা। দেখল, আসলে রক্তে বুজে গেছে ওর চোখ। মেঝেতে পড়ে কেটে গেছে কপালের একপাশ। রুমাল বের করে বার দুয়েক মুছতেই আবার পরিষ্কার হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। অনুভব করল বুকের কাছে ব্যথাটা কমে আসছে দ্রুত।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যেতে লাগল বড়জোর দশ সেকেন্ড, কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় হয়ে গেছে লাশটা ঘিরে। প্লেনের যাত্রী, পিছনের সেই তিনজন লোক, সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন হাজির হয়ে গেছে যেন মাটি ফুঁড়ে। জটলা হবে, হাঁকডাক হবে, এক-আধজন মহিলা চেঁচিয়ে উঠবে ভয়ে, এখন কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারবে না কেউ প্রথমটায়—এই-ই নিয়ম, সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবে খুনী।

চোখ তুলেই দেখতে পেল রানা লোকটাকে। ইমিগ্রেশনে যাবার প্ল্যাটফর্মের অর্ধেকের বেশি চলে গেছে সে, স্ট্র্যাপ ধরে ব্যাগটা ঝোলাতে ঝোলাতে হেলেদুলে হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। এদিকে কি ঘটে গেছে যেন টেরও পায়নি। সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে, কোন ব্যস্ততা নেই। লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হলো রানা, ওর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রমাণ খাড়া করতে পারবে না, কাজেই এই লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেলেই ইসমাইলের হত্যার সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে।

দৌড়াতে শুরু করল রানা।

ট্র্যাভেলেটারের মাঝামাঝি পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল রানা। পিছনে পায়ের শব্দে সাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লোকটা, এক ঝাঁকিতে ব্যাগটা বগলের নিচে নিয়ে এসে ডান হাতটা পুরে দিয়েছে ভেতরে। নিরস্ত্র অবস্থায় নিশ্চিত খুনীর পিছু ধাওয়া করা যে কতখানি বোকামি, বুঝতে পারল রানা মুহূর্তে। পরিষ্কার বুঝতে পারল, কোন দ্বিধা করবে না লোকটা গুলি করতে, আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ইসমাইলের সাথে মোলাকাত হবে ওর পরপারে। ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা মেঝের ওপর, এমনি সময়ে দেখল সামান্য একটু সরে গেল পিস্তলের মুখ, লোকটার দৃষ্টিও রানার ওপর থেকে সরে সামান্য একটু বাঁয়ে স্থির হয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। পিছন ফিরে না চেয়েও রানা বুঝতে পারল মৃতদেহের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলো দৌড়োতে দেখে নিশ্চয়ই ইসমাইলকে ছেড়ে ওর দিকেই চেয়ে রয়েছে, এবং তাই দেখে দ্বিধায় পড়েছে খুনী।

শেষ মাথায় পৌঁছে অপ্রস্তুত অবস্থায় হোঁচট খেলো নিষ্ঠুর চেহারার লোকটা, টাল সামলে নিয়ে দেখল পৌঁছে গেছে ওপারে। ঝট করে ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করল সে। এতগুলো লোকের সামনে খুন করতে দ্বিধা হওয়াই স্বাভাবিক, তবে রানা বুঝতে পারল, সেই কারণে যে লোকটা রেহাই দিয়েছে তাকে তা নয়, প্রয়োজন মনে করলে কয়েক হাজার দর্শকের সামনেও খুন করতে পারবে এই লোক, আসলে রানাকে হত্যা করবার প্রয়োজন বোধ

করেনি লোকটা। আবার ছুটতে শুরু করল রানা।

শরীরে খানিকটা বল ফিরে পেয়ে জোরে দৌড়ে কাছে চলে আসছিল রানা, ইমিগ্রেশন অফিসারদের অবাক করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সামনের লোকটা ওপাশের খোলা দরজা দিয়ে। সাধারণত লোকে ধীরস্থির ভাবে ঢোকে ইমিগ্রেশন হলে, অফিসারদের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে পাসপোর্ট দেখায়, প্রশ্নের উত্তর দেয়—এটাই নিয়ম; দৌড়ে পেরিয়ে যায় না কেউ এই এলাকা। কিন্তু রানা আবার যখন ওদের অবাক করবার চেষ্টা করল ততক্ষণে হুঁশ ফিরে পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে তারা। সাঁ করে একজন লোক বেরিয়ে চলে গেল, তার পিছু পিছু রক্তাক্ত চেহারায় আরেকজনকে ছুটতে দেখে থামাবার চেষ্টা করল দু'জন অফিসার রানাকে। এক ঝটকায় ওদের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটল রানা। কিন্তু কপালের ফেরে বাধা পড়ল ঠিক দরজার মুখেই।

ওপাশ থেকে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে একজন। একটা মেয়ে। ডানদিকে সরল রানা, মেয়েটা সরল বামদিকে; বামদিকে সরল রানা, মেয়েটা সরল ডানদিকে। ফুটপাথে প্রায়ই দেখা যায় এই ঘটনা—সামনাসামনি পড়ে যেতেই একজন ভদ্রতা করে একপাশে সরে যায়, অপরজনও ভদ্রতার দিক থেকে কম যায় না, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে সরে পথ দিতে চেষ্টা করে, ফলে দেখা যায় আবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে দুজন দুজনের। অতি বিনয়ী দুজন মুখোমুখি পড়লে অনির্দিষ্টকালের জন্যে চলতে পারে এই ক্যারিক্যাচার। কিন্তু ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখবার মূডে নেই রানা এখন, মোটমাট বার তিনেক ডাইনে-বাঁয়ে করে খপ করে মেয়েটার কাঁধ চেপে ধরে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল ওকে সামনে থেকে। মেয়েটা কিসের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেলো, ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেন, সে সব দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না সে, ছুটল সামনের দিকে। পরে ফিরে এসে মাফটাফ চেয়ে নিলেই হবে।

খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসতে হলো রানাকে। দরজার গোড়ায় রানার কয়েক সেকেন্ড ভদ্রতার সুযোগ নিয়েছে সামনের লোকটা পুরোপুরিই। লোকের ভিড়ে মিশে গেছে বেমালুম। তিন মিনিট খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এল হতাশ রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারল, এখন এয়ারপোর্ট পুলিসের কাছে রিপোর্ট করে কোন লাভ নেই, যতক্ষণে সে নিজের পরিচয় দিয়ে এদের কাজে নামতে বাধ্য করবে, ততক্ষণে একেবারেই পগার পার হয়ে যাবে লোকটা। প্রফেশনাল কিলার তার পালাবার পথ প্রশস্ত রেখেই নামে কাজে। এইলোক যে প্রফেশনাল তাতে রানার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপাতত এর পেছনে আর সময় নষ্ট করবার কোন অর্থই হয় না। ইমিগ্রেশন হলে ফিরে এল সে ভারী পায়ে। মাথার ভিতরটা দপ দপ করছে, বেশ খানিকটা ফুলে গেছে কপালের একপাশ, পেটে সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাটা নেই, কিন্তু ব্যথা-ব্যথা একটা ভাব রয়েছে বলে গা-টা গুলাচ্ছে। ঘরে এসে ঢুকতেই ইউনিফর্ম পরা দুই পুলিস দুদিক থেকে ধরল রানার দুই হাত।

'ভুল লোককে ধরেছ,' বলল রানা। 'দয়া করে হাত সরাও। সরে

দাঁড়াও—শ্বাস নিতে দাও আমাকে।'

একটু ইতস্তত করে রানার হাত ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল লোক দু'জন—প্রায় দুই ইঞ্চি দূরে। লম্বা করে দম নিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল রানা। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে, ঘন নীল রঙের কোট পরেছে, কোটের নিচে সাদা পোল-নেক জাম্পার। সুন্দরী। জুলফির কাছে খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। রুমাল দিয়ে মুছছে। মেয়েটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একজন সুদর্শন উচ্চপদস্থ এয়ারপোর্ট অফিশিয়াল—প্রশ্ন করছে ওকে, দেখে মনে হচ্ছে প্রেম নিবেদন করছে।

'ইয়াল্লা!' বলল রানা। 'আমি ওই দশা করেছি বুঝি আপনার?'

'না, না, মোটেই না,' চাপা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল মেয়েটা। 'আজ সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে ফেলেছি।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত,' দুঃখ দুঃখ চেহারা করল রানা। 'একটা খুনীকে তাড়া করছিলাম। খুন করে পালাচ্ছিল লোকটা। আপনি পড়ে গিয়েছিলেন আমার সামনে···পালিয়ে গেল লোকটা সেই সুযোগে।'

'আমার নাম মর্গেনস্টার্ন। এখানেই কাজ করি—এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি।' বলল মেয়েটার পাশে দাঁড়ানো লোকটা। চোখা চেহারা, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, চেহারায় দায়িত্ববোধের ছাপ পড়েছে। 'খুনের খবরটা শুনেছি। খুবই দুঃখজনক। এই রকম একটা কাণ্ড শিফল এয়ারপোর্টে ঘটে যাবে, ভাবাই যায় না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করায় মৃত লোকটার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

'এই ধরনের কথায় কারও কোন উপকার হয় না,' মর্গেনস্টার্নের কণ্ঠে ভর্ৎসনার আভাস। 'মরা লোকটা আপনার পরিচিত?'

'কি করে হবে? এইমাত্র নেমেছি আমি প্লেন থেকে। বিশ্বাস না হয় স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এখানকার কিছু চিনি না আমি —একেবারে নতুন।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি আপনি।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মর্গেনস্টার্ন। রানা বুঝল, শুধু চেহারায় নয়, সবদিক থেকেই লোকটা চোখা।

'পরিচিত কিনা? না। এই ভিড়ের মধ্যে লাশটা যদি দাঁড় করিয়ে দেন, চিনতে পারব না।'

'একটা কথা হয়তো স্বীকার করবেন, মিস্টার···আ···'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'হয়তো স্বীকার করবেন, মিস্টার রানা, সাধারণ কোন লোক সাধারণত সশস্ত্র খুনীকে তাড়া করে না।'

'হয়তো সাধারণের চেয়ে একধাপ নিচে আছি আমি।'

'কিংবা হয়তো আপনার কাছেও পিস্তল রয়েছে?'

জ্যাকেটের দুটো বোতাম খুলে লোকটার সন্দেহ ভঞ্জন করল রানা।

'আচ্ছা, খুনীকে কি কোনভাবে আপনার পরিচিত মনে হয়েছে? মানে,

আগে কোনদিন—'

'কোনদিন না।' সত্যি কথাটাই বলল রানা। তবে জীবনে কোনদিন ওই চেহারাটা ভুলতে পারবে না সে, এটাও সত্যি কথা—কিন্তু এ সত্য প্রকাশ করল না সে; মেয়েটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মিস—'

'মিস শেরম্যান,' বলল মর্গেনস্টার্ন।

'আপনি তো খুনীটাকে দেখেছেন। চেহারাটা মনে আছে?' মেয়েটা মাথা নাড়ছে দেখে বলল, 'মনে থাকার কিন্তু কথা। কাউকে দৌড়াতে দেখলে সবাই সেইদিকে তাকায়। আপনি একেবারে সামনে থেকে দেখেছেন ওকে।'

'দেখেছি। কিন্তু চেহারা মনে নেই।'

'মৃত লোকটাকে হয়তো আপনি চিনতে পারবেন। দেখবেন নাকি এক নজর?'

শিউরে উঠে মাথা নাড়ল মেয়েটা।

হঠাৎ সরাসরি প্রশ্ন করল রানা, 'কাউকে রিসিভ করতে এসেছেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না—' একটু যেন অবাক দেখাল মেয়েটাকে।

'ইমিগ্রেশনের দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। কেউ আসছে এই প্লেনে?'

আবার মাথা নাড়ল মেয়েটা। রানা লক্ষ করল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। ভয় পাচ্ছে পরের প্রশ্নটা কি হবে ভেবে।

'তাহলে কেন এসেছেন?' ভুরু নাচাল রানা। 'দৃশ্য দেখতে? এখানে তো দেখার মত কিছুই নেই?'

এসব প্রশ্নের কোন যৌক্তিকতা দেখতে পেল না মর্গেনস্টার্ন, ঠাণ্ডা দৃষ্টি রাখল রানার চোখে।

'হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। খামোকা প্রশ্ন করে ভদ্র মহিলাকে আর বিব্রত না করলেও চলবে। এ ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার রয়েছে কেবল পুলিস অফিসারের।'

'আমি একজন পুলিস অফিসার,' বলল রানা। পাসপোর্ট আর ওয়ার্‍্যান্ট কার্ড বের করে এগিয়ে দিল অফিসারের দিকে। ঠিক সেই সময়ে ইমিগ্রেশনে এসে ঢুকল সোহানা ও মারিয়া। কপালকাটা রানার রক্তাক্ত চেহারা দেখেই থমকে দাঁড়াল সোহানা, চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানার কড়া ভ্রূকুটি দেখে সামলে নিল মুহূর্তে। ঘাড় ফিরিয়ে মর্গেনস্টার্নের দিকে চাইল এবার রানা। মুখের ভাব সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে লোকটার।

'তাই বলুন!' আবার চোখ রাখল সে ওয়ার্‍্যান্ট কার্ডে। 'মেজর মাসুদ রানা, প্যারিস ব্যুরো অফ ইন্টারপোল। এবার বোঝা যাচ্ছে কেন খুনীর পেছনে ওভাবে দৌড়েছিলেন আপনি, কেন জেরা শুরু করেছিলেন পুলিসের মত। যাই হোক, আপনার এই পরিচয়পত্র একটু চেক করে দেখতে হবে আমার।'

'দেখুন। যেমন ভাবে খুশি পরীক্ষা করে দেখুন। তবে আমার মনে হয়, সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের কর্নেল ভ্যান গোল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনেক খাটুনি বেঁচে যাবে আপনার।'

'কর্নেলকে চেনেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'তিনিও আমাকে চেনেন। যাই হোক, যা চেক করবার জলদি করুন, আমি বারে গিয়ে বসছি, ওখানেই পাবেন আমাকে।' এগোতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল রানা তাগড়া পুলিস দুজনকে অনুসরণ করতে দেখে। বলল, 'এদের জন্যে ড্রিঙ্কস কিনতে পারব না আমি, জানিয়ে দিচ্ছি আগে থেকেই।'

'ঠিক আছে,' হাত নেড়ে পুলিস দুজনকে পিছু নিতে বারণ করল মর্গেনস্টার্ন। 'মেজর মাসুদ রানা পালাবে না।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাগজপত্রগুলো আপনার কাছে রয়েছে, ততক্ষণ তো নয়ই।' মেয়েটার দিকে ফিরল রানা। 'মিস্ শেরম্যান, আপনার ওই জখমের জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। দেখে মনে হচ্ছে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। আসুন না, একটা ড্রিঙ্ক নিন?'

'আপনার সাথে?' জুলফির পাশে রুমাল চাপা দিয়ে এমন ভাবে চাইল মেয়েটা রানার দিকে যেন কুষ্ঠরোগী দেখছে। মুখ ফিরিয়ে নিল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগোল রানা বারের দিকে। হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হলো সে। প্লেন থেকে নামার পর মাত্র আট মিনিট পার হয়েছে এতক্ষণে। এই আট মিনিটে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে: এক—অত্যন্ত সুসংগঠিত দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সে এবার; দুই—এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও কবে, কখন, কোন প্লেনে করে ইন্টারপোলের লোক আসছে জানা হয়ে গিয়েছিল ওদের, ইসমাইলের হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানার চেহারাও চেনা হয়ে গিয়েছে; তিন—হঠাৎ সামনে পড়ে যায়নি মিস শেরম্যান, ইচ্ছে করেই নষ্ট করা হয়েছে রানার কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড।

কোথাও মস্ত কোন ভুল করেছিল ইসমাইল, সে ভুলের অর্ধেক মাশুল শোধ করে গেছে সে নিজের জীবন দিয়ে, বাকি অর্ধেকটা চেপে গেছে এখন রানার কাঁধে।

দুই

আপাতত আগের প্ল্যান-প্রোগ্রামই অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। হলুদ মার্সিডিজ ট্যাক্সি এসে থামল ফাইভ-স্টার হোটেল কার্লটনের সামনে। মালপত্রের ভার ডোরম্যানের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা ভিতরে। রিসিপশন ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ছিমছাম পোশাক পরা স্মার্ট চেহারার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সরু গোঁফ, ব্যাকব্রাশ চুল, মুখে উজ্জ্বল

হাসি—সামনের লোকটা পিঠ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু ঝট করে পেছন ফিরলে দেখা যাবে মুহূর্তে ফিরে এসেছে হাসিটা, আগের চেয়েও উজ্জ্বল।

'ওয়েলকাম, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'আশা করি অ্যামস্টার্ডাম আপনার কাছে ভাল লাগবে।'

এ ব্যাপারে অতটা আশাবাদী হতে পারল না রানা, কাজেই জবাব না দিয়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ড পূরণে মন দিল সে। যেন মহামূল্যবান রত্নের অলঙ্কার নিচ্ছে, এমনি ভাবে পূরণ করা কার্ডটা হাতে নিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। রানাকে আর এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে বুড়ো বেল বয়ের দিকে চাইল সে। শরীরের ওপরের অংশ একপাশে বাঁকিয়ে রানার ভারী সুটকেস হাতে এলোমেলো পা ফেলে এদিকে এগোচ্ছে বেল বয়।

'বয়! ছশো বাইশ নম্বর।'

কথাটা বলেই অত্যন্ত বিনয় সহকারে রানার হাতে তুলে দিল সে একটা চাবি। চাবিটা পকেটে ফেলে দুই পা এগিয়ে বুড়োর হাত থেকে সুটকেসটা নিল রানা বাঁ হাতে, টিপস্ দিয়ে বলল,'থ্যাঙ্ক ইউ। আমিই নিতে পারব।'

'কিন্তু সুটকেসটা অনেক ভারী মনে হচ্ছে, মিস্টার রানা,' বলল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আন্তরিক কণ্ঠে। 'ওটা ওখানেই নামিয়ে দিন, আমি অন্য লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওপরে।'

মৃদু হেসে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল রানা সুটকেস হাতে। ভারী তো মনে হবেই ভাবল সে। পিস্তল, গোলাবারুদ, সাইলেন্সার, বার্গলার্স-টুল, এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মিলে কমপক্ষে দশ সের ওজন বাড়িয়ে দিয়েছে সুটকেসের। কিন্তু তাই বলে ওর অনুপস্থিতিতে ভিতরের জিনিসপত্র ঘাঁটবার সুযোগ সে দিতে পারে না কাউকে। একবার হোটেল কক্ষে পৌছতে পারলে ওসব লুকিয়ে রাখবার জায়গার অভাব হবে না, কিন্তু তার আগে সুটকেসটা হাতছাড়া করা যায় না।

সিক্সথফ্লোরের বোতাম টিপে দিল রানা এলিভেটরে উঠে। রওয়ানা হওয়ার আগের মুহূর্তে দরজার গায়ের গোল কাঁচের জানালা দিয়ে রিসিপশন ডেস্কের দিকে চাইল সে। হাসি নেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মুখে। গম্ভীর ভাবে কি সব বলছে লোকটা টেলিফোনের রিসিভারে।

সাততলার লবিতে বেরিয়েই দেখতে পেল রানা ছোট্ট একটা টেবিল, টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন, ওপাশে একটা চেয়ার, চেয়ারে বসা ইউনিফর্ম পরা এক স্বাস্থ্যবান ওয়েটার। লোকটার চোখে মুখে একটা বেপরোয়া ভাব লক্ষ করল সে। এই ধরনের লোকের ব্যবহারে আবছা একটা বেয়াড়াপনা, একটা তির্যক বেয়াদবি মেশানো থাকে, কিন্তু স্পষ্টভাবে কোন দোষ ধরবার উপায় নেই যে নালিশ করা যায় কর্তৃপক্ষের কাছে।

'ছশো বাইশ নম্বরটা কোনদিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ভুরুজোড়া আধ ইঞ্চি ওপরে উঠল লোকটার, বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল ডানদিকে। 'তিনটে ঘর ছেড়ে তার পরেরটা।' উঠে দাঁড়ানো তো দূরের কথা,

বাক্যের শেষে ছোট্ট একটা 'স্যার' যোগ করাও বাহুল্য বলে বোধ করল সে। মনে মনে বিরক্ত হলো রানা, ইচ্ছে হলো এক থাবড়া দিয়ে ওর চাঁদিটা ঘোলা করে দেয়, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু না বলে আনন্দটা ভবিষ্যতের জন্যে জমা করে রাখাই স্থির করল। যাবার আগে এই লোকটাকে একটু টাইট করে দিয়ে যাবে সে।

'তুমি ফ্লোর ওয়েটার না?' যেন বেয়াদবিটা চোখেই পড়েনি ওর, এমনিভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস, স্যার,' বলে উঠে দাঁড়াল লোকটা। এত সহজে লোকটা কাবু হয়ে যাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল রানার। যেন রসভঙ্গ হয়ে গেল।

'আমার জন্যে খানিকটা কফির ব্যবস্থা করো।'

এগিয়ে গিয়ে ছশো বাইশের দরজায় চাবি লাগাল রানা। প্রশস্ত বেডরুম, একটা মাঝারি সিটিংরুম, ছোট্ট একটা কিচেন আর অ্যাটাচড বাথরুম নিয়ে চমৎকার এক স্যুইট। পিছনে চওড়া একটা ব্যালকনি।

সুটকেসটা ঘরের কোণে নামিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠিক নিচেই ব্যস্ত রাজপথ—প্রায় সত্তর ফুট নিচে। খটখটাং শব্দে ট্রাম চলছে, হর্ন বাজাচ্ছে চলন্ত গাড়ি, কিলবিল করছে শয়ে শয়ে মোটর-স্কুটার আর বাইসাইকেল—যেন আত্মহত্যার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ওরা প্রত্যেকে।

ওপর দিকে চাইল রানা। স্যুইট রিজার্ভ করবার সময়েই টপ ফ্লোরের কথা বলে দিয়েছিল সে বিশেষ করে। এখান থেকে সবচেয়ে সহজে কিভাবে ছাতে ওঠা যায় বুঝে নিয়ে ফিরে এল ঘরে। সুটকেস খুলে যেসব জিনিস সে আর কারও চোখে পড়তে দিতে চায় না সেগুলো বের করে রাখল রানা কার্পেটের ওপর। হোলস্টারে পোরা ওয়ালথার পি.পি.কে. ঝুলিয়ে নিল বগলের নিচে, এক্সট্রা ম্যাগাজিন গুঁজে দিল প্যান্টের পেছনের পকেটে। এবার ক্যানভাসের বেল্টে আঁটা বার্গলার্সটুল কোমরে বেঁধে নিয়ে স্ক্রুড্রাইভারটা বের করল তার থেকে। কিচেনে রাখা ছোট্ট পোর্টেবল ফ্রিজের পেছনটা খুলে এবার বাদবাকি সব জিনিস ঢুকিয়ে দিল সে ওখানে, তারপর দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল ওয়েটারের উদ্দেশে।

'কি হলো? কফি কোথায়?'

এবার এক হাঁকেই উঠে দাঁড়াল ওয়েটার, ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আসছে, স্যার। এলেই আমি পৌঁছে দেব।'

'জলদি করো,' বলেই দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা।

কোমরে বাঁধা বেল্ট থেকে একগোছা চাবি বের করে দরজার চাবির ফুটোয় একের পর এক লাগাতে শুরু করল সে। সপ্তম চাবিটা লেগে গেল। নম্বরটা দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল সে গোছাটা আবার। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিয়ে ফিরে এল সে বেডরুমে, স্যুটগুলো ঝুলিয়ে দিল ওয়ারড্রোবের হ্যাঙ্গারে, একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় অ্যাশট্রের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়ে বেল বেজে উঠতেই একলাফে চলে গেল সে বাথরুমের দরজার সামনে, ওয়েটারকে

ভিতরে আসতে বলে ভিতরে ঢুকে ভিড়িয়ে দিল বাথরূমের দরজা, নিচু হয়ে চোখ রাখল কী হোলে।

নাহ্, যা আশা করেছিল তার কিছুই ঘটল না। রানা ভেবেছিল, ও বাথরূমে মনের সুখে ভিজছে মনে করে এই সুযোগে তালাহীন সুটকেসের মধ্যে কি আছে দেখবার চেষ্টা করবে ওয়েটার, অন্তত চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি বুলাবে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখবার জন্যে—কিন্তু না, কোনদিকে না চেয়ে সোজা টেবিলের ওপর কফির ট্রে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল লোকটা। যাবার সময় দরজাটা ভিড়িয়ে দিতে ভুলল না।

এতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না, বুঝতে পারল রানা। এর ফলে ধরে নেওয়া যায় না যে এই হোটেলে শত্রুপক্ষের কেউ নেই, কিংবা ওর পরিচয় ও উদ্দেশ্য এদের সবার অজানা। বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই করিডরে বেরোবার দরজায় তালা দিল, তারপর কফিগুলো বেসিনে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিল শাওয়ার। চলে এল ব্যালকনিতে।

ব্যস্ত সড়কের দিকে চেয়ে রানা বুঝল ওখান থেকে ওর কার্যকলাপ দেখার উপায় নেই কারও, সামনের দালানগুলোর কোন জানালা বা ব্যালকনিতেও কাউকে দেখতে পেল না সে। সামনে ঝুঁকে আশেপাশের কোন ঘরের ব্যালকনি থেকে এদিকে কেউ চেয়ে রয়েছে কিনা দেখল ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে। না। কেউ নেই দুপাশের কোন ব্যালকনিতে। রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে একটা পাইপ আর এক হাতে ছাতের কার্নিস ধরে উঠে পড়ল সে ওপরে।

কেউ নেই ছাতে, উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে টেলিভিশনের এরিয়েল বাঁচিয়ে এগোল সে ফায়ার এসকেপের দিকে। তেতলা পর্যন্ত নেমে এল রানা ফায়ার এসকেপের সিঁড়ি বেয়ে, তারপর চাবি লাগাল করিডরের দরজায়। বার কয়েক চেষ্টা করতেই খুলে গেল তালা, দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শূন্য করিডর দেখে বেরিয়ে এল সে দরজার ওপাশ থেকে। এবার হেলেদুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

রিসিপশনে নতুন লোক। সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বেল বয় বা ডোরম্যান, কাউকেই দেখতে পেল না সে। একদল সদ্য আগত ট্যুরিস্ট ভিড় করে আছে রিসিপশন ডেস্কের সামনে। ভিড় ঠেলে, এর ওর কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে ডেস্কের কাছাকাছি পৌঁছল রানা, হাত বাড়িয়ে ডেস্কে জমা দিল ঘরের চাবিটা, তারপর ধীর পদক্ষেপে চলে গেল বারে। সেখানেও থামল না, একটা সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

মুষল ধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে, রাস্তাঘাট ভেজা। কিন্তু এখন একফোঁটাও পড়ছে না আর। ওভারকোটটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিল, চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে এগোল সে, যেন নৈশ-অ্যামস্টার্ডামের রূপ একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে তাকে।

হেরেনগ্র্যাচে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজকুমারদের বাড়িগুলো দেখছিল রানা, হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে কেমন যেন একটা সুড়সুড়ির মত অনুভূতি হলো ওর।

এক্সট্রা সেনসরি পার্সেপশন হোক বা যাই হোক, নিজের মধ্যে একটা ক্ষমতা আছে—অনুভব করে রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারল, অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা খালের ধারে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, যেন প্রাকৃতিক শোভা দেখছে। একটা সিগারেটের আধা-আধি শেষ করে বুঝতে পারল আপাতত ওকে খুন করবার ইচ্ছে নেই কারও। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও বেশি কাছে এল না লোকটা, বিশগজ দূরে আরেকটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সে-ও শোভা দেখছে। শিফল এয়ারপোর্টের পিস্তল তুলে গুলি করেনি ইসমাইলের-হত্যাকারী, এই নির্জন খালের পারে জায়গামত একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে সম্মানের সাথে পানিতে নামিয়ে দিলে টেরও পাবে না কাকপক্ষী—কিন্তু সে চেষ্টা করল না কেউ। আপাতত এরা শুধু ওর গতিবিধি আর কাজকর্মের ওপর দৃষ্টি রাখতে চাইছে। ভালই তো—রাখুক।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা, হাই তুলল, তারপর উঠে এল বড় রাস্তায়। ডানদিকে মোড় নিয়ে লীডেস্ট্রাট ধরে এগোল সহজ ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে টুকিটাকি উইন্ডো শপিং করছে, সেই ফাঁকে কাঁচের গায়ের প্রতিফলন দেখে বুঝে নিচ্ছে অনুসরণকারীর অবস্থান। রানা থামলেই সেই লোকটাও থেমে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে কোন দোকানের ডিসপ্লে। ছাই রঙের স্যুট ও সোয়েটার লোকটার, টুপিটাও ছাই রঙের।

সামনের মোড়ে আবার ডানদিকে ঘুরল রানা। সিঙ্গেল ক্যানেলের তীরে সারবাঁধা ফুলের দোকান। বেশ কিছুদূর এগিয়ে একটা টকটকে লাল গোলাপ কিনে গুঁজল কোটের কলারে। ত্রিশ গজ দূরে সেই লোকটাও ফুল কিনছে। রওয়ানা হয়ে গেল রানা।

সামনের মোড়ে আবার ডানদিকে ঘুরল রানা। লোকটা চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে এগোল ভিযেলস্ট্রাট ধরে। চল্লিশ কদম গিয়েই চট করে ঢুকে পড়ল একটা ইন্দোনেশিয়ান রেস্তোরাঁর ভেড়ানো দরজা ঠেলে। সোজা গিয়ে টয়লেটে ঢুকল।

দশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল সে টয়লেট থেকে। ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে, পকেট থেকে একটা নরম ফেল্টের ট্রিলবি হ্যাট বের করে পরে নিয়েছে, চোখে চড়িয়েছে জিরো পাওয়ারের একজোড়া পুরানো মডেলের তারের চশমা। রানা যখন রেস্তোরাঁর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল, ঠিক সেই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে চারপাশে চাইতে চাইতে সামনের দিকে চলেছে ছাই-রঙা অনুসরণকারী। ওভারকোট পরা পরিবর্তিত রানাকে ভালমত দেখবারও প্রয়োজন বোধ করল না লোকটা, একবার আবছাভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে খুঁজছে সে রানাকে। এই দরজায় ওই দরজায় উঁকি দিয়ে দেখছে সে রানা ঢুকেছে কিনা।

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল রানা। লোকটার বেশ খানিকটা পেছন পেছন চলল। শখানেক গজ গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করল লোকটা। চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্বেগ। ফিরতি পথে প্রত্যেকটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে খুঁজছে সে রানাকে। ইন্দোনেশিয়ান রেস্তোরাঁতেও

ঢুকল, দশ সেকেন্ড পর বেরিয়ে এল সেখানে রানাকে না পেয়ে। রেমব্র্যান্ট হোটেলে ঢুকে লবি, লাউঞ্জ, বার খুঁজে ফিরে এল সে রাস্তায়। পাগল-দশা হয়েছে ওর। উদভ্রান্ত ভঙ্গিতে চাইছে এদিক ওদিক, দিশাহারার মত পথ চলতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে লোকের গায়ে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল লোকটা, দুই মিনিট পর বেরিয়ে এল কাঁদো কাঁদো চেহারা নিয়ে—যেন মেরেছে কেউ। সোজা মান্টপ্লেইনের ট্রাম স্টপেজের দিকে চলল লোকটা এবার, পিছু পিছু গিয়ে রানাও দাঁড়াল লাইনে।

তিন কোচের একটা ট্রাম এসে দাঁড়াতেই প্রথম কোচে উঠে পড়ল ছাই-রঙা লোকটা, দ্বিতীয় কোচে উঠে বসল রানা। একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে বসল, যাতে নজর রাখা যায় লোকটার ওপর।

ড্যাম-এ পৌঁছেই নেমে পড়ল লোকটা, রানাও নামল। এই ড্যামই হচ্ছে অ্যামস্টার্ডামের মেইন স্কয়ার। রাজপ্রাসাদ, নিউ চার্চ, ইত্যাদি অনেক ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তু সাজানো রয়েছে রাস্তার দুই ধারে। কিন্তু এসব কোনকিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হোটেল ক্র্যাসনাপোলস্কির পাশ দিয়ে একটা সাইড রোড ধরে এগিয়ে গেল লোকটা, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে ডকের দিকে এগোল আউডেজিয ভুর্বার্গোয়াল খালের ধার ঘেঁষে। আধ মাইল এগিয়ে ডাইনে ঘুরে গুদাম আর পাইকারী বিক্রেতাদের ওয়্যারহাউজে ঠাসা পুরানো শহরের দিকে চলল সে এবার। লোকটাকে অনুসরণ করবার ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিল না, ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে না চেয়ে এক মনে হেঁটে চলেছে সে মাথা নিচু করে, ধমক ও গালাগালির উত্তরে কি কি জবাব দেবে খুব সম্ভব তারই মহড়া চলেছে ওর মাথায়।

সরু একটা গলিতে ঢুকল লোকটা, একটু ইতস্তত করে গলিমুখে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে বিদেশী পর্যটক, কোনদিকে যাবে ভাবছে, যদিও জানে যে কোন একদিকে রওনা দিলেই চলে, ওর কাছে সব রাস্তাই সমান। লোকটার চলার গতি বেড়ে যাওয়ায় রানা বুঝতে পারল, গন্তব্যস্থলের খুব কাছাকাছি এসে গেছে বলেই এই কর্ম তৎপরতার আভাস। ঠিকই। ম্লান আলোকিত গলিটার মাঝামাঝি গিয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তরতর করে উঠে গেল লোকটা কয়েক ধাপ, চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে গেল একটা স্টোর হাউজের ভিতর।

ধীরে পায়ে এগোল রানা। সরু রাস্তার দু'পাশে পাঁচতলা উঁচু সারি সারি পুরানো দালান, মনে হয় এক্ষুণি বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে ঘাড়ের ওপর। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগানো কোন না কোন কোম্পানীর স্টোর হাউজ। কেমন একটা ছমছমে ভাব নির্জন রাস্তাটায়। যেতে যেতে সহজ ভঙ্গিতে চাইল রানা ডানপাশে। যে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে ছাই-রঙা লোকটা তার গায়ে লেখা:—ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানী। যেমন চলছিল ঠিক সেই গতিতেই এগিয়ে গেল রানা সামনের মোড়ের দিকে।

অত্যন্ত সাদামাঠা এক হোটেল—যেমন বাইরেটা, তেমনি ভেতরটা। খটখটে

কয়েকটা আসবাব, দেখে মনে হয় নিলামে কেনা। বিছানার ওপর পাশাপাশি বসে আছে সোহানা ও মারিয়া। রানা বসল ঘরের একমাত্র আরাম কেদারাটায়।

'কি খবর? মায়াময় নৈশ অ্যামস্টার্ডামের এক নির্জন হোটেলকক্ষে অপরূপ সুন্দরী দুই রমণী—একা! সব ঠিকঠাক তো?'

'না,' জবাব দিল মারিয়া এক অক্ষরে।

'না?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'না মানে?'

হাত তুলে কামরাটার চারদিকে দেখাল মারিয়া। 'দেখুন, নিজেই চেয়ে দেখুন না।'

চারদিকে চেয়ে কিছুই বুঝতে পারল না রানা। 'দেখলাম, কিন্তু বুঝলাম না।'

'এই ঘরে মানুষ বাস করতে পারে? আপনি পারবেন?'

'ও, এই কথা?' হাসল রানা। 'না। সত্যি বলতে কি, এই ঘরে আমি বাস করতে পারব না। কিন্তু তোমাদের মত খেটে খাওয়া টাইপিস্টকে তো আর ফাইভ-স্টার হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারি না। এই ঘর তোমাদের জন্যে ঠিকই আছে। এখানে কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই। অন্তত এটাই আশা করছি। তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের চিনতে পেরেছে কেউ?' মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তোমরা কাউকে চিনতে পেরেছ প্লেনে?'

ঠিক একই ভাবে মাথা নেড়ে একই সঙ্গে বলল দু'জন, 'না।'

'শিফলে পৌঁছে পরিচিত কাউকে দেখেছ?'

'না'

'কেউ কোন বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি তোমাদের প্রতি?'

'না।'

'ঘরটা পরীক্ষা করে দেখেছ? লুকোনো মাইক্রোফোন বা কিছু পেলে?'

'না।'

'বাইরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ অনুসরণ করেছিল?'

'না।'

'তোমাদের অনুপস্থিতিতে সার্চ করা হয়েছে এ ঘর?'

'না।'

মারিয়ার ঠোঁটে হাসির আভাস দেখে হাসল রানা প্রশ্রয়ের হাসি। বলল, 'বলে ফেলো। মজার ব্যাপারটা কি ঘটল?'

'না। মানে...' একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল মারিয়া, 'এই চোর-পুলিস খেলার কি সত্যিই কোন...মানে, দুজন নিরীহ বিদেশী টাইপিস্ট আমাদের পেছনে কেন কেউ—'

'আহ্, থামো!' মারিয়াকে থামিয়ে দিল সোহানা। 'এর মধ্যে হাসির কিছুই নেই।'

'এয়ারপোর্টের ঘটনা সম্পর্কে জানা আছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল

রানা।

'খুনের ব্যাপারে তো?' বলল মারিয়া। 'কে একজন খুন হয়েছে এয়ারপোর্টে। শুনেছি, আপনি নাকি চেষ্টা করেছিলেন খুনীকে ধরতে…'

'ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম…'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'কি কেন?' অবাক হলো রানা।

'কে কোথায় খুন হলো, সেজন্যে পুলিস বিভাগ রয়েছে—তুমি কেন তাড়া করতে গেলে? কোথাও কোন খুন-খারাবি হলেই তোমার পিছু ধাওয়া করতে হবে?'

'যাকে খুন করা হলো, সে যদি আমার ঘনিষ্ঠ কেউ হয়? ধরো, তুমি বা মারিয়া…' কথাটা শেষ করল না রানা একসঙ্গে ওদের দু'জনকে চমকে উঠতে দেখে।

'ঘনিষ্ঠ লোক মানে?' ছানাবড়া হয়ে গেল মারিয়ার চোখজোড়া। 'আপনি চেনেন লোকটাকে? যে মারা গেল…'

'আমারই লোক। জরুরী খবর নিয়ে দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। নিজের লোক বলেই বলছি না, অত্যন্ত সাবধানী এবং বুদ্ধিমান লোক ছিল ও। আমি ছাড়া আর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না যে ও আসছে শিফলে আমার সাথে দেখা করতে—এতই সাবধানে মেসেজ পাঠিয়েছিল ও তিন হাত ঘুরিয়ে। কিন্তু পৌঁছে কি দেখলাম? আরও কেউ জেনে গিয়েছে এই গোপন সাক্ষাতের কথা, কথা শুরু করবার আগেই শেষ করে দিয়েছে ইসমাইলকে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা তা হচ্ছে: আমার একজন সহকর্মী সম্পর্কে ওরা এতটা ওয়াকিফহাল; বাকি দুজন সম্পর্কে ঠিক কতটা ওদের জানা আছে বুঝে নেয়া দরকার প্রথমে। আর ইউ শিওর ইউ আর ইন ক্লিয়ার?'

ব্যাপারটার গুরুত্ব টের পেল ওরা। পরস্পরের মুখের দিকে চাইল সোহানা ও মারিয়া। তারপর নিচু গলায় বলল মারিয়া, 'তা কি করে বলব? আমরা যতদূর জানি এখন পর্যন্ত ঠিকই আছি আমরা। কেউ আমাদের চিনে রেখেছে কিনা সেটা তো সেই বলতে পারবে। আপনার কি মনে হয় আমাদেরও প্রাণের আশঙ্কা…'

'আছে। সেইজন্যেই অত আপত্তি করেছিলাম আমি তোমাদেরকে সাথে আনতে।'

বিপদের সম্ভাবনা বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করল ওরা দু'জন। রীতিমত ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট ওরা, একটুতেই ঘাবড়ে যাওয়ার মত ঠুনকো নয়। রানার চোখে চোখ রাখল সোহানা। 'তোমার পেছনে নিশ্চয়ই লেগে গেছে ওরা?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'কোথায় কোন্ হোটেলে উঠেছ জানা আছে ওদের?'

'নিশ্চয়ই। তা নইলে হোটেলের অর্ধেক স্টাফ আমার ওপর নজর রাখতে যাবে কেন? সাইড ডোরেও ওয়াচার বসানো হয়েছে, আমি বেরোতেই গুটগুট করে হাঁটতে শুরু করল পেছন পেছন।'

'খসিয়ে দিয়েছেন ওকে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'হয় অযোগ্য ছিল, নয়তো প্রোভোকেট করবার চেষ্টা করছে। আক্রমণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। ওদের ছোট ছোট চালে আমার কি রি-অ্যাকশন হয় তাই লক্ষ করছে ওরা দূরে বসে।'

'কিছু দেখতে পেয়েছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'পাবে,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'যতটা আঘাত করবে, ঠিক ততটাই প্রত্যাঘাত পাবে ওরা আমার কাছ থেকে। চলি এখন। দেখা হবে কাল।'

চট করে রানার হাত ধরল সোহানা।

'সাবধানে থেকো, রানা। তুমি একা, ওরা অনেক।'

'তবু ভয় পাচ্ছে ওরা আমাকে।' হাসল রানা। 'ভেব না, কোন কোন সময় আমি একাই একশো হয়ে যেতে পারি। তোমরা এখন সাবধানে থাকতে পারলে হয়।'

তিন

টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরে এল রানা হোটেলে। সোজা ভেতরে না ঢুকে সাইড স্ট্রীট ধরে চলে এল ফায়ার এসকেপের সিঁড়ির কাছে। ঠিক এক মিনিট পর ছাতের দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে উঁকি দিল। কেউ নেই ছাতে। প্যারাপেট ডিঙিয়ে শুয়ে পড়ল সে কার্নিসের ওপর। মাথা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করল ওর কামরার পেছনের ব্যালকনিটা।

প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না রানা, কিন্তু গন্ধ পেল ধোঁয়ার। সিগারেটের নয়—গাঁজার। প্যারাপেটের গায়ে পা বাধিয়ে যতদূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে প্রায় পড়ি পড়ি অবস্থায় দেখতে পেল সে রেলিঙের ওপর একজোড়া জুতোর চকচকে মাথা। পরমুহূর্তে দেখা গেল একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো বাঁকা হয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। ব্যালকনির গায়ে পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে অপেক্ষা করছে কেউ ওর জন্যে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা, পা টিপে চলে এল ফায়ার এসকেপের কাছে, কয়েক ধাপ নেমে আস্তে করে খুলল সাততলার দরজাটা। করিডরে কাউকে না দেখে সোজা এসে দাঁড়াল সে নিজের স্যুইটের দরজার সামনে। কান পেতে কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না ভিতর থেকে। কোমরে জড়ানো ক্যানভাস বেল্ট থেকে নকল চাবির গোছা বের করে নম্বর মিলিয়ে নিয়ে আলগোছে খুলল দরজার তালা। চট করে ভিতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিল সে দরজাটা আবার, কেননা হাওয়া লেগে সিগারেটের ধোঁয়া দুলে উঠলে লোকটার সতর্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু সতর্কতার মুডে নেই লোকটা। কয়েক পা এগিয়ে দেখতে পেল রানা একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজে সুখটান দিচ্ছে সে মারিজুয়ানা পোরা সিগারেটে। পা দুটো নাচাচ্ছে ব্যালকনির রেলিঙের ওপর তুলে দিয়ে। সেই

ফ্লোর ওয়েটার। ডানহাতটা কোলের ওপর, হাতে পিস্তল।

নিশ্চয়ই ঝাঁ ঝাঁ করছে ওর মাথার ভিতরটা: কারণ, রানার উপস্থিতি কিছুই টের পেল না সে। চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল রানা, লোকটার কানের কাছে পিস্তল ধরে বামহাতটা আলগোছে রাখল ওর কাঁধের ওপর। চমকে উঠে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চাইবার চেষ্টা করল লোকটা, পিস্তলের মাথা দিয়ে ডান চোখে গুঁতো খেয়ে বিদঘুটে এক শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ব্যথা পেয়ে দুই হাতই চোখের কাছে চলে এল ওর নিজেরই অজান্তে। কোলের ওপর থেকে টপ করে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল রানা। পরমুহূর্তে ওর থুতনির নিচটা গলা ধাক্কার ভঙ্গিতে ধরে জোরে এক ঠেলা দিল পেছন দিকে। চেয়ার উল্টে ডিগবাজি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ফ্লোর ওয়েটার মেঝের ওপর, জোরে ঠুকে গেল মাথার পেছনটা। দশ সেকেন্ড ঝিম ধরে পড়ে রইল লোকটা মেঝেতে, দিশে হারিয়ে ফেলেছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। তারপর উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। রানাকে চিনতে পেরেই হিংস্র জানোয়ারের মত ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়ল লোকটা, ঠোঁট দুটো সরে গিয়ে নিকোটিনের দাগ লাগা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, দুই চোখের তীব্র দৃষ্টিতে ঘৃণার বিষ। চাপা গলায় গোটাকয়েক ডাচ গালি দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'কি চাও তুমি? মারপিট? শক্তি পরীক্ষা?'

'মারপিট?' অবাক হলো রানা। 'আরে না। অত তাড়াহুড়ো নেই আমার। ওসব হবে পরে। যদি দেখি কথা বেরোচ্ছে না তোমার মুখ থেকে।'

বাঁকা এক টুকরো হাসির আভাস খেলে গেল লোকটার ঠোঁটের কোণে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। সোজা হয়ে যখন দাঁড়াল রানার মাথা ছাড়িয়ে আরও আধ হাত উঠে গেল ওর মাথাটা। শুধু লম্বায় নয়, চওড়াতেও লোকটা রানার দেড়গুণ। পেটা শরীর। রানার মুখের কথাগুলো তাই হাস্যকর শোনাল ওর কাছে। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা গ্রহণ করাই স্থির করল লোকটা। ঘাড়টা সামান্য একটু কাত করে ফাইটিং পিকচারের দস্যু-সর্দারের ভঙ্গিতে বলল, 'কি ব্যাপারে কথা বেরুকরতে চাও?'

'এই ধরো, আমার ঘরে তুমি কি করছ···সেটা দিয়ে শুরু করা যায়। তারপর আলাপ করা যেতে পারে কে তোমাকে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে সে সব বিষয়ে।'

বিষণ্ণ হাসি হাসল লোকটা। 'এসব চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, মিস্টার। একটা কথাও বের করতে পারবে না আমার মুখ থেকে। অনেক চেষ্টা করে দেখেছে পুলিস, একটা শব্দও বের করতে পারেনি। আইন আমার ভাল করেই জানা আছে। আমাকে দিয়ে কোন কথা বলাতে পারবে না। আইন বলে, কোন কথা প্রকাশ করা বা না করার অধিকার রয়েছে আমার।'

'দরজার ওই ওপাশ পর্যন্ত এসেই দাঁড়িয়ে গেছে আইন,' বলল রানা। 'এপাশে তুমি আমি দু'জনেই রয়েছি আইনের আওতার বাইরে। এখানেও একটা আইন অবশ্য রয়েছে···জঙ্গলের আইন। হয় মারো, নয় মরো।'

রানার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই ডাইভ দিল লোকটা। নিচু হয়ে

পিস্তলের লাইন অফ ফায়ার বাঁচাল ঠিকই, কিন্তু রানার হাঁটুর নিচে চিবুক নামাতে পারল না লোকটা। বিদ্যুৎবেগে এক পা এগিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো লাগাল রানা হাঁটু দিয়ে ওর থুতনি বরাবর। তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ করল রানা হাঁটুতে। সেই হিসেবে আধঘন্টার জন্যে শুয়ে পড়বার কথা লোকটার, কিন্তু আশ্চর্য সহ্য ক্ষমতা ওর, মোক্ষম আঘাত পেয়েও রানার বাম পা ধরে হ্যাঁচকা এক টান দিয়ে ভারসাম্য টলিয়ে দিল রানার। হুড়মুড় করে দু'জনেই পড়ল মেঝের ওপর। হাত থেকে খসে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়ল রানার পিস্তলটা। পরবর্তী আধ মিনিট যুদ্ধরত বন্য জন্তুর মত গড়াগড়ি খেলো ওরা মেঝের ওপর—একবার এ ওপরে, একবার ও। সেই সঙ্গে বৃষ্টির বেগে ঘুসি চালাচ্ছে দু'জন একে অপরের ওপর। লোকটার শারীরিক ও মানসিক বল অবাক করল রানাকে। বল প্রয়োগ না করে কৌশল প্রয়োগ করছে রানা এখন। মারিজুয়ানা টেনে স্বাভাবিক রিফ্লেক্স হারিয়ে না ফেললে কি ঘটত বলা যায় না, কারণ আনআর্মড কমব্যাটে সে কোন অংশে কম যায় না রানার থেকে, তার ওপর ওর গায়ে রয়েছে রানার দ্বিগুণ শক্তি। ঠিক আধ মিনিট পর দু'জনেই যখন উঠে দাঁড়াল আবার, দেখা গেল বামহাতে চেপে ধরে আছে রানা লোকটার ডান হাত, হাতের কব্জি মুচড়ে ঠেলে তুলে এনেছে ওটাকে একেবারে শোলডার ব্লেডের কাছে।

কব্জিটা আরেকটু ওপরে তুলতেই গোঙানির মত শব্দ বেরোল লোকটার মুখ থেকে, কিন্তু অভিনয় করছে কিনা সঠিকভাবে বোঝার জন্যে আরও খানিকটা উঁচু করল রানা হাতটা। পিঠের কাছে কড়কড় আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারল সে, আর খানিকটা তুললেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে হাত। এইবার ঠেলে নিয়ে এল সে লোকটাকে ব্যালকনির রেলিঙের ধারে। রেলিংটা ওর পেটে বাধিয়ে ঠেলে শূন্যে তুলে ফেলল ওর শরীরের নিম্নাংশ। বাম হাতে রেলিং আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু বেকায়দা অবস্থায় ধরতে পারল না শক্ত করে, পেছন থেকে সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই সোজা নেমে যাবে সে সত্তর ফুট নিচের রাস্তায় মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থায়।

'তুমি পুশার না অ্যাডিক্ট?' কানের কাছে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

জান-প্রাণ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা, চট করে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে আরেকটু চাপ দিল রানা ওর মুচড়ে ধরা হাতে, তারপর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'চিৎকার করে লোক ডাকবার সুযোগ পাবে না। উত্তর দাও।'

'পুশার।' ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। 'বিক্রি করি।'

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে এখানে?'

'সেটা কিছুতেই বলব না···যা খুশি তাই···উহ্।'

'শেষ পাঁচটা সেকেন্ড একটু ভেবে দেখো। সিদ্ধান্ত তোমার। উত্তর না দিলে ঠেলে ফেলে দেব। ফুটপাথের দিকে একবার চেয়ে দেখো···ওই ওখানটায় হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকবে তোমার লাশ, মুখের গন্ধ শুঁকেই পুলিস বুঝে নেবে কেন তোমার হঠাৎ উড়বার শখ হয়েছিল।'

'খুন!' কঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'শুধু এই খবরটার জন্যে মানুষ খুন করতে পারো না তুমি।'

'পারি।' সহজ কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমরা সে অধিকার দিয়েছ আমাকে। আজই বিকেলে তোমাদের লোক খুন করেছে আমার এক লোককে, বিনা অপরাধে। কেবল তোমাদেরই হত্যা করবার অধিকার আছে, আর কারও নেই? তাছাড়া এটা হত্যা কোথায়? চেয়ে দেখো, মাত্র সত্তর ফুট, পাঁচ সেকেন্ডও লাগবে না তোমার পৌঁছতে···কারও বুঝবার ক্ষমতা নেই যে আমিই দায়ী এজন্যে। দেখো।'

উরু দিয়ে ঠেলে রেলিঙের ওপর দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে দিল রানা ওর শরীর ফুটপাথটা দেখবার সুবিধের জন্যে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে ডানহাতে কলার খামচে ধরে টেনে আনল আবার।

'কি দেখলে? কথা বলার ইচ্ছে আছে?'

গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করল লোকটা। রেলিঙের ওপর থেকে নামিয়ে ঠেলে নিয়ে এল রানা ওকে ঘরের মাঝখানে।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

লোকটা খুবই টাফ, টের পেয়েছে রানা, কিন্তু ঠিক কতটা তা কল্পনাও করতে পারেনি। এই অবস্থায় ব্যথায় আর ভয়ে আধমরা হয়ে যাওয়ার কথা লোকটার, কিন্তু কোথায় কি—পাঁই করে ঘুরল সে ডানদিকে, এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাতটা। পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল সামনের দিকে। যাদুমন্ত্রবলে দশ ইঞ্চি লম্বা একখানা ক্ষুরধার ছুরি চলে এসেছে ওর বাম হাতে। সেকেন্ডের চারভাগের একভাগ সময়ের জন্যে হকচকিয়ে গিয়েছিল রানা, সেই সুযোগে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ওর বুকের কাছে নিয়ে এল সে ছুরিটা। কিছুমাত্র চিন্তা করবার সময় পেল না রানা, আত্মরক্ষার তাগিদে খপ করে দুই হাতে ধরে ফেলল লোকটার কব্জি, ধরেই শুয়ে পড়ল পেছন দিকে, হাত ধরে জোরে টান দিল নিচের দিকে, সেইসঙ্গে ডান পা-টা ওর তলপেটে বাধিয়ে প্রাণপণে লাথি দিল ওপর দিকে। রানার শরীরের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল লোকটা ঘরের কোণে, মাথা নিচু, পা উঁচু অবস্থায় দড়াম করে ধাক্কা খেলো দেয়ালের গায়ে, তারপর চারফুট উঁচু থেকে হুড়মুড় করে পড়ল মেঝের কার্পেটের ওপর। কেঁপে উঠল সারাটা ঘর। সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে বিশ্রী একটা শব্দ এল রানার কানে।

লোকটাকে মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা আক্রমণের মোকাবিলার জন্যে, আওয়াজটা শুনেই বুঝতে পারল তাড়াহুড়োর আর কোন দরকারই নেই। দেয়াল বরাবর শুয়ে আছে লোকটা, মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে টেনে বসাবার চেষ্টা করল রানা লোকটাকে। মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের কাছে। কব্জি টিপে পালসটা দেখে নিয়েই ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। দুঃখ হলো লোকটা কোন তথ্য না দিয়েই বেরসিকের মত টপ করে মরে যাওয়ায়।

লোকটার পকেট থেকে নানান ধরনের জিনিস বেরোল: রুমাল, চিরুনি, হাতে তৈরি গাঁজার সিগারেট, আইডেন্টিটি কার্ড, বলপয়েন্ট কলম, অর্ডার

লিখবার স্ক্র্যাপ প্যাড, ইত্যাদি হরেক রকম আইটেম। প্রত্যেকটা ভালমত পরীক্ষা করে রেখে দিল রানা যথাস্থানে, শুধু স্ক্র্যাপ প্যাডের মাঝামাঝি জায়গা থেকে খসিয়ে নিল একটা কাগজ। কাগজের ওপর লেখা: MOO 144, তার নিচে আরও দুটো নম্বর 910020 আর 2797.

এসব লেখার মানে কিছুই বোধগম্য হলো না রানার কাছে, তবে কিছু একটা অর্থ থাকতে পারে মনে করে রেখে দিল সে কাগজের টুকরোটা প্যান্টের এক গোপন পকেটে। এক মিনিটের মধ্যেই ঘরটা গোছগাছ করে নিল রানা—ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন রইল না আর। পকেট থেকে ফ্লোর ওয়েটারের পিস্তলটা বের করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে, খাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সেটা বাম দিকে; কয়েক সেকেন্ড পর হালকা একটা ঝপাং আওয়াজ পেয়ে ফিরে এল আবার ঘরে। জানালাগুলো খুলে ফ্যান চালিয়ে দিল ফুলফোর্সে। সিটিংরূমে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে এল সে লাশটা। করিডরের দরজা ফাঁক করে চোখ রাখল, কেউ নেই; কান পাতল, পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না কারও। দ্রুতপায়ে লিফটের সামনে চলে এল রানা, বোতাম টিপে দাঁড়িয়ে রইল। খালি লিফট এসে থামল রানার সামনে। ভিতরে না ঢুকে পকেট থেকে একটা ম্যাচবাক্স বের করল রানা, দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ম্যাচবাক্সটা গুঁজে দিল দুই দরজার ফাঁকে। ইলেকট্রিক্যাল সারকিট কমপ্লিট করতে না পেরে আবার দুপাশে খুলে গেল দরজাটা, আবার ফিরে এল, ম্যাচবাক্সের গায়ে বাধা পেয়ে আবার হাঁ হয়ে গেল খুলে। একছুটে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা, টেনেহিঁচড়ে লাশটা নিয়ে গিয়ে পুরে দিল লিফটের মধ্যে। ম্যাচবাক্সটা বের করে নিতেই এবার ক্লিক করে লেগে গেল দরজা। লেগে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সেটা যেখানে ছিল সেখানেই। নিচে থেকে কেউ বোতাম না টিপলে থাকবে ওটা ওখানেই।

বাইরে থেকে নিজের কামরায় নকল চাবি দিয়ে তালা মেরে আবার ফায়ার এসকেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল রানা, দ্রুতপায়ে নেমে এল নিচে। এপাশ ওপাশ দেখে নেমে পড়ল রাস্তায়। লম্বা পা ফেলে মেইন রোডে বেরিয়ে এল রানা, সদর দরজা দিয়ে ঢুকল এবার হোটেলে।

সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে আরও দু'জন ইউনিফরম পরা সহকারী ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে রিসিপশন ডেস্কের ওপাশে। বেশ জোরে হাঁক ছাড়ল রানা, 'ছশো বাইশ।'

রানার দিকে পেছন ফিরে ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সাঁই করে ঘুরল গলার আওয়াজ পেয়ে। চট করে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, সামলে নিল। তারপর রানার দিকে চেয়ে হাসল ওর ঝকঝকে হাসি।

'মিস্টার রানা, আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, জানতাম না?'

মনে মনে রানা বলল: ঠিকই জানতে চাঁদ, এক্ষুণি ফ্লোর ওয়েটারকে সাবধান করতে যাচ্ছিলে। কিন্তু মুখে বলল, 'এই খানিক ঘুরে ফিরে হেঁটে এলাম আর কি। খিদে বাড়িয়ে আনলাম।'

চাবিটা নিয়ে ধীরে সুস্থে লিফটের দিকে এগোল রানা। বেশিদূর যেতে

হলো না, অর্ধেক পথ গিয়েই থমকে দাঁড়াল সে সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ চিৎকারে। পাঁচ সেকেন্ড পর থামল সাইরেন, তিন সেকেন্ড চারপাশে পিন পতন স্তব্ধতা, পুরো দম নিয়ে আবার খিঁচে আর্তনাদ ছাড়ল লিফটের সামনে দাঁড়ানো মহিলা। রঙচঙা কাপড় পরা মাঝ-বয়সী মহিলা, দুই চোখ বিস্ফারিত, মুখের গোল হাঁ দিয়ে পুরো একটা দু'টাকা দামের রসগোল্লা ঢুকিয়ে দেয়া যায় অনায়াসে। মহিলাকে থামাবার চেষ্টা করছে তার পাশে দাঁড়ানো এক বয়স্ক ভদ্রলোক, কিন্তু বেচারার নিজের অবস্থাও মহিলার চেয়ে কোন দিক থেকে ভাল নেই, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে এপাশ ওপাশ চাইছে বৎসহারা গাভীর মত। দেখে মনে হচ্ছে, সেও খানিক চিৎকার করতে পারলে বেঁচে যেত।

রানাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার লিফটের দরজার কাছে। রানাও চলল পেছন পেছন। লিফটের মুখে পৌঁছে দেখল মৃতদেহের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে লোকটা বিবর্ণ মুখে। একবিন্দু রক্ত নেই চেহারার কোথাও।

'ইয়াল্লা!' বলল রানা চোখ কপালে তুলে। 'লোকটা অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

'অসুস্থ? কী বলছেন অসুস্থ?' কটমট করে চাইল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রানার দিকে। 'ওর ঘাড়টা দেখে বুঝতে পারছেন না? মারা গেছে।'

'সত্যিই তো! খোদা! ঠিকই বলেছেন মনে হচ্ছে।' সামনে ঝুঁকে এসে ভাল করে দেখবার ভান করল রানা। 'লোকটাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'আপনার ফ্লোরের ওয়েটার ছিল ও।' কথাটা বলতে বলতে চোখজোড়া ছোট হয়ে এল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের। কিছু একটা যেন বুঝতে শুরু করেছে সে।

'তাই বলুন,' সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'সেইজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল। আহা, অল্প বয়সেই বেচারী···' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'রেস্তোরাঁটা কোন্‌দিকে?'

আকাশ থেকে পড়ল লোকটা রানার নির্বিকার প্রশ্ন শুনে।

'কি বললেন? রেস্তোরাঁ···'

'ঠিক আছে, আমিই খুঁজে নেব।' হাত নেড়ে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন আপনি।'

হোটেল কার্লটনের রেস্তোরাঁর খ্যাতি শুনেছে রানা আগেই, আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে স্বীকার করে নিল, এখানকার বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। ক্যাভিয়ার থেকে শুরু করে অসময়ের তাজা স্ট্রবেরী পর্যন্ত নিখুঁত, অপূর্ব। সোহানা আর মারিয়ার কথা একবার মনে হলো ওর তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে গিয়ে। সামান্য একটু হাসির আভাস খেলে গেল ওর ঠোঁটে। নরম সোফায় হেলান দিয়ে ব্যান্ডির গ্লাসটা তুলল সে ওপর দিকে, হাসিমুখে বলল, 'অ্যামস্টার্ডাম!'

'অ্যামস্টার্ডাম!' বলল কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড। সিটি পুলিসের ডেপুটি হেড

কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড মিনিট পাঁচেক হলো বিনা আমন্ত্রণেই এসে যোগ দিয়েছে রানার সঙ্গে। রানার সামনে একটা বড়সড় চেয়ারে বসেছে লোকটা, কিন্তু বসবার পর মনে হচ্ছে চেয়ারটা ছোট। ভদ্রলোকের দৈর্ঘ্য মাঝারি, কিন্তু প্রস্থ বিশাল। চুলগুলো লোহাটে সাদা, চোখেমুখে নির্ভীক একটা ভাব, সেইসঙ্গে রয়েছে একটা ক্ষমতার বিচ্ছুরণ—এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, কেবল উচ্চপদস্থ কর্মচারীই নয়, ভদ্রলোক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং যোগ্য। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'বেশ আমোদেই আছেন দেখছি, মেজর রানা? এতকিছু ঘটার পরও। ভাল, ভেরি গুড।'

'হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়। কিন্তু···এতকিছু কি ঘটল?'

রানার এই হালকা ভাবটা পাত্তা দিল না কর্নেল। ধৈর্যের সঙ্গে বলল, 'ওই ইসমাইল আহমেদ সম্পর্কে কোন কিছুই জানা গেল না।'

'কোন্ ইসমাইল আহমেদ? শিফল এয়ারপোর্টে যে খুন হয়েছিল, সেই লোকটা?'

'হ্যাঁ। শুধু এইটুকু জানা গেছে—মাস তিনেক আগে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এসেছিল লোকটা, উঠেছিল হোটেল স্কিলারে, কিন্তু এক রাত্রি ওখানে থাকার পর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, আর কোন খোঁজ ছিল না। যতদূর মনে হয়, আপনি যে প্লেনে এসেছেন সেই প্লেনের কোন যাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল লোকটা শিফল এয়ারপোর্টে। একজন বাঙালী এয়ারপোর্টে গেল কাউকে রিসিভ করতে, খুন হয়ে গেল, দেখা যাচ্ছে সে প্লেনের একমাত্র বাঙালী যাত্রী পিছু ধাওয়া করছে খুনীর, অথচ নিহত লোকটার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলে স্বীকার করছে না—এসব থেকে আপনার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয় লোকটা আমার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল শিফল এয়ারপোর্টে,' বলল রানা। কারণ আগে হোক আর পরে হোক, ইসমাইলের পরিচয় বের করে ফেলবে ডি গোল্ড। 'আমারই লোক।'

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বলল ডি গোল্ড মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, কিন্তু একবিন্দুও অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না তার চেহারা দেখে। 'দেখুন মেজর রানা, এটা বড়ই অন্যায় কথা। আমার দেশে আপনার লোক অপারেট করবে, অথচ আমি তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানব না···তাহলে কাজ চলবে কি করে? আমাদের আগেই জানানো উচিত ছিল ওর কথা। এই যেমন আপনার ব্যাপারে ইন্টারপোল থেকে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি আমরা, সব রকমে আপনাকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানানো হয়েছে আমাদের। আপনার কি মনে হয় না, এই রকম পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে কাজ করলে আমাদের সবার জন্যেই মঙ্গল হয়? সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন, তাই না?' ব্র্যান্ডির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল ডি গোল্ড। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখে। 'আন্দাজ করা যাচ্ছে, জরুরী কোন তথ্য ছিল এই লোকটার কাছে—গেল এখন সব। অথচ আমাদের যদি অ্যালার্ট করা হত, ব্যাপারটা নাও ঘটতে পারত।'

'হয়তো।' বলল রানা। 'ঠিক আছে, আপনার তরফ থেকে আমাকে খানিকটা সাহায্যের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা শুরু করা যেতে পারে। আপনাদের ফাইলটা একটু দেখে আমাকে জানাতে পারবেন মিস বিট্রিক্স শেরম্যানের নামে কিছু এন্ট্রি আছে কিনা? মহিলা একটা নাইট-ক্লাবে কাজ করে।'

'এয়ারপোর্টে যাকে ধাক্কা মেরেছিলেন? কি করে জানলেন ও নাইট-ক্লাবে কাজ করে?'

'ও নিজেই বলেছে আমাকে।' চোখের পলক না ফেলে ঝাড়া মিথ্যে কথা বলল রানা।

ভ্রূ কুঁচকাল ডি গোল্ড। 'কিন্তু এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালরা তো এই ধরনের কোন মন্তব্য করেনি তাদের রিপোর্টে?'

'ওদের এফিশিয়েনসি লেভেল খুব একটা উঁচু বলে মনে হয়নি আমার কাছে।'

'ঠিক বলেছেন।' কথাটা পছন্দ হয়েছে কর্নেলের। 'যাই হোক, এ খবরটা বের করতে আমার বেশি সময় লাগবে না। আপনার আর কোন তথ্য দরকার?'

'না। আপাতত এই। ধন্যবাদ।'

'আর একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলাম না আমাদের দু'জনের কেউই।'

'বলুন। কোন্ ঘটনা?'

'সাততলার ফ্লোর ওয়েটারের কথাটা। দুধে ধোয়া লোক নয়—বেশ কয়েকবার মোলাকাত হয়েছে ওর আমাদের সঙ্গে, আমাদের ফাইলের দুটো পৃষ্ঠা জুড়ে ওর নানান কীর্তিকলাপের বর্ণনা রয়েছে। এই লোকটাও আপনার নিজস্ব লোক নয়তো?'

'বলেন কী, কর্নেল।' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'না, না। আমি একবারও ভাবিনি ও আপনার লোক। বরং ভেবেছি ও আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হওয়া সম্ভব। জানেন, ঘাড় মটকে হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে?'

'তাই নাকি? বেকায়দা পড়ে গিয়েও ঘটতে পারে ব্যাপারটা। সত্যিই, খুবই দুঃখজনক।'

ব্র্যান্ডির গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল।

'আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার কোনদিন হয়নি, মেজর রানা। কিন্তু আপনার কর্মপদ্ধতির অনেক খবরই আমরা রাখি। কয়েক হাত ঘুরে হলেও আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই এসেছে আমাদের ফাইলে। এই সুযোগে আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব: পালারমো, মার্সেই বা ইস্তামবুলে যে রীতি চলে, অ্যামস্টার্ডামে সেটা প্রয়োগ করতে যাওয়া ভুল হবে।'

'আমার সম্পর্কে অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'সেজন্যেই সাবধান করা দরকার বলে বোধ করছি। অ্যামস্টার্ডামে

আমাদের সবাইকে আইনের আওতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। আমাকেও। আপনিও এর বাইরে নন।' সরাসরি চাইল আবার সে রানার দিকে। 'এখানে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারবেন না আপনি।'

'তা তো বটেই। আমি সাবধান থাকতে চেষ্টা করব। পারস্পরিক সহযোগিতার কথাটাও মনে রাখব। এবার যে কারণে আমার এখানে আসা। কখন, কোথায় আলোচনায় বসা যায়?'

'কাল সকাল দশটায়। আমার অফিসে।' নিরুৎসুক দৃষ্টি বুলাল কর্নেল রেস্তোরাঁর চারপাশে। 'এটা আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়।' রানাকে ভ্রূজোড়া উঁচু করতে দেখে বলল, 'গোপন আলোচনা আড়ি পেতে শোনার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে হোটেল কার্লটনের।'

'অবাক করলেন।' মুচকে হাসল রানা।

ভারী পা ফেলে বেরিয়ে গেল কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড, হাসিটা আর একটু বিস্তৃত হলো রানার। ভাবল—তাই যদি না হবে, তাহলে আর এই হোটেল বাছাই করলাম কেন? কর্নেল কি ভেবেছে না জেনেই ভুল করে ঢুকে পড়েছি আমি বাঘের গর্তে?

চার

কর্নেল ডি গোল্ড বসে আছে টেবিলের ওপাশে নিজের সীট ভর্তি করে, এপাশে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে রানা। মস্ত বড় ঘরটা, অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ছিমছাম আর্মি কায়দায় সাজানো—আরাম আয়েশের কোন বন্দোবস্ত নেই। আসবাব বেশির ভাগই স্টীলের। দেয়ালের গায়ে একসারি ফাইলিং ক্যাবিনেট, স্টীলের টেবিলের ওপাশে গোটা কয়েক স্টীলের আলমারি। সমস্ত ঘরেই একটা কাজ কাজ ভাব। চেয়ারগুলোও বোধহয় কর্নেলের ইচ্ছে ছিল স্টীল দিয়ে তৈরি করবার, কিন্তু এখানে অনেক ধরনের বিশিষ্ট লোকের আগমন হয় বলে ততদূর যেতে পারেনি—তবে চেয়ারের সীটগুলো এমনই শক্ত করে বানানো হয়েছে যে স্টীলকেও হার মানায়। কেউ যে এখানে আরাম করে বসে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলবে তার উপায় নেই, কাজের কথা সেরেই বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হবে চেয়ার ছেড়ে।

রানার সুবিধের জন্যেই অল্প দু'চার কথার পরই কাজের কথায় চলে এল কর্নেল।

'সব ধরনের ড্রাগের ব্যাপারেই আমরা আগ্রহী—ওপিয়াম, ক্যানাবিস, অ্যামফিটামিন, এল এস ডি, এস টি পি, কোকেন, অ্যামিল অ্যাসিটেট, সব। এদের প্রত্যেকটাই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। হয় ধ্বংস করে, নয়তো মানুষকে টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসের মুখে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাজের সুবিধের জন্যে আপাতত এদের মধ্যে ভয়ঙ্করতম যেটা, সেই হেরোইনের ব্যাপারেই আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। রাজি?'

'রাজি।' গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার কাছ থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল একহারা লম্বা, সুপুরুষ চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার গোড়ায়, পরনে চমৎকার কাটের স্যুট; বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে, চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ, মুখে একটা অমায়িক ভাব, কিন্তু বোঝা যায় পান থেকে চুন খসলেই মুহূর্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারে এই লোক অধঃস্তন কর্মচারীর ওপর। হ্যাঁ এক নজরেই চেনা যায় কোন্ পেশায় রয়েছে লোকটা—পুলিস। শুধু পুলিস নয়, দায়িত্বপূর্ণ পদের পুলিস।

দরজা বন্ধ করে হাসিমুখে এগিয়ে এল লোকটা, হাত বাড়াল সামনের দিকে। 'আমি ভ্যান ডি মাগেনথেলার। আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি, মেজর মাসুদ রানা।'

কথাটা পছন্দ হলো না রানার। কোথায় ওর সম্পর্কে কি শুনেছে জানবার আগ্রহ হলো, কিন্তু আপাতত কোন মন্তব্য না করাই স্থির করে হাসল, ঝাঁকিয়ে দিল মাগেনথেলারের বাড়িয়ে ধরা হাতটা।

আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দিল কর্নেল। 'ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার হচ্ছেন আমাদের এখানকার নারকোটিক ব্যুরোর হেড। আপনার কাজে সব রকম সাহায্য করবেন ইনি। আপনার যখন যা প্রয়োজন, শুধু মুখে উচ্চারণ করবেন, প্রয়োজন হলে সাগর সেঁচে মুক্তো তুলে আনবে মাগেনথেলার আপনার জন্যে।'

'সত্যিই সুখী হব,' বলল মাগেনথেলার, 'যদি আমরা দু'জন মিলে কিছু একটা কিনারা করতে পারি।' চেয়ারে বসে রানার দিকে ঝুঁকে এল। 'আমরা জানি, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছেন আপনি আসলে। যদিও ফিলিপ কার্টারেটের ছত্রছায়ায় এসেছেন আপনি এখানে, আমরা ধরে নিচ্ছি আপনার আসল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ট্রাফিক বন্ধ করা। কাজেই একেবারে গোড়া থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। শোনা যাক, বাংলাদেশে ঠিক কতটা অগ্রসর হয়েছেন আপনারা। সাপ্লাই রিঙ ব্রেক করবার পর্যায়ে পৌছেচেন?'

'বেশ কয়েক মাস আগেই।' বলল রানা। 'ট্রাফিক চ্যানেল সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে আমাদের, অত্যন্ত সংঘবদ্ধ একটা ডিসট্রিবিউশন পাইপ লাইনেরও সন্ধান পেয়েছি।'

'কোন্দিকে ইন্টারেস্ট আপনাদের—ট্রাফিক চ্যানেল নাকি ডিসট্রিবিউশন পাইপ লাইন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, বার্মা, ভারত আর নেপাল থেকে কিভাবে, কাদের মাধ্যমে বিরাট সব কনসাইনমেন্ট চালান হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে সেটা আমরা জানি—অর্থাৎ, ট্রাফিক চ্যানেল আমাদের সমস্যা নয়। আমরা জানি এই মাল কোথায় যাচ্ছে। আমরা জানি ফিনিশ্ড গুড হিসেবে এই মালের বিরাট এক অংশ আবার ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশে। যারা ডিসট্রিবিউট করছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের গতিবিধি আমাদের নখদর্পণে। অনেক কিছুই জানা আছে, কিন্তু আমরা যেটা জানি না সেটা হচ্ছে

বাইরে থেকে কোন্ পথে, কিভাবে ঢুকছে ফিনিশ্ড গুড আমাদের দেশে; জানি না, কে বা কারা কলকাঠি নাড়ছে গোটা ব্যবসাটার মাথায় বসে।'

'আপনি বলতে চান বাংলাদেশ হয়ে যে কাঁচামাল বাইরে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আপনারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল?' অবাক হলো ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার। 'এমন কি ফিনিশ্ড গুড যারা ডিসট্রিবিউট এবং বিক্রি করছে তাদেরও কারও কারও গতিবিধি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে আপনাদের? তাই যদি হয় তাহলে চুপচাপ বসে আঙুল চুষছেন কেন? টপাটপ সবটাকে ধরে ফেললেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না?'

মাথা নাড়ল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কি লাভ হবে, ইন্সপেক্টর? আমরা একটা রিঙ ব্রেক করব, একটা মাস অচল হয়ে যাবে ওদের সবকিছু, কিন্তু একমাসের মধ্যেই আরও আন্ডারগ্রাউন্ডে আরও সাবধানে চালু হয়ে যাবে আরেকটা রিঙ—যাদের খুঁজে বের করা আরও মুশকিল হবে। আমরা যতবার ভাঙব, ততবারই ওরা আরও নিত্য নতুন কৌশলের আশ্রয় নেবে। আমরা গোড়াটা ধ্বংস করতে চাই। শুধু কিভাবে পাঠানো হচ্ছে আমার দেশে হেরোইন সেটা জানলেই চলবে না, আমরা জানতে চাই কে পাঠাচ্ছে ওসব।'

'আপনার অনুমান—অবশ্য তা নইলে এখানে এসে হাজির হতেন না আপনি—যে হেরোইনের সাপ্লাইটা যাচ্ছে এখান থেকে, কিংবা আশেপাশেরই কোন জায়গা থেকে?'

'আশেপাশের কোন জায়গা থেকে নয়। যাচ্ছে এখান থেকেই। আর এটা অনুমান নয়। আমার ধারণা। আমি জানি। আমরা যাদের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছি, তাদের শতকরা নব্বই ভাগেরই যোগাযোগ রয়েছে এদেশের সঙ্গে…আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, অ্যামস্টার্ডামের সঙ্গে। নব্বই ভাগই তাই। এখানে হয় আত্মীয়স্বজন আছে, নয়তো বন্ধুবান্ধব আছে; হয় বিজনেস কন্ট্যাক্ট আছে, নয়তো নিজেদের ব্যবসা আছে, অথবা ছুটি কাটাতে আসে এখানে প্রায়ই। গত একটা বছর ধরে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি করেছি আমরা ওদের ডোশিয়ে।'

'অর্থাৎ, আপনারা সেন্ট পার্সেন্ট শিওর?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'ফাইভ হানড্রেড পার্সেন্ট।'

মাগেনথেলার জিজ্ঞেস করল, 'ওই ডোশিয়ের কপি আছে?'

'আছে। একটা।'

'আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গেই আছে?'

'হ্যাঁ। অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায়।' নিজের মাথায় টোকা দিয়ে দেখাল রানা।

'খুবই নিরাপদ জায়গা, সন্দেহ নেই,' বলল কর্নেল ডি গোল্ড। মাথা ঝাঁকাল। তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার এমন

লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে যে কিনা আপনারই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে অভ্যস্ত।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কর্নেল।'

'জটিল ধাঁধা আর রূপকে কথা বলা আমার একটা বদভ্যাস,' অমায়িক ভঙ্গিতে বলল কর্নেল, পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, স্বীকার করে নিচ্ছি। সবদিক থেকে আঙুল দেখাচ্ছে সবাই এখন নেদারল্যান্ডের দিকে। আমাদের এই দুর্নামের কথা আমরা যে জানি না তা নয়। আমরাও জানি। এই দোষারোপ যদি অসত্য হত, সুখী হতাম। কিন্তু আমরা জানি, বিরাট সব কনসাইনমেন্ট আসছে বার্মা, ভারত, নেপাল আর টার্কি থেকে। আমরা জানি, পপি রূপান্তরিত হচ্ছে হেরোইনে আমাদের এখানেই; জানি, এখান থেকে আবার ছড়িয়ে পড়ছে সারা দুনিয়াময়—শুধু জানি না কোথায়, কিভাবে কি হচ্ছে।'

'অথচ এটা আপনাদের এলাকা।' নরম গলায় বলল রানা।

'অর্থাৎ?'

'আইন রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।'

'এই দোষারোপের সঙ্গে আমরা অপরিচিত নই, মেজর মাসুদ রানা।' ভ্রূ কুঁচকে বলল মাগেনথেলার। 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যে আমরা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছি না সেটাও বহুবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে আমাদের বহু দেশ। কিন্তু দোষারোপ করে কি বন্ধুত্ব অর্জন সম্ভব?'

'আমি এখানে বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে আসিনি, ইন্সপেক্টর। ইন্টারপোল থেকে দায়িত্ব নিয়ে এসেছি কাজে।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল কর্নেল ডি গোল্ড। 'আপনার কাজটা হচ্ছে, যারা মানুষকে ধ্বংস করছে তাদের ধ্বংস করা। আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমরা। আপনার সম্পর্কে চমৎকার একটা ডোশিয়ে রয়েছে আমাদের কাছে। দেখতে চান?'

'অতীত ইতিহাস ঘাঁটতে আমার ভাল লাগে না।'

'সেটাই স্বাভাবিক।' ঘন ঘন মাথা দোলাল কর্নেল। 'তবে একটা কথা আপনাকে আমি বলব, মেজর রানা। পৃথিবীর সেরা পুলিস ফোর্সও কোন না কোন সময় দুর্লংঘ প্রাচীরের সম্মুখীন হতে পারে। আমরা শ্রেষ্ঠ—সে দাবি করছি না, কিন্তু তেমনি বাধার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। শুধু একটা লীড দিন আমাদের, সামান্য একটা ছিদ্র দেখিয়ে দিন; তারপর দেখুন আমাদের ক্ষমতা। হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করবার মত কোন প্ল্যান বা তথ্য রয়েছে আপনার হাতে?'

'এত তাড়াতাড়িই?' হাসল রানা। পকেট থেকে ফ্লোর ওয়েটারের কাছে পাওয়া স্ক্র্যাপ প্যাডের পাতাটা বের করে এগিয়ে ধরল কর্নেলের দিকে। 'মাত্র গতকাল বিকেলে পৌঁছেচি আমি এখানে এসে। আচ্ছা, দেখুন তো, এই অক্ষর আর নম্বরগুলোর কোন অর্থ আপনার মাথায় খেলে কিনা?'

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কটমট করে চাইল

কর্নেল ওটার দিকে, যেন ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে নম্বরগুলোকে; উজ্জ্বল ডেস্কল্যাম্পের আলোর নিচে উল্টেপাল্টে দেখল কাগজটা, তারপর নামিয়ে রেখে মাথা নাড়ল। 'নাহ্।'

'সত্যিই কোন মানে আছে কিনা বের করার ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'তা পারা যায়। এসব ব্যাপারে যোগ্য লোক আছে আমাদের। আগামী কাল জানাতে পারব আপনাকে। যাই হোক, কোথায় পেলেন এটা?'

'একজন দিয়েছে।'

'তার মানে কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন আপনি এটা।'

'দুটো কথায় তফাৎ আছে?'

'অবস্থা বিশেষে আকাশ পাতাল তফাৎ হতে পারে, মেজর রানা।' ডেস্কের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে। 'শুনুন মেজর রানা, আমরা আপনার টেকনিকের কথা জানি। আমরা জানি, মানুষকে কিভাবে বেকায়দায় ফেলে কাজ উদ্ধার করেন; জানি, প্রয়োজন মনে করলে আইনের বেড়া ডিঙিয়ে যেতে আপনার বাধে না...'

'এসব কী বলছেন, কর্নেল।'

'যা বলছি, জেনেশুনেই বলছি। আমরা জানি, আপনার এই মেথডে অনেক দ্রুত কাজ হতে পারে, কিন্তু এটা আত্মহত্যারই নামান্তর। প্রতিপক্ষকে চরম ভাবে উত্যক্ত করলে, তাকে একের পর এক অসুবিধেয় ফেললে, প্রোভোকেট করলে শো-ডাউনটা এগিয়ে আসে কয়েক ধাপ সামনে, তা ঠিক; কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, মেজর রানা, দয়া করে এখানে বেশি লোককে প্রোভোকেট করতে যাবেন না। রিপিট করছি—এটা আত্মহত্যারই নামান্তর। অ্যামস্টার্ডামে খালের সংখ্যা অনেক।'

'ঠিক আছে, কর্নেল। কাউকে প্রোভোক করব না। সাবধানে থাকব। যতদূর সম্ভব।'

'দ্যাটস গুড।' স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল কর্নেল। 'এবার মাগেনথেলার হয়তো আপনাকে খানিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু দেখাতে চাইবে।'

বেশ অনেক কিছুই দেখাবার রয়েছে মাগেনথেলারের, বোঝা গেল। মার্নিক্সস্ট্রাটের পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে মাগেনথেলারের কালো ওপেলে চড়ে সিটি মরচুয়ারীতে পৌঁছল রানা। বিশাল এক ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকল অ্যাটেনড্যান্ট আর ইন্সপেক্টরের পিছু পিছু। ঘরের মাঝখানে লাইন দিয়ে সাজানো রয়েছে দুই সারি সাদা স্ল্যাব, দুটো মাত্র খালি—বাদবাকি সবকটার ওপর সাদা কাপড় ঢাকা লাশ শুয়ে আছে টান টান হয়ে। চারপাশের দেয়াল জুড়ে ফাইলিং ক্যাবিনেটের মত অসংখ্য স্টীলের ড্রয়ার। রানা জানে, এইসব ড্রয়ারের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লাশ, রেফ্রিজারেটেড। ডিজিনফেক-ট্যান্টের তীব্র গন্ধে নাক কুঁচকাল সে। ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে দেয়ালের গায়ের একটা স্ল্যাব টেনে বের করল অ্যাটেনড্যান্ট ক্যাচ সরিয়ে। সাদা কাপড়ে ঢাকা রয়েছে লাশটা আপাদমস্তক।

'ক্রোকুইস্কেড ক্যানেলে পাওয়া গেছে এটা,' বলল মাগেনথেলার চেষ্টাকৃত নিরুত্তাপ কণ্ঠে। 'হ্যান্স গার্বার। বয়স উনিশ। না দেখাই ভাল, বেশ কয়েকদিন পানিতে ছিল বলে ওটা আর দেখার যোগ্য নেই। তবে হাতটা দেখতে পারেন।'

চাদরটা সামান্য উঁচু করতেই একটা ফোলা হাত দেখতে পেল রানা। মনে হচ্ছে কেউ যেন মোরব্বার মত কেচেছে হাতটা কাঁটাচামচ দিয়ে, কিংবা স্পাইক লাগানো জুতো পায়ে আচ্ছামত মাড়িয়েছে ওটাকে। লাল, নীল, সবুজ—নানান রঙ দেখা যাচ্ছে ক্ষতচিহ্নগুলোর আশে পাশে। কোন মন্তব্য না করেই হাতটা ঢেকে দিয়ে পিছন ফিরল মাগেনথেলার। হড়হড় করে ঢুকিয়ে দিল অ্যাটেনড্যান্ট স্ল্যাবটা।

খানিক বাঁয়ে সরে আর এক সারি স্ল্যাবের সামনে দাঁড়াল মাগেনথেলার। বলল, 'এরও মুখটা দেখাতে চাই না আমি আপনাকে। একুশ বছরের এক তরুণের মুখ যদি সত্তর বছরের বুড়োর মত দেখতে হয়, সেদিকে তাকানো যায় না।' অ্যাটেনড্যান্টের দিকে ফিরল। 'তেষট্টি নম্বরটা খোলো। কোথায় পাওয়া গিয়েছিল এটাকে?'

'উস্টারহুকে। একটা কয়লার বার্জে।' ক্যাচ সরিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল লোকটা হ্যানডেল ধরে।

মাথা ঝাঁকাল মাগেনথেলার। 'ঠিক। সঙ্গে বোতল ছিল একটা। খালি বোতল। জিনের। আধ বোতল জিন পাওয়া গিয়েছিল ওর পেটে। হেরোইনের সঙ্গে জিনের সম্পর্কটা জানা আছে আপনার?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সাদা কাপড় সরিয়ে এরও হাতটা দেখাল সে কয়েক সেকেন্ড। দার্শনিক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হত্যা—না আত্মহত্যা?'

'একটু খোঁজ নিলে হয়তো বের করতে পারতেন আসল ব্যাপারটা।'

'কিভাবে? বোতলটা কার কেনা সে খবর সংগ্রহ করে?'

'হ্যাঁ। ওর নিজের কেনা হলে এটা হবে হয় আত্মহত্যা, নয়তো দুর্ঘটনা। কেউ যদি আধ বোতল জিন ওর হাতে তুলে দিয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা হত্যা। ঠিক এই ধরনের একটা কেস হয়েছিল মাস ছয়েক আগে আমাদের বাংলাদেশে—চট্টগ্রামে। তিনদিনের মধ্যে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিস খুনীকে।'

'আমরাও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বোতলে কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি···এমন কি এই ছেলেটিরও না। ব্যাচ নাম্বার মিলিয়ে যে খোঁজ করব, তারও উপায় ছিল না। লেবেলই ছিল না বোতলে।'

এবার ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এল ওরা। মার্বেল পাথরের মত দেখতে একটা সাদা স্ল্যাবের ধারে দাঁড়িয়ে মুখের কাপড় সরাল এবার মাগেনথেলার একটা লাশের। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। মনে হচ্ছে ঠিক ঘুমিয়ে আছে। একগোছা সোনালী চুল লেপটে আছে চিবুকের কাছে।

'সুন্দর না?' জিজ্ঞেস করল মাগেনথেলার। ওর কণ্ঠস্বরে শীতল একটা উষ্মা টের পেল রানা। 'একটা রেখা নেই, নিষ্পাপ, পবিত্র মুখটা। রোজমেরী

ডুনিং। আমেরিকান। বয়স—ষোলো। আর কিছুই জানা যায়নি এর সম্পর্কে।'

'কি হয়েছিল?'

'সাততলার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল নিচে ফুটপাথের ওপর।'

চট করে হোটেলের ফ্লোর ওয়েটারের কথা মনে পড়ে গেল রানার। হয়তো ওকেও পাওয়া যাবে এই মরচুয়ারীর কোন না কোন স্ল্যাবের ওপর। জিজ্ঞেস করল, 'নিজেই, নাকি ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করেছিল কেউ?'

'নিজেই। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হচ্ছে: হিপ্পিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মেয়েটা, বাড়ির জন্যে মন টেনেছিল, হঠাৎ ছাতের প্যারাপেটের ওপর লাফিয়ে উঠে উড়ে চলে যেতে চেয়েছিল মায়ের কাছে। ভাগ্যিস ফুটপাথের ওপর তখন আর কেউ ছিল না। আরও দেখবেন কয়েকটা? কাল রাতে কার্লটন হোটেলে মারা পড়েছে একটা জাংকি··· দেখবেন ওটাকে?'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল রানা। 'এসব আমার কাছে নতুন নয়। এই একই দৃশ্য দেখে এসেছি আমি ঢাকার মর্গে। তারচেয়ে কোথাও বসে একঢোক ব্র্যান্ডি খাওয়া যাক বরং··· কি বলেন?'

'ঠিক বলেছেন। এসব দেখার চেয়ে ব্র্যান্ডি অনেক ভাল।' হাসল মাগেনথেলার, কিন্তু সে হাসিতে রসকষ নেই—নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। 'আমার বাসায় চলুন। বেশি দূরে না। আপনাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে।'

'কারণ?'

'চলুন, দেখবেন।'

বাইরে বেরিয়ে রানা দেখল, আঁধার হয়ে এসেছে আকাশটা আজ সকাল সকালই। পুবদিকটা ধূসর মত দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদেই বৃষ্টি নামবে বড় বড় ফোঁটায়। সারা আকাশ জুড়ে মলিন বিষণ্ণতা। মনে মনে ভাবল সে, বহুদিন পর মনের ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির মিল পাওয়া গেল। ভারাক্রান্ত মনে কালো ওপেলে গিয়ে উঠল সে মাগেনথেলারের পিছু পিছু।

পাঁচ

ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারের ড্রইংরুমে ঢুকেই মনের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেল রানার। সেন্ট্রাল হিটেড ঘরের সবখানে উজ্জ্বল, খুশি খুশি রঙ। জানালার কাঁচে বিড়বিড় করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, কুলকুল করে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে কাঁচের ওপর দিয়ে। সব শীতলতা, সব মলিনতা গলে যাচ্ছে, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে এ ঘরের বাইরে—ঢুকতে পারছে না ভিতরে। ভারী ডাচ ফার্নিচারে সুন্দর করে সাজানো ড্রইংরুম, নরম গদি আঁটা আর্মচেয়ার রয়েছে কয়েকটা। রঙচঙে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বসে পড়ল রানা একটা চেয়ারে। ঘরের এককোণে বড়সড় একটা লিকার কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কোন্ বোতলটা বের করবে সে ব্যাপারে মনস্থির করবার চেষ্টা করছে

মাগেনথেলার। খানিক ইতস্তত করে একটা তিনকোনা বোতল থেকে দুটো গ্লাসে প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ সোনালী তরল পদার্থ ঢেলে নিয়ে চলে এল রানার সামনে। একটা টিপয়ের ওপর রানার গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে নিজেরটা হাতে নিয়ে বসল মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ারে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে, মেজর মাসুদ রানা। আপনার সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, আপনি এসপিয়োনাজের লোক, দুর্ধর্ষ এক স্পাই···ড্রাগস তো আপনার লাইন নয়? এসবে তো আপনার আগ্রহী হওয়ার কথা নয়? আপনি এর মধ্যে এলেন কি মনে করে?'

'আমি এই লাইনের লোক নই, খবরটা ঠিকই শুনেছেন। আমার চীফ যখন প্রথম আমাকে এ ব্যাপারে কাজ করবার প্রস্তাব দেন, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সে প্রস্তাব। এই একই যুক্তিতে। কিন্তু আমার বস্ যখন আমাকে সাথে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে নিয়ে গিয়ে লাশগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যখন নিজ চোখে দেখলাম সারি সারি বাঙালী যুবক-যুবতীর মৃতদেহ, তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না কিছুতেই। কোন দেশপ্রেমিক স্থির থাকতে পারে না সে দৃশ্য দেখে। আমিও পারিনি। আমার মনে হয়েছে, কেবল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যই নয়, ভয়ঙ্কর ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতি রয়েছে; তরুণদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কোন আক্রোশ আর প্রতিশোধের মনোভাব রয়েছে এদের লীডারের মধ্যে। বিকৃত এক ধরনের আনন্দ লাভ করছে লোকটা কাঁচা বয়স, বিক্ষোভ আর হতাশার শিকার হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুণ তরুণীর চরম সর্বনাশ করে। ধ্বংসযজ্ঞে নেমেছে যেন এক নির্মম ম্যানিয়াক। মনস্থির করতে আর কোন কষ্ট হয়নি আমার।'

রানার বক্তব্যটা বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনে নেড়েচেড়ে বুঝে দেখল মাগেনথেলার। চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক, তারপর বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

'আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'আমাকে মরচুয়ারী থেকে ঘুরিয়ে আনবার পেছনে নিশ্চয়ই আপনার কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। কিছু একটা বোঝাতে চাইছেন আপনি আমাকে। কি সেটা?'

'একটা নয়, কয়েকটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছি আমি আপনাকে।' ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে একটা সাইড টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে গ্লাসটা। রানাকে সিগারেট ধরাবার সময় দিয়ে শুরু করল: 'প্রথমত আমি আপনাকে জানাতে চাই, সমস্যাটা আপনাদের ওখানে ঠিক যতখানি, আমাদের এখানে তার চেয়ে কম প্রকট নয়। বরং বেশি। সিটি মরচুয়ারীতে ওই রকম আরও অন্তত বিশটা লাশ রয়েছে। সব হেরোইনের শিকার। সব সময় এত বেশি হয় না, মৃত্যুর হারটা জোয়ার ভাঁটার মত কমে বাড়ে, ইদানীং একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। কচি কচি ছেলেমেয়েদের লাশই বড় কথা নয়, আরও কত হাজার নেশাগ্রস্ত যুবক যে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত, তার

হিসেব কোথাও লেখা নেই।'

'অর্থাৎ, আপনি আমাকে জানাতে চান, যে এই গোপন দলটাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আমার চেয়ে কোন অংশে কম আগ্রহী নন আপনারা—যে, একই শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করছি আমরা; আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন?'

'ঠিকই ধরেছেন। এক এবং অভিন্ন।'

'দ্বিতীয় উদ্দেশ্য?'

'আমি চেয়েছি কর্নেল ভি গোল্ডের সাবধানবাণীটা আপনাকে দিয়ে আরও গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করাতে। ওরা ঠিক কতটা রুথলেস, কতখানি ভয়ঙ্কর দেখাতে চেয়েছি আমি আপনাকে মরচুয়ারীতে নিয়ে গিয়ে। যদি ওদের বেশি কাছে যান, যদি বেশি বিরক্ত করেন··· কি বলব, এখনও কয়েকটা সীট খালি আছে মরচুয়ারীতে।'

লম্বা করে টান দিল রানা সিগারেটে। বাড়ির ভিতরে একটা টেলিফোন বেজে উঠল। বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল মাগেনথেলার ভিতরে। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা দরজা খুলে গেল, সুন্দরী এক যুবতী ঢুকল ড্রইংরুমে। লম্বা একহারা চেহারা, বয়স বড়জোর বিশ কি বাইশ। একটা ড্রাগন আঁকা রঙচঙে হাউজ কোট দিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা। কুচকুচে কালো চুল মেয়েটার, ডিম্বাকৃতি মুখ, আয়ত চোখ দুটো বেগুনী রঙের। উঠে দাঁড়াল রানা।

'হ্যালো। আমি মাসুদ রানা।' আর কি বলবে বুঝে পেল না সে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে মেয়েটাও যেন একটু হতচকিত হয়ে পড়ল। চট করে বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে চুষে নিল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ঝিক করে হাসল। পরিপাটি, ঝকঝকে একসারি দাঁত।

'আমি ইরিন। ভাল ইংরেজি বলতে পারি না কিন্তু।' মিষ্টি গলায় বলল মেয়েটা।

দু'পা এগিয়ে হাত বাড়াল রানা হ্যান্ডশেকের জন্যে। কিন্তু হাতটা ধরবার কোন লক্ষণ দেখা দিল না মেয়েটার মধ্যে। তর্জনী কামড়ে ধরে হেসে উঠল খিলখিল করে। লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। এত বড় একটা মেয়ের এই রকম ব্যবহারে একেবারে থতমত খেয়ে গেল রানা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল পাশের ঘরে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ হতেই। মাগেনথেলার এসে ঢুকল ড্রইংরুমে।

'রুটিন কল। জরুরী কিছু না, এয়ারপোর্ট থেকে···' মেয়েটাকে দেখে কথার মাঝখানেই থেমে গেল মাগেনথেলার, মৃদুহেসে এগিয়ে এসে সস্নেহে হাত রাখল ইরিনের কাঁধে। 'পরিচয় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?'

'পরিচয় পর্বের মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিলাম···' বলতে বলতে থেমে গেল রানা। দেখল, মাগেনথেলারের কানে কানে কথা বলছে ইরিন ফিসফিস করে, চকচকে চোখে রানার দিকে চাইছে বাঁকা দৃষ্টিতে। মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল মাগেনথেলার, ছুটে বেরিয়ে গেল ইরিন ঘর থেকে। হতভম্ব রানার দিকে চেয়ে আবার হাসল মাগেনথেলার, ম্লান হাসি।

'এক্ষুণি ফিরে আসবে আবার, দেখবেন। অপরিচিত লোকের সামনে প্রথমটায় লজ্জা পায় ও একটু, কিন্তু সহজ হতেও সময় লাগে না মোটেই।'

ঠিকই। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল ইরিন। কোলে একটা বড়সড় পুতুল। পুতুলটা এত সুন্দর করে তৈরি যে প্রথম দেখলে মনে হয় সত্যিই জ্যান্ত বাচ্চা বুঝি। প্রায় তিনফুট লম্বা, মাথায় সাদা একটা টুপি, টুপির নিচে কোঁকড়া সোনালী চুল দেখা যাচ্ছে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা সিল্কের পোশাক পরা, চমৎকার এমব্রয়ডারি করা বডিস গায়ে। শক্ত করে ধরে আছে ইরিন পুতুলটাকে, যেন সত্যিকারের বাচ্চা, ঢিল দিলে পড়ে যাবে। হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল মাগেনথেলার ইরিনকে, একহাতে জড়িয়ে ধরে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এটা আমার মেয়ে, ইরিন। আর ইনি আমার এক বন্ধু—বাংলাদেশের লোক, মেজর মাসুদ রানা।'

এবার অসঙ্কোচে এগিয়ে এল ইরিন, হাত বাড়াল মৃদু হেসে।

'হাউ ডু ইউ ডু, মেজর রানা?'

ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে রানাই বা কম যাবে কেন, স্মিত হাসি হেসে বো করল সে সামান্য, হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'মিস মাগেনথেলার। মাই প্লেযার।'

'মাই প্লেযার।' বলেই কথাটা বলা ঠিক হলো কিনা জানার জন্যে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল বাপের দিকে।

'ইংরেজি ভদ্রতার সাথে খুব একটা পরিচয় নেই ইরিনের,' কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল মাগেনথেলার। তারপর শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে! দাঁড়িয়ে কেন? বসুন, বসে পড়ুন।' বলে নিজেই ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে, তুলে নিল ব্র্যান্ডির গ্লাসটা।

রানাও বসল। পুতুল কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইরিন, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রয়েছে সে রানার মুখের দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল রানা। এই অস্বাভাবিক পরিবেশে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে না পেরে ক্রমেই বাড়ছে অস্বস্তিবোধ। মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি বসবে না?'

চকচকে চোখে চাইল ইরিন বাপের দিকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানার কথায়, তারপর পুতুলটা বাপের হাতে দিয়ে সোজা এসে চড়ে বসল রানার কোলে। একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর নেই ইরিনের মুখে, যেন এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ হয়েছে, এমনি ভঙ্গিতে একহাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, তারপর মিষ্টি করে হাসল চার ইঞ্চি দূর থেকে সোজা রানার চোখের দিকে চেয়ে। রানাও হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা হাসির চেয়ে ভ্যাংচানোর মতই দেখাল বেশি।

উজ্জ্বল চোখে খানিকক্ষণ রানাকে দেখবার পর ঘোষণা করল ইরিন, 'তুমি খুব ভাল। তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, ইরিন,' বলল রানা। কতটা ভালবাসে বোঝাবার জন্যে ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিল দুটো। হাসিমুখে চোখ বন্ধ করল ইরিন, মাথাটা রাখল রানার কাঁধে। ওর মাথার ওপর দিয়ে মাগেনথেলারের

দিকে চাইল রানা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। মলিন হাসি হাসল মাগেনথেলার। হাসিতে ঝরছে দুঃখ।

'ইরিন আসলে সবাইকে ভালবাসে, মেজর মাসুদ রানা। আশা করি আহত বোধ করবেন না এ খবরে।'

'না, না। আহত হওয়ার কি আছে? একটা বিশেষ বয়সের সব মেয়েই তাই করে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল মাগেনথেলার রানার দিকে। 'আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আপনার বোধশক্তি!'

এর মধ্যে তীক্ষ্ণতাটা কোথায় বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল রানা কিছুক্ষণ। তারপর ইরিনের দিকে ফিরে নরম গলায় ডাকল, 'ইরিন?'

উত্তর দিল না ইরিন। মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, একটু নড়েচড়ে আরও ভাল করে মাথা গুঁজল রানার ঘাড়ে, চোখদুটো শক্ত করে টিপে বন্ধ করে রেখেছে। হাসির মধ্যে এতই সহজ সরল নিষ্পাপ একটা তৃপ্ত ভাব দেখতে পেল রানা যে কেন যেন নিজেকে ঠগবাজ মত মনে হলো ওর।

আবার চেষ্টা করে দেখল রানা। 'ইরিন, আমার মনে হয় তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর। দেখি তো সত্যি কিনা?'

কথাটা ভেবে দেখল ইরিন চোখ বুজেই, হাসল আবার, তারপর রানার কোলের ওপর সোজা হয়ে বসে হাত দুটো সোজা রেখে দুই হাতে ধরল রানার দুই কাঁধ, চোখ দুটো বড় বড় করে চাইল রানার চোখে—ঠিক বাচ্চা মেয়ের মত।

অপূর্ব দুটো আয়ত বেগুনী চোখ, চকচক করছে—কিন্তু ভাল করে লক্ষ করতেই টের পেল রানা, দৃষ্টিটা শূন্য। চকচকে, উজ্জ্বল ভাবটা আসলে বাইরের ব্যাপার, তার পেছনেই আশ্চর্য এক ভাবলেশহীন অন্তঃসারশূন্যতা। আস্তে করে ওর ডান হাতটা সরাল রানা কাঁধ থেকে, কোটের আস্তিনটা তুলে ফেলল কনুই পর্যন্ত। ক্ষতবিক্ষত হাত। হাইপোডার্মিক সূঁচের অসংখ্য খোঁচায় দগদগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে। হাসি মুছে গেছে ইরিনের মুখ থেকে, নিচের ঠোঁটটা কাঁপল একটু, ভয়ে ভয়ে চাইল রানার মুখের দিকে—যেন আশা করছে এক্ষুণি বকবে ওকে রানা। ঝট করে কোটের হাতা নামিয়ে দিল, পরমুহূর্তে দুই হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল। এমনভাবে কাঁদছে, যেন ওর বুক ভেঙে গেছে পুত্রশোকে। ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা, ওর মাথার ওপর দিয়ে চাইল মাগেনথেলারের দিকে।

'এবার বুঝতে পারছি আমাকে আপনার বাসায় নিয়ে আসবার কারণ।'

'ঠিকই বুঝতে পেরেছেন,' বলল মাগেনথেলার। 'আমার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের বিষয়টা জানানো আমি কর্তব্য বলে মনে করি।'

'ডি গোল্ড জানেন?'

'অ্যামস্টার্ডামের প্রত্যেক সিনিয়র পুলিস অফিসারই জানেন,' বলল মাগেনথেলার সহজ কণ্ঠে। ইরিনের দিকে চাইল। 'ইরিন?'

কোন জবাব না দিয়ে আরও আঁকড়ে ধরল ইরিন রানাকে। দম বন্ধ

হওয়ার যোগাড় হলো রানার। এবার একটু কড়া গলায় ডাকল মাগেনথেলার, 'ইরিন? ঘুমোতে যাও। তুমি জানো ডাক্তার কি বলেছে। সোজা বিছানায় গিয়ে ঢোকো—যাও, লক্ষ্মী।'

'না,' ফুঁপিয়ে উঠল ইরিন। 'ঘুম আসছে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গলার স্বর উঁচু করল ইন্সপেক্টর: 'মারগ্রিয়েট!'

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এই ডাকের জন্যেই দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়েছিল—এমনি ভাবে, ঘরে ঢুকল খোদাতালার আশ্চর্য এক সৃষ্টি। এত মোটা মেয়েমানুষ জীবনে দেখেনি রানা। দুটো রানা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়ালেও বেড় পাবে না। অবিকল ইরিনের পুতুলের মত জামা-কাপড় পরা। লাল ফিতে দিয়ে পিগটেল বাঁধা লম্বা চুল গলার দু'পাশ দিয়ে বিশাল বুকের ওপর লুটাচ্ছে। বুড়ি। কমপক্ষে সত্তর বছর বয়স হবে। গালের এবং হাতের ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আরও মোটা ছিল, শুকিয়ে এই হাল হয়েছে বেচারীর। চেহারা, বয়স, চুলের লাল ফিতে আর রঙেচঙে জামা কাপড়ে মেয়েলোকটাকে রীতিমত বিদঘুটে লাগল রানার চোখে। কিন্তু মাগেনথেলারের কাছে যে মোটেই বিসদৃশ লাগছে না বোঝা গেল তার সহজ ভঙ্গিতে ইরিনকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চোখের ইশারা দেখে।

বিশাল বপু নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এল মারগ্রিয়েট, রানার প্রতি ছোট্ট একটা নড করে হাত রাখল ইরিনের কাঁধে। চট করে মাথা তুলল ইরিন, মুহূর্তে কান্না ভুলে হেসে উঠল ঝিক করে, রানার গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাগেনথেলারের হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে চুমো খেল ওর গালে, রানার চেয়ারের সামনে এসে রানার গালেও চুমো খেল একটা, তারপর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—হেলেদুলে ওর পেছনে পেছনে চলে গেল মারগ্রিয়েট। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরল রানা।

'আগেই সাবধান করা উচিত ছিল আপনার,' অনুযোগের সুরে বলল রানা। 'ইরিন আর মারগ্রিয়েট—দুজনের ব্যাপারেই। চমকে গিয়েছি একেবারে। কে মহিলা—মানে, মারগ্রিয়েটের কথা জিজ্ঞেস করছি—নার্স?'

'যাইডার যীর হাইলার দ্বীপে ওর বাড়ি। বহু পুরানো লোক···আমি ছোট থাকতে কাজে লেগেছিল আমাদের বাড়িতে, মানে বাপের বাড়িতে। বছর খানেক আগে আবার এসে হাজির—কাজ দাও। ইরিনের জন্যে রেখে দিলাম ওকে। কাপড়চোপড়ে পুরানো আমলের ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে, ওই দ্বীপের সবাই তাই—শহরে দেখতে একটু উদ্ভটই লাগে, কিন্তু ইরিনের ব্যাপারে দারুণ কাজ দিচ্ছে বুড়ি।'

'আচ্ছা।' বলল রানা। 'আর ইরিন?'

'আট বছর ওর বয়স। গত পনেরো বছর ধরে আট বছরেরই রয়ে গেছে। চিরকাল ওই আট বছরই থাকবে। আমার নিজের মেয়ে না—হয়তো অনুমান করেছেন; কিন্তু নিজের মেয়ের চেয়ে কমও না। আমার বড় ভাইয়ের পালিতা কন্যা। একটা ডাচ অয়েল কোম্পানীতে সিকিউরিটি অফিসার ছিল আমার বড় ভাই। ওর স্ত্রী মারা গেছে কয়েক বছর আগেই, গত বছর ও আর আমার স্ত্রী

মারা গেছে একটা মোটর দুর্ঘটনায়। কে নেবে ইরিনকে? সাত-পাঁচ ভেবে আমিই রেখে দিলাম। প্রথমটায় দায়িত্ব আর ঝামেলা ঘাড়ে করতে চাইনি—এখন এমন দাঁড়িয়েছে, ওকে ছাড়া বাঁচব বলে মনে হয় না। মানসিক বয়স বাড়বে না ওর কোনদিন।'

লোকটার অবস্থা চিন্তা করে বেশ দুঃখই হলো রানার। কে ভাবতে পারবে, এমন একটা ডাকসেঁটে পুলিস অফিসারের অপরাধী ধরে ধরে জেলে পোরা ছাড়া আরও কোন ব্যক্তিগত গোপন দুঃখ বা সমস্যা থাকতে পারে? বিশেষ করে এই ধরনের সমস্যা। সহানুভূতি বা সান্ত্বনা ওর তেমন ভাল আসে না, তাই সেদিকে না গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'এই যে নেশা—কবে এর খপ্পরে পড়ল?'

'আল্লাই মালুম। বহু বছর আগে। আমার ভাই যখন টের পেল তারও বেশ কয়েক বছর আগে।'

'কয়েকটা দাগ দেখলাম নতুন?'

'উইথড্রয়াল ট্রিটমেন্ট চলছে ওর। ঝট করে বন্ধ করে দিলে মারাই যাবে বেচারী। কিন্তু আসল সমস্যা সেটা নয়—প্রায়ই কারা যেন ওকে ফুল-ডোজ দিয়ে যায় গোপনে। বাজপাখির মত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ওর ওপর মারগ্রিয়েট। রোজ সকালে ভন্ডেল পার্কে নিয়ে যায়—ওখানে পাখিদের বুট খাওয়াতে খুব ভালবাসে ইরিন। দুপুরে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে আমি প্রায়ই থাকি না, মারগ্রিয়েটও হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে—সেই ফাঁকে কাজ হাসিল করে চলে যায় ওরা।'

'ওকে ওয়াচ করবার ব্যবস্থা করেননি?'

'বহুবার। কিভাবে ওর কাছে সাপ্লাই পৌঁছায় কেউ ধরতে পারেনি।'

'আপনাকে বাগে আনবার জন্যে ওর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করছে ওরা?'

'এছাড়া আর কি হতে পারে? আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। টাকা দিয়ে কেনে, না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত; টাকা নেই ইরিনের। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই হেরোইন সাপ্লাই দিচ্ছে ওরা ইরিনকে। ওরা জানে না, চোখের সামনে মরে যেতে দেখব ইরিনকে, তবু কম্প্রোমাইজ করব না আমি কিছুতেই। যত ভাবে যত চেষ্টাই করুক, নোয়াতে পারবে না ওরা আমার মাথা। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করছে না তাই বলে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা গার্ডের ব্যবস্থা করা যায় না?'

'সেটা করতে গেলে খাতিরে হবে না, ব্যাপারটাকে অফিশিয়াল করতে হবে। এই ধরনের অফিশিয়াল অনুরোধ হেল্থ্ অথোরিটির কানে যেতে বাধ্য। তারপর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পাগলা গারদে পুরে দেয়া হবে ওকে। কোনদিন ফিরে আসবে না আর।'

'কোনদিন না।' চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল মাগেনখেলারের। মাথা নাড়ল সে এপাশ-ওপাশ।

আর কি বলা যায় বুঝতে না পেরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা

ড্রইংরুম থেকে।

ছয়

সারাটা দুপুর হোটেল কামরায় বসে কর্নেলের দেয়া ক্রস-ইনডেক্স করা ফাইল ঘাঁটল রানা। ফাইলে গত তিনটে বছর অ্যামস্টার্ডামে ড্রাগ সংক্রান্ত যত রকমের যত কেস হয়েছে তার বিবরণ সাজানো আছে। প্রত্যেকটাই দুঃখের—কোনটা মৃত্যু, কোনটা আত্মহত্যা, কোনটা বা পারিবারিক ভাঙন আর সাংসারিক অশান্তির কাহিনী।

নানান ভাবে চোখ বুলাল রানা ওগুলোর ওপর, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্রস-ইনডেক্সগুলোকে নানান ভাবে সাজাবার চেষ্টা করল; কিন্তু সবই বৃথা। কোন প্যাটার্ন পাওয়া গেল না। ঘন্টা দুয়েক ফাইলটা নাড়াচাড়া করে প্রবোধ দিল সে নিজের মনকে: কর্নেল ডি গোল্ড আর ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারের মত ঘুঘু অফিসার যদি এসব ধৈর্যের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা পরীক্ষা করে কোন প্যাটার্ন বের না করতে পেরে থাকে, তাহলে সে কোন ছার? ফাইল ঘাঁটা কোনদিনই ভাল লাগে না ওর, কাজেই এসব ঘেঁটে আশ্চর্য কিছু আবিষ্কারের আশা করা বৃথা। নেহায়েত বোকামি। কোন লাভ হবে না ধরে নিয়ে ফাইল বন্ধ করে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠল সে শেষ বিকেলে।

ঘুম থেকে চাঙ্গা হয়ে উঠে স্নান সেরে নিল সে গরম পানিতে। ঘন ছাই রঙের একটা স্যুট গায়ে চড়িয়ে নেমে এল নিচে। রিসিপশন ডেস্কে চাবিটা বাড়িয়ে দিতেই হাসিমুখে এগিয়ে এল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। আজকের হাসিতে আগেকার সেই অতি স্মার্টনেস দেখা গেল না, রীতিমত একটা সমীহ ভাব টের পেল রানা ওর ব্যবহারে। বুঝল, রানাকে হালকাভাবে গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে ওকে।

'গুড ইভনিং, গুড ইভনিং, মিস্টার রানা।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল সে। 'কাল হয়তো একটু খারাপ ব্যবহারই করে ফেলেছিলাম—কিন্তু সেই সময়…'

'আরে না, না। ও কিছু না।' ভদ্রতার দিক থেকে রানাই বা কম যাবে কেন? 'কিচ্ছু মনে করিনি আমি। ওই রকম একটা অবস্থায় কার সাথে কে কি ব্যবহার করছে সেসব দেখলে কি চলে? দেখাই যাচ্ছিল, খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন আপনি—সেটাই স্বাভাবিক।' কাঁচের দরজা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে চাইল রানা। 'ট্যুরিস্ট গাইডে কিন্তু এই বৃষ্টির উল্লেখ নেই মোটেই।'

যেন কথাটার মধ্যে মস্ত কিছু রসিকতা রয়েছে এমনি ভাবে হেসে উঠল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, যেন হাজার ট্যুরিস্টের মুখে হাজার বার শোনেনি সে—রানার মুখেই প্রথম শুনছে এই রকম একটা কথা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বেরোচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। য্যানডামের দিকে চললাম।' যা মাথায় এল যা খুশি একটা নাম বলে দিল রানা।

'য্যানডাম? হুঁ, য্যানডাম!' বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'অপেরায়?'

'ঠিক ধরেছেন,' বলেই বেরিয়ে পড়ল রানা সদর দরজা দিয়ে। ডোরম্যানকে ইঙ্গিত করতেই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে হাজির হয়ে গেল গেটের কাছে। উঠে বসল রানা পেছনের সীটে, ডোরম্যানকে শুনিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'শিফল এয়ারপোর্ট।'

রওনা হলো ট্যাক্সি। রানা লক্ষ করল, আরেকটা ট্যাক্সিও রওনা হলো পিছন পিছন। সামনের ট্রাফিক লাইটে গাড়িটা থামতে পেছন ফিরে ভাল করে দেখে নিল রানা হলুদ স্ট্রাইপ আঁকা মার্সিডিজ ট্যাক্সিটা—আরোহী নেই, ড্রাইভার একা। ট্রাফিক লাইট সবুজ হতেই ভিযেলস্ট্রাট ধরে এগোল ট্যাক্সি, পিছনেরটাও চলল সেই একই দিকে।

ব্যাপারটা ভালমত বুঝে নেয়ার জন্যে ড্রাইভারের কাঁধে দুটো টোকা দিল রানা।

'এখানে থামো একটু, সিগারেট কিনব।' ট্যাক্সি থেমে দাঁড়াতেই নেমে পড়ল রানা। দেখল, পেছনের ট্যাক্সিটাও থেমে দাঁড়িয়েছে। কেউ উঠল না, কেউ নামল না—যেন ইচ্ছে হয়েছে তাই দাঁড়িয়েছে ট্যাক্সিটা, এমনি। একটা হোটেল ফোয়ায়ারে ঢুকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে রানা যখন বেরোচ্ছে, তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা। রওয়ানা হয়ে গেল রানার ট্যাক্সিটা, খানিক চলবার পর রানা বলল, 'ডাইনে মোড় নাও। প্রিনসেনগ্রাট ধরে এগোও।'

'কিন্তু ওটা তো শিফলের রাস্তা না।' আপত্তি জানাল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

'না হোক। ওই রাস্তা দিয়েই যেতে চাই আমি। ডাইনে ঘোরো।'

ঘুরল ড্রাইভার, পেছনে মার্সিডিজটাও ঘুরল এইদিকেই।

'থামো।' দাঁড়িয়ে পড়ল ড্রাইভার। মার্সিডিজও দাঁড়িয়ে গেছে। রাগ হলো রানার। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। চিড়িয়া মনে করেছে নাকি ওকে ব্যাটারা? নাকি ননীর পুতুল? গাড়ি থেকে নেমে মার্সিডিজটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, এক ঝটকায় দরজা খুলে বাঁকা হয়ে ঝুঁকল সামনের দিকে। নীল স্যুট পরা বেঁটেখাট, মোটা, টাকপড়া এক লোক বসে আছে ড্রাইভিং সীটে, চেহারায় একটা বেপরোয়া ভাব।

'গুড ইভনিং,' বলল রানা। 'ভাড়া যাবে?'

'না।' ভুরু কুঁচকে আপাদমস্তক দেখল লোকটা রানাকে, বোঝাবার চেষ্টা করল—থোড়াই কেয়ার করে সে রানাকে, তেড়িবেড়ি করে লাভ হবে না।

'তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'সিগারেট খাওয়ার জন্যে কেউ থামতে পারবে না, এমন কোন আইন আছে?'

'না, এরকম আইন নেই। কিন্তু তুমি তো সিগারেট খাচ্ছ না, বাছা?' হাসল রানা। 'যাই হোক, মার্নিক্সস্ট্রাটের পুলিস হেডকোয়ার্টারটা চেনা

আছে?' লোকটাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে রানা বুঝল, ভাল করেই চেনা আছে ওর জায়গাটা। বলল, 'সোজা চলে যাও ওখানে। ওখানে গিয়ে হয় কর্নেল ডি গোল্ড নয়তো ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারের সঙ্গে দেখা করে বলো: কার্লটন হোটেলের ছশো বাইশ নম্বরে থাকে মাসুদ রানা—তার বিরুদ্ধে তোমার একটা কমপ্লেন আছে।'

'কমপ্লেইন্ট?' অবাক হয়ে চাইল লোকটা রানার মুখের দিকে। 'কিসের কমপ্লেইন্ট?'

'নালিশটা হচ্ছে এই যে, লোকটা তোমার গাড়ির ইগনিশন কীটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে খালের মধ্যে।' কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যুৎবেগে ইগনিশন কী বের করে নিল রানা লক্ থেকে, সাঁই করে ছুঁড়ে মারল ওটা খালের মাঝ বরাবর। ছপাৎ শব্দ তুলে তলিয়ে গেল চাবিটা। ছানাবড়া হয়ে গেছে লোকটার চোখ। চোখ টিপল রানা। 'আর কোনদিন আমাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা কোরো না। লোকটা আমি তেমন সুবিধের নই।' দড়াম্ করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে এল সে নিজের ট্যাক্সিতে।

মেইন রোডে উঠে এসে আবার থামতে বলল রানা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাবছি, হেঁটেই যাব।'

'শিফল যাবেন হেঁটে।' চোখদুটো কপালে উঠল ড্রাইভারের। 'কত কিলোমিটার জানা আছে আপনার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা 'জানো তো না কত হাঁটতে পারি' ভঙ্গিতে। ট্যাক্সিটা চোখের আড়াল হতেই লাফিয়ে উঠল সে একটা ট্রামে, সোজা গিয়ে নামল ড্যামে। গাঢ় রঙের একটা লম্বা কোট পরে, গাঢ় রঙের একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা ট্রাম শেলটারে। রানার অপেক্ষায়। স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় চুপসে গেছে।

'আধঘণ্টা লেট। সময়জ্ঞান কবে হবে তোমার, রানা?'

'বস্‌কে ক্রিটিসাইজ করতে নেই, সোহানা।' হাঁটতে শুরু করল রানা।

রানার পাশাপাশি এগোল সোহানা। গতরাতে ছাইরঙা লোকটাকে অনুসরণ করে যে পথে গিয়েছিল সেই পথ ধরে এগোল ওরা। ক্র্যাসনাপোলস্কি হোটেলের পাশ দিয়ে, আউডেজিয ভুর্বার্গোয়াল খালের ধার ঘেঁষে সারি সারি ওয়েরহাউজ ঠাসা পুরানো শহরের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে হঠাৎ রানার হাত ধরল সোহানা, মুখের দিকে চাইল।

'তোমাকে এত ভয় পেতে আগে কোনদিন দেখিনি আমি, রানা।'

'তাই নাকি? কি করে বুঝলে যে ভয় পেয়েছি?'

'তোমার গোপনীয়তা দেখে। সাবধানতা দেখে।'

'আগে খুব অসাবধান ছিলাম বুঝি?'

সোহানা বুঝল, এই লাইনে কথা এগোবে না, কাজেই সরাসরি প্রশ্ন করল, 'কতদূর এগোলে? কি করে বেড়াচ্ছ দিন রাত? দেখা নেই কেন? মারিয়া বলছিল, আমাদের মানুষ বলে গণ্য করো না তুমি, দাবার ঘুঁটির মত

ব্যবহার করছ। আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন। তুমি বদলে গেছ, রানা।'

'তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ একটু কম রাখছি, এটা বলতে পারো। কিন্তু তোমাদের মানুষ বলে গণ্য করি না, দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছি, এসব একটু বাড়াবাড়িই মনে হচ্ছে আমার কাছে। কোন রকম দুর্ব্যবহার...'

'না। তোমার ব্যবহার সম্পর্কে কারও কোন নালিশ নেই। নালিশ দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। কাজ করতে এসেছি আমরা এখানে—কিন্তু কাল বিকেল থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত পচা এক হোটেলে বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি কাজ করেছি আমরা? কাজ কতটা হয়েছে, কতটা বাকি আছে, কিছুই জানি না কেন আমরা?'

'আমিই কি জানি?' হাসল রানা। 'দেখো, সোহানা, এখানে এক জঘন্য, অপ্রীতিকর কাজ নিয়ে এসেছি আমরা। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই আমাদের। অথচ আমাদের আগা-পাশ-তলা সবই জেনে গেছে শত্রুপক্ষ। তোমাদের কথা জানি না, কিন্তু আমার সম্পর্কে সব কিছু ওদের কাছে জলের মত পরিষ্কার। এই অবস্থায় কাজ করা কতটা মুশকিল তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ভয়ও পেয়েছি আমি এই জন্যেই। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কতটা শক্তি ধরে ওরা। মানে মানে কেটে না পড়লে আমার কপালে কি ঘটবে সেটা জানাতেও কসুর করেনি। এই অবস্থায় তোমাদের দূরে সরিয়ে না রেখে বুকের কাছে টানলেই কি ভাল হত?'

'তাই বলে কি ঘটছে সেটা জানবারও অধিকার নেই নাকি আমাদের?'

'আছে। সময় হলেই সব জানতে পারবে। আগেই যদি হার্টফেল করে বসো, কাজের অসুবিধে হবে আমার।'

'অর্থাৎ, আমাদের দিয়েও কাজ আছে?'

'নিশ্চয়ই। কাজ না থাকলে এখন কোথায় চলেছ? অভিসারে?'

ভলেনহোভেন কোম্পানীর গলিটায় ঢুকল ওরা। গত কালকের মতই নির্জন। তেমনি ছমছমে একটা ভাব। রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো সারি সারি উঁচু বাড়ির মাথাগুলো মনে হচ্ছে আরও কাছে চলে এসেছে আজ, আগামীকাল এই সময় নাগাদ লেগে যাবে একটার সঙ্গে আরেকটা। পায়ের তলায় কাঁকরগুলোও আজ যেন কড়মড় করছে একটু বেশি বেশি।

নিশ্চিন্ত মনে চলতে চলতে হঠাৎ আঁৎকে ওঠা ঘোড়ার মত থমকে দাঁড়াল সোহানা, খপ করে চেপে ধরল রানার হাত। বিস্ফারিত চোখে ওপর দিকে চেয়ে রয়েছে সে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল, ডাইনীর নখের মত দেখাচ্ছে সারবাঁধা পাঁচতলা দালানগুলোর মাথার হয়েস্টিং বীমগুলোকে। ওপরে আকাশ—বীমগুলোর সিলুয়েট দেখে মনে হচ্ছে অশুভ কিছু।

'পৌঁছে গিয়েছি।' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এসে গেছি আমরা ঠিক জায়গায়।'

মেয়েদের থাকে এই ক্ষমতা, জানে রানা, তবু অবাক হলো সে সোহানার অশুভকে অনুভব করার ক্ষমতা দেখে। অনেক কিছুই বুঝে ফেলে ওরা আগে থেকে। কিন্তু এখন ওসব পাত্তা দিলে চলবে না। সহজ কণ্ঠে বলল সে. 'এসে

তো গেছিই। তাই বলে অমন কুঁকড়ে যাওয়ার কি আছে?'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল সোহানা। পছন্দ হয়নি রানার স্বরে টিটকারির ভাবটা। কিন্তু রানা যখন আবার হাতটা তুলে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরল, বাধা দিল না।

'কেমন যেন গা ছমছম ভাব এই গলিটায়। ওই বিদঘুটে জিনিসগুলো কি?'

'ওগুলো হয়েস্টিং বীম। আগেকার দিনে বাড়ির সামনেটা কতখানি চওড়া, তাই দেখে ট্যাক্স ধরা হত। কৃপণ ডাচরা তাই সরু করে বানাত বাড়ি। ফলে ওপরতলায় ওঠার সিঁড়িটাও চিকন রাখতে হত—ভারী জিনিস ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানো নামানো যায় না। তাই বড়সড় জিনিসের জন্যে এই হয়েস্টিং বীমের ব্যবস্থা। ধরো, একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো তুলতে হবে ওপরে, কিংবা কফিন নামাতে হবে...'

'চুপ করো!' কাঁধ দুটো একটু উঁচু করে শিউরে উঠল সোহানা। 'এটা ভয়ঙ্কর এক জায়গা। মনে হচ্ছে মরণের হাতছানি টের পাচ্ছি আমি এখানে। এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি আমাকে?' রানার মুখের দিকে চাইল, 'কক্সবাজারের সেই ডক্টর শিকদারের কথা মনে আছে? সেই রকম অশুভ প্রেতাত্মার ছায়া দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।'

ব্যাপারটা হালকা করবার চেষ্টা করল রানা। 'শিকদারের ভয়ে আমার সাথে কি করেছিলে, সেসব মনে হচ্ছে না?'

'আমি করেছিলাম?—না তুমি জোর করে...' হেসে ফেলল সোহানা, পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। 'ঠাট্টা নয়, রানা। তুমি কিছু অনুভব করতে পারছ না? এ গলির আনাচে কানাচে দেখতে পাচ্ছ না মৃত্যুর কালো ছায়া?'

'না। পাচ্ছি না।' কঠিন সুরে বলল রানা। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এদিকে যে শিরশির করে শীতল একটা ভয়ের স্রোত ওঠানামা শুরু করেছে, বুকের ভিতর গুড়গুড় করছে বিপদের আশঙ্কা, সেকথা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিল না সে সোহানাকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এসব আজগুবি কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হচ্ছে না, সোহানা। চলো, এগোনো যাক।'

'আজগুবি কল্পনা!' ভয়ানক ভাবে শিউরে উঠল সোহানা একবার। বেত পাতার মত থির থির করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ। কয়েক পা এগিয়ে বলল, 'কল্পনা নয় রানা, আমি মনের ভেতর থেকে অনুভব করতে পারছি। এই ভয়ঙ্কর গলিতে আমাদের না ঢুকলেই কি নয়?'

থমকে দাঁড়াল রানা। 'যে রাস্তায় এসেছ সেটা চিনতে পারবে?' অবাক হয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা—পারবে। রানা বলল, 'ভেরি গুড। সোজা হোটেলে ফিরে যাও। পরে দেখা করব আমি তোমার সাথে।'

'হোটেলে ফিরে যাব?' রানা যে ঠিক কি বলছে এখনও বুঝতে পারেনি সোহানা। 'মানে?'

'হোটেলে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করো আমার জন্যে। কোন চিন্তা নেই, তোমার ভূতেরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যাও, রওয়ানা হয়ে যাও।'

ঝট করে একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সোহানা রানার হাতের নিচ থেকে। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই হাতে ওর কোটের দুই কলার ধরল। পাগলের মত ঝাঁকাবার চেষ্টা করছে সে রানাকে কলার ধরে। বহুবার বহু ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু সোহানার এমন রুদ্রমূর্তি আগে কোনদিন দেখেনি রানা। ভয়ডর কোথায় উড়ে গেছে তার পাত্তা নেই, এখন কাঁপছে রাগে। আঙুলের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেছে প্রাণপণ শক্তিতে কলার চেপে ধরায়।

'খবরদার।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সোহানা। 'আর কোনদিন এ ধরনের কথা বলবে না আমাকে!'

রানা বুঝল, অপমানিত বোধ করেছে সোহানা ওর কথায়। এখন ওর মেজাজের গোড়ায় বারুদ ধরা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মৃদুহেসে বলল, 'ঠিক আছে, আর কোনদিন বলব না।'

'আচ্ছা।' রানার কুঁচকে যাওয়া কলার ছেড়ে দিয়ে ওটাকে সোজা করবার চেষ্টা করল সে হাত বুলিয়ে। মুহূর্তে পানি হয়ে গেছে ওর রাগ। সহজ ভঙ্গিতে খপ করে ওর ডানহাতটা পেঁচিয়ে ধরে টানল সামনের দিকে। 'ঠিক আছে, চলো এবার। আর…এরকম একটা বাজে ব্যবহার করে বসায় মাফ করে দাও আমাকে।' রানার মুখের দিকে চাইল ঘাড় বাঁকিয়ে। 'পায়ে ধরতে হবে, না এমনিই মাফ করবে?'

'আগে শোনা যাক মাফ না করলে কি করবে?'

'জ্বালাতন করে মারব—শয়নে, স্বপনে।'

'শুধু শয়নে করলে চলে না?'

'তাতে কি লাভ?'

'তাহলে আর ইমিডিয়েট মাফটাফের মধ্যে না গিয়ে তোমার জন্যে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারি আমি বিছানায় শুয়ে।'

'তোমার ওই এক কথা। ওসব ছাড়া আর কিছু নেই যেন মানুষের জীবনে।'

'আর কি আছে? শুকনো আদর? ওসবে আমার…' গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। দাঁড়াল। 'এসে গেছি।'

সাইনবোর্ডটা পড়ল সোহানা মৃদু কণ্ঠে: 'ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানী।'

'তুমি রাস্তার দুপাশটা লক্ষ রাখো,' বলে চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল রানা।

'খালি রাস্তাটার দিকে, নাকি…'

'আর আমার পিঠের দিকেও খেয়াল রেখো একটু, কেউ যেন আচমকা ছুরি বসাতে না পারে।'

সিঁড়ি দিয়ে দুই ধাপ ওপরে উঠে গলা বাড়িয়ে রাস্তার ওপর চোখ রাখল সোহানা। দুই মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে ফেলল রানা দরজাটা। ভিতরে ঢুকে পড়ল দুজন। আবার চাবি মেরে চাবিটা তালার মধ্যেই রেখে দিল রানা। দুজনের হাতে বেরিয়ে এসেছে দুটো টর্চ—রানার হাতেরটা ছোট কিন্তু অত্যন্ত জোরাল। গোটা একতলায় দেখার মত কিছুই পেল না ওরা। পাশাপাশি

তিনটে ঘরে গাদা করা আছে অসংখ্য কাঠের প্যাকিং বাক্স মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত। আর রয়েছে ক্র্যাপ পেপার, কার্ডবোর্ড, খড় এবং বাঁধাই ও বেলিঙের যন্ত্রপাতি। মালপত্র প্যাকিং হয় এখানে।

সরু ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলল এবার ওরা। অর্ধেক উঠে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চাইল রানা, দেখল সোহানাও তাই করছে, চারপাশে টর্চ বুলিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে যে আর কেউ নেই।

দোতলার প্রথম দুটো ঘর হাজার পদের সুভ্যেনিরে ঠাসা। ডাচ পিউটার, উইন্ডমিল, কুকুর, বাঁশি—হরেক রকমের জিনিসে সাজানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে বসানো শেলফ আর ঘরের মাঝামাঝি আড়াআড়ি করে রাখা র‍্যাকে। চারপাশে একবার আবছা ভাবে চোখ বুলিয়ে কোন কিছুই সন্দেহজনক বলে মনে হলো না রানার কাছে। কিন্তু তৃতীয় ঘরের দরজার সামনে এসেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। সোহানাকে ডেকে দেখাল দরজাটা।

'আশ্চর্য!' চোখমুখ বাঁকাল সোহানা। 'টাইম লক! সাধারণ একটা অফিসের দরজায় টাইম লক কেন?'

'এর সহজ উত্তর হচ্ছে: এটা সাধারণ একটা অফিস দরজা নয়। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে দরজাটা কাঠের নয়—স্টীলের। ডায়মন্ডের গুদাম হলে একটা কথা ছিল, বোঝা যেত—না, স্টীলের দরজার একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু এখানে? কী এমন জিনিস আছে এদের এখানে এত সাবধানে রাখবার মত?'

'মনে হচ্ছে ঠিক জায়গায়ই হাজির হয়েছি আমরা,' বলল সোহানা।

'আমি তোমাকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাব এমন সন্দেহ ছিল বুঝি তোমার?'

'না। তা ছিল না। কিন্তু এই বাড়িটা আসলে কি? কিসের স্টোরহাউজ?'

'এখনও বুঝতে পারোনি? সুভ্যেনির ব্যবসার হোলসেলার এরা। ফ্যাকটরিই বলো, বা কুটির শিল্পের কারখানাই বলো, প্রস্তুতকারক সরাসরি মাল পাঠিয়ে দেয় এই স্টোরহাউজে, এখান থেকে বিভিন্ন দোকানের অর্ডার অনুযায়ী যার যা দরকার প্যাকিং করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সহজ, সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, আইনসম্মত, পরিষ্কার ব্যবসা।'

'কিন্তু খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়,' বলল সোহানা নাক কুঁচকে।

'অস্বাস্থ্যকর কি পেলে?'

'বিচ্ছিরি একটা গন্ধ পাচ্ছ না?'

'ও। ক্যানাবিস। কারও কারও কাছে ক্যানাবিসের গন্ধ খুব খারাপ লাগে।

'ক্যানাবিস? কি সেটা?'

'বেণী বেঁধে স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া আর কিছুই করোনি জীবনে! এপাশ-ওপাশ চাইবার সময় পাওনি। কামন। আপ।'

তেতলায় উঠে এল ওরা। কয়েক মিনিট আগেকার তেজ বেমালুম উবে গেছে সোহানার চেহারা থেকে। ফ্যাকাসে মুখে চঞ্চল দৃষ্টি বুলাচ্ছে সে চারপাশে। ক্যানাবিসের গন্ধ আরও বেড়েছে এখানটায়, কিন্তু ঠিক কিসের থেকে আসছে বোঝা গেল না। নিস্তব্ধ এই পুরানো দালানটায় থমথম করছে

যেন জঘন্য এক পাপীর প্রেতাত্মা। তিন দেয়ালের তিনটে র‍্যাকে সারি সারি সাজানো রয়েছে দেয়াল ঘড়ি। ছোট, মাঝারি, বড়—হরেক রকম। বেশিরভাগই সস্তা দরের, পালিশ করা হলুদ পাইনের কাঠামো। কিন্তু দামী ঘড়িও রয়েছে বেশ অনেকগুলো। ভাগ্যিস পেন্ডুলামগুলো থেমে রয়েছে; যদি সবকটা চলতে থাকত তাহলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা হত ওদের। ঘরের চতুর্থ দেয়ালের শেলফে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দশটা তাক ঠাসা রয়েছে অদ্ভুত এক জিনিসে—বাইবেল। এককে তাকে তিন সারি করে বাইবেল রাখা। সুভ্যেনির ওয়েরহাউজে বাইবেল কেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না রানা। এগিয়ে গিয়ে একটা বের করল টেনে। চামড়ার কাভার, তার ওপর সোনালী অক্ষরে এমবস করা রয়েছে: দি গ্যাব্রিয়েল বাইবেল। মলাট ওল্টাতেই দেখা গেল প্রথম পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখা: উইথ দা কমপ্লিমেন্টস অফ দা ফার্স্ট রিফর্মড চার্চ অফ দা অ্যামেরিকান হিউগানট সোসাইটি।

'ঠিক এই রকম একটা বাইবেল রয়েছে আমাদের হোটেল কামরায়,' বলল সোহানা।

'মাগনা পেয়েছে, রেখে দিয়েছে হয়তো একটা করে সব ঘরে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—এগুলো এখানে কেন? প্রিন্টার বা পাবলিশারের গুদাম হলে এক কথা ছিল, এখানে কি করছে এসব? অদ্ভুত ব্যাপার না?'

'এখানকার সব কিছুই বিদঘুটে ঠেকছে আমার কাছে,' বলল সোহানা। 'বেরোতে পারলে বাঁচি।' কথাটা বলেই শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

মৃদু একটা থাবড়া দিল রানা ওর পিঠে। 'শীত করছে? আরও দুটো তলা বাকি রয়েছে। চলো, এবার থার্ডফ্লোর।'

চারতলার পুরোটা জুড়ে শুধু পুতুল আর পুতুল। অসংখ্য। হরেক আকৃতির। একেবারে ছোট থেকে নিয়ে ইরিনের হাতে যেটা ছিল তার চেয়েও বড় পুতুল রয়েছে, অতি যত্নের সাথে অপূর্ব সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে প্রত্যেকটা। নানান রঙের ঝকমকে ডাচ ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরানো সব পুতুল। বড়গুলো দাঁড় করানো আছে র‍্যাকের পেছনে একটা দড়ির গায়ে হেলান দিয়ে, ছোটগুলো ঝুলছে সুতো বাঁধা অবস্থায়। সবুজ, নীল, খয়েরী চোখের মিষ্টি সব পুতুল।

সাহসিকা সোহানা একহাতে খামচে ধরে আছে রানার কোটের হাতা। ভয়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর আয়ত চোখ। ফিসফিস করে বলল, 'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে··· শিরশির করছে সারা শরীর। মনে হচ্ছে জ্যান্ত সব পুতুল, লক্ষ করছে আমাদের।'

'ফিসফিস করবার দরকার নেই,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'দেখছে ঠিকই, কিন্তু আমি শিওর, একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না পুতুলগুলো। ঠিক এই রকম কাপড় পরা একটা জ্যান্ত পুতুল দেখেছি আমি আজ সকালে ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারের বাসায়। ইরিনের নার্স। এগুলো সব এসেছে যাইডার যীর হাইলার দ্বীপ থেকে। ইরিনের হাতেও দেখেছি একটা পুতুল, ঠিক এই রকম।' শেষের কথাগুলো যেন সোহানাকে নয়, নিজেকেই শোনাবার জন্যে বলল

রানা।

'ইরিন কে?'

'অ্যামস্টার্ডামের নারকোটিক্স ব্যুরোর চীফ ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারের পালিতা মেয়ে। ড্রাগ অ্যাডিক্ট।'

'ইন্সপেক্টরের মেয়ে ড্রাগ অ্যাডিক্ট? কি ব্যাপার···ব্ল্যাকমেইল?'

'মেয়েটার মাধ্যমে পথে আনবার চেষ্টা করছে ওরা মাগেনথেলারকে। গোপনে হেরোইনের ডোজ সাপ্লাই দিচ্ছে ইরিনকে।'

রানার হাত ছেড়ে দিয়ে চারপাশে টর্চ বুলাল সোহানা, রানা এগিয়ে গিয়ে মন দিল একটা পুতুল পরীক্ষায়। হঠাৎ দ্রুত শ্বাস টানবার শব্দে ঝট করে পেছন ফিরল সে। দেখল, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, টর্চের আলোটা ধরা আছে একটা র‍্যাকের গোটা কয়েক পুতুলের দিকে। ধীর, নিঃশব্দ পায়ে পিছিয়ে আসছে সে রানার দিকে, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে টর্চের আলোয় আলোকিত জায়গাটার ওপর, পেছনে হাঁটছে আর বাম হাতে খুঁজছে সে রানাকে। কাছে আসতেই ধরল রানা হাতটা, মৃদু চাপ দিল। দৃষ্টিটা সরাল না সোহানা রানার স্পর্শ পেয়েও। রানা টের পেল প্রবল বেগে কাঁপছে ওর হাতটা।

চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সোহানা, 'একটা লোক! রানা! লক্ষ করছে আমাদের!'

আলোকিত র‍্যাকের দিকে চাইল রানা, সঙ্গে সঙ্গেই চোখ সরিয়ে নিল। সোহানার হাত ধরে টেনে ওকে নিজের দিকে ফেরাল। চোখ ফেরাতে পারছিল না সোহানা র‍্যাকের ওপর থেকে, বহুকষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে রানার দিকে—যেন সম্মোহনের প্রভাব কাটিয়ে উঠল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল রানা ওর চোখের দিকে। 'কি ব্যাপার? হোয়াটস দা ম্যাটার?'

'আমি দেখেছি! নিজের চোখে দেখেছি!' ভয়ে দেড়গুণ বড় হয়ে গিয়েছে ওর আয়ত চোখ।

'কি দেখেছ?'

'একজোড়া চোখ! র‍্যাকের ওপাশে!'

অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না, সোহানা যে ভুল দেখেনি সে ব্যাপারেও রানা স্থির নিশ্চিত—কারণ, যত কল্পনাপ্রবণ মেয়েই হোক, কঠোর ট্রেনিং পেয়েছে সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে অবজার্ভেশনের সঙ্গে ইমাজিনেশন না মেশাবার ব্যাপারে। হাতের উজ্জ্বল টর্চটা ধরল রানা র‍্যাকের দিকে, অসাবধানে সোহানার চোখে লেগে গেল আলোটা মুহূর্তের জন্যে, চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় চট করে একটা হাত তুলল সে চোখে। কোন মানুষ বা তার চোখ দেখতে পেল না রানা, কিন্তু যেটুকু দেখতে পেল তাতেই বুঝে নিল সে যা বোঝার। ঘরে দমকা তো দূরের কথা, মৃদু হাওয়া ঢুকবারও কোন ব্যবস্থা নেই—অথচ দুটো পুতুল দুলছে অল্প অল্প; এতই সামান্য, যে ভাল করে লক্ষ না করলে ঠাহর করা যায় না।

সোহানার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। হাসল মিষ্টি করে। 'দেখো,

সোহানা—'

'বিশ্বাস করছ না তুমি? আমি দেখেছি। ভয়ঙ্কর একজোড়া চোখ! কসম খেয়ে বলতে পারি...সত্যিই দেখেছি আমি।'

'অফকোর্স ইউ স দেম, সোহানা। সন্দেহ তো করছি না। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।' বলল রানা, কিন্তু এমন সুরে বলল যে পাঁই করে ঘুরল সোহানা ওর দিকে। মর্মাহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না সে, এই রকম একটা অবস্থায় ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে পারে রানার মত দায়িত্বশীল এক লোক। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে সে রানার ব্যবহার দেখে। একই সুরে রানা বলল, 'আই বিলিভ ইউ, সোহানা। ঠিকই দেখেছ তুমি—অবিশ্বাস করছি না।'

'বিশ্বাস করার নমুনা কি এই?' রেগে গেল সে। 'কিছু করছ না কেন তাহলে?'

'করছি না কেন বললে?' আবার হাসল রানা। 'আই অ্যাম গেটিং দা হেল্ আউট অভ হিয়ার। সোজা বাংলায় ভাগছি।' যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভঙ্গিতে সারা ঘরে একবার টর্চটা বুলিয়ে নিয়ে বাম হাতে সোহানার পিঠ জড়িয়ে ধরল রানা। 'চলো, কেটে পড়া যাক। দেখার মত কিছুই নেই এখানে। গলা শুকিয়ে গেছে আমার—একটা ড্রিঙ্ক না হলে আর চলছে না। এখানকার এই ভৌতিক পরিবেশ নার্ভাস করে ফেলেছে আমাকেও।'

এক ঝটকায় রানার হাত সরিয়ে দিল সোহানা। ওর মুখে রাগ, দুঃখ আর হতাশা দেখতে পেল রানা। ওকে নিয়ে ঠাট্টা করায় এবং ওর কথা বিশ্বাস না করায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু...রানা, আমি যে বলছি...'

চুক চুক শব্দ করল রানা জিভ দিয়ে, তারপর ঠোঁটের উপর আঙুল রাখল একটা। 'আর কোন কথা নয়। মনে রেখো, আমি যাহা জানি, তুমি জানো না...বস্ অলওয়েজ নোজ বেস্ট। চলো, এগোও।'

কয়েক সেকেন্ড দুই চোখ দিয়ে আগুন ঝরল সোহানার, তাতে যখন রানাকে ভস্ম করা গেল না তখন বুঝতে পারল এই লোকের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, ঝট করে ঘুরে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দুমদাম পা ফেলে নামতে শুরু করল নিচে। পেছন পেছন নামছে রানা—প্রথম পনেরোটা ধাপ নামতে নামতেই চিকন ঘাম দেখা দিল ওর কপালে, ভয়ের শীতল স্রোত বইল শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে বারকয়েক ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে। একেবারে নিচতলায় নেমে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে তালা না মারা পর্যন্ত থামল না শিরশিরানি।

দ্রুতপায়ে ফিরে চলল ওরা মেইন রোডের দিকে। সোহানার হাত ধরবার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। তিনহাত তফাতে হাঁটছে সে, মাঝে মাঝে চোখের কাছে হাত তুলতে দেখে আন্দাজ করল হয়তো কাঁদছে ও। গজ পঞ্চাশেক চুপচাপ হেঁটে খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা।

'যে লোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসারণ করতে পারে সে আরেকবার

যুদ্ধের সুযোগ পায়। মেজর জেনারেল রাহাত খানের সুপরিচিত কোটেশন ঝাড়ল রানা, কিন্তু কোনই ফল হলো না তাতে। রাগে ফুঁসছে সোহানা।

'দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বোলো না তুমি।' গলার স্বর কাঁপছে আবেগে।

অবস্থা বেগতিক দেখে চুপ হয়ে গেল রানা। কিন্তু বেশ কিছুদূর হাঁটবার পর যেই একটা পাব্ দেখতে পেল, খপ করে ধরে ফেলল সে সোহানার হাত, টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢুকতে হলো সোহানাকে, নইলে সীন ক্রিয়েট করতে হয়।

সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায়ান্ধকার এক ড্রিঙ্কিং ডেন। জনাকয়েক সেইলার যার যেমন খুশি এঁকেবেঁকে, কেউ আবার টেবিলের ওপর পা তুলে বসে ছিল গ্লাস সামনে নিয়ে, মহিলাসহ রানাকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসল, শান্তি ভঙ্গ করায় আহত দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। কারও দৃষ্টির কোন তোয়াক্কা না করে সোহানাকে নিয়ে কোণের এক টেবিলে গিয়ে বসল রানা। টেবিলটা দেখে মনে হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর অ্যান্টিক—জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত সাবান বা পানির সঙ্গে কোন সংশ্রব ঘটেনি তার।

'আমি স্কচ খাব। তুমি?'

'স্কচ।' নির্বিকার কণ্ঠে বলল সোহানা।

'তুমি না স্কচ খাও না?'

'আজ খাব।'

বেপরোয়া ভঙ্গিতে গ্লাসের অর্ধেকটা একঢোকে খাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে কাশতে শুরু করল সোহানা ভড়কে গিয়ে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠতে দেখে গোটা কয়েক থাবড়া দিল রানা ওর পিঠে।

'হাত সরাও।' গা ঝাড়া দিল সোহানা। 'খবরদার, ছোঁবে না তুমি আমাকে!'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নিজের গ্লাসে মন দিল রানা।

'তোমার সঙ্গে কাজ করবার শখ মিটে গেছে আমার, রানা। কালকেই ফিরে যাচ্ছি আমি।' গলাটা আবার নিজের আয়ত্তে আসতেই ঘোষণা করল সোহানা। 'কালই ফিরে যাব আমি ঢাকায়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার ওপর যার আস্থা নেই, যে আমাকে বিশ্বাস করে না, এমন লোকের সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ বলে গণ্য করো না তুমি আমাদের। এতটা তাচ্ছিল্য সহ্য করে নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কেউ তোমার সঙ্গে কাজ করতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিনি, সোহানা—অমানুষ বলেও গণ্য করিনি, অবিশ্বাসও করিনি, অনাস্থাও প্রকাশ করিনি।' সহজ সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'অফকোর্স ইউ স দেম, সোহানা,' তিক্তকণ্ঠে রানার বাচনভঙ্গি আর রানার গলার সুর নকল করে ভ্যাংচাল সোহানা। 'আই বিলিভ ইউ, সোহানা!

অবিশ্বাস করছি না!—ইউ ডোন্ট বিলিভ মি অ্যাটল।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ঠাট্টার পাত্রী আমি তোমার। আমাকে টিটকারি মেরে তুমি নিজেকে···'

'না, সোহানা।' মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম আমি তোমার কথা। সত্যিই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল আমার। কসম খোদার। বিশ্বাস করেছিলাম বলেই মানে মানে কেটে পড়েছি ওখান থেকে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সোহানা কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে। 'বিশ্বাস করেছিলে···তাহলে, তাহলে কেন—'

'কেন তাড়া করে ধরলাম না ওকে? কারণটা পানির মত সহজ।' একটু সামনে ঝুঁকে এল রানা। সত্যিই ওই র্যাকের পেছনে লুকিয়ে ছিল একজন লোক। চোখ দেখতে পাইনি, কিন্তু দুটো পুতুলকে সামান্য দুলতে দেখেছি আমি। র্যাকটার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ রেখেছিল লোকটা আমাদের ওপর, দেখছিল আমরা কোন তথ্য প্রমাণ পেয়ে যাই কিনা। আমাদের খুন করবার কোন ইচ্ছে লোকটার ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়েই গুলি করতে পারত। কিন্তু তোমার কথামত যদি আমি লোকটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতাম, তাহলে অবধারিতভাবে কি ঘটত কল্পনা করতে পারো? গুলি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না ওর আর। লোকটা ঠিক কোন্ জায়গাটায় আছে সেটা বুঝে ওঠার আগেই গুলি খেতে হত আমার। আমাকে খুন করে খুনের সাক্ষী হিসেবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখত না সে কিছুতেই। বিশ্বাস করো, তোমাকেও মরতে হত ওখানেই। এখন তোমার প্রেম করবার বয়স, হুট করে মরে যাওয়াটা কি উচিত হত? বলো? আর একটা কাজ করা যেত যদি তুমি ওখানে না থাকতে···ওর সাথে লুকোচুরি খেলে ওকে কাবু করবার চেষ্টা করতে পারতাম আমি। কিন্তু তুমি ছিলে ওখানে মস্ত বড় বাধা হিসেবে। পিস্তল নেই তোমার কাছে, এ ধরনের নোংরা খুনোখুনির অভিজ্ঞতা নেই—কাজেই ভাবলাম এসবের মধ্যে তোমাকে না জড়ানোই ভাল। কাজেই, তোমাকে টিটকারি দিইনি আসলে আমি, ওই লোকটাকে বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম যে তোমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করিনি আমি, কাজেই খোঁজাখুঁজিও করব না। সেই সময়েই ইংরেজি বুলি ছুটে গিয়েছিল আমার মুখ দিয়ে, লক্ষ্য করোনি? ওর সাথে কথা বলছিলাম আমি আসলে। ওকে কোনমতে একটা কিছু বুঝ দিয়ে মানে মানে কেটে পড়বার তালে ছিলাম। বোঝা গেল? কেমন লাগল বক্তৃতাটা? চমৎকার না?'

'সত্যিই চমৎকার!' দেখতে দেখতে টলটলে দু'ফোঁটা পানি দেখা দিল সোহানার অপূর্ব সুন্দর চোখে। 'আমার জন্যে···শুধু আমার জন্যে তুমি···অথচ ভুল বুঝে আমি তোমাকে—' টপ করে টেবিলের ওপর পড়ল দু'ফোঁটা পানি, আরও দু'ফোঁটা ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। কাঁপা শ্বাস টানল সোহানা। 'সেজন্যেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার আগে আগে উঠেছ তুমি, নামার সময় নেমেছ পিছু পিছু—গুলি যদি করে, যেন তোমার ওপর দিয়েই যায়।' টেবিলের ওপর রানার একটা হাত চেপে ধরল সোহানা। 'আমি তোমার যোগ্য নই রানা। তোমাকে বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি জানি,

কোনদিন তল পাব না আমি তোমার।'

'দি এন্ড!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল এক সেইলার। তারপর নাকে টোকা দিয়ে পিড়িং পিড়িং ডাচ জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে শুরু করল। হুড়মুড় করে সব কজন উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। অর্থাৎ, সিনেমা শেষ! কান্নার মধ্যে দিয়ে মিলন হয়েছে নায়ক নায়িকার।

হেসে ফেলল রানা ও সোহানা একসাথে। এতক্ষণ যে গভীর মনোযোগের সাথে ওদের নাটক দেখছিল সবাই, টের পেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সোহানার দুই গাল। এক ঢোকে নিজের স্কচ শেষ করে, আধ ঢোকে সোহানারটুকুও নামিয়ে দিল রানা গলা গিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বো করে বলল, 'নাউ জেন্টলমেন, দা শো ইজ ওভার। ইউ হ্যাভ টু পে ফর দা ড্রিঙ্কস্।'

হৈ হৈ করে হাসির হুল্লোড় তুলল নাবিকরা, চার-পাঁচজন একসাথে পকেটে হাত দিল রানাদের ড্রিঙ্কসের বিল দেয়ার জন্যে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ওরা পাব থেকে।

হোটেলের দোরগোড়ায় হঠাৎ দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো সোহানা রানাকে। কানের কাছে নরম গলায় বলল, 'মাফ করেছ?'

'না তো!' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'এখন কি? সে সব তো ফয়সালা হবে শয়নে।'

'অসভ্য।' বলেই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেল সোহানা হোটেলের ভিতর।

সাত

অলিগলি বেয়ে সোহানার হোটেল থেকে আধ মাইল খানেক দূরে সরে এল রানা হেঁটে, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে এল নিজের হোটেলে। ওভারকোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে পেছন ফিরতেই চোখ পড়ল ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের ওপর। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে রানার দিকে চেয়ে।

'ঢ্যানডাম থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?'

'মাঝ রাস্তায় মনে পড়ে গেল বাথরুমের চেইন টানা হয়নি, তাই ফিরে এলাম,' বলল রানা। 'না, না. এক্ষুণি চাবি লাগবে না, আপাতত বারে যাচ্ছি।'

হুইস্কির গ্লাস সামনে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কি তথ্য সংগ্রহ করেছিল ইসমাইল যার জন্যে প্রাণ দিতে হলো ওকে? নাকি এটা ওর প্রতি সাবধানবাণী? ইসমাইলকে ব্যবহার করা হয়েছিল শুধু ওকে চিনে নেয়ার জন্যে? গোপনে ঘর সার্চ করছে, হোটেল থেকে বেরোলেই অনুসরণ করছে, সর্বক্ষণ ওর ওপর নজর রাখছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আর সেই সঙ্গে আরও কজন কে জানে, পুতুলের পেছনে দেখা যাচ্ছে একজোড়া চোখ, ইন্সপেক্টরের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তার পালিতা মেয়েকে হেরোইন সাপ্লাই দিয়ে,

অথচ ধরা যাচ্ছে না কাউকে…সব মিলিয়ে কি দাঁড়ায়? সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে মস্ত একটা ঘোড়ার ডিম হয়ে যাচ্ছে না?

একমাত্র ভরসার কথা, রানার ওজন এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি ওরা। সেইজন্যেই দ্বিধা করছে ওকে সাফ করে দেয়ার ব্যাপারে। আর কোন কারণ থাকতে পারে না ওকে এভাবে অবাধে ঘুরতে ফিরতে দেয়ার, বাঁচিয়ে রাখার। এখনও ওদের যথেষ্ট পরিমাণে উত্যক্ত করতে পারেনি সে, এমন কিছু করতে পারেনি যাতে ওদের পিলে চমকে যেতে পারে। যতক্ষণ না সেটা ঘটছে, ভদ্রতার মুখোশ খসাবে না ওরা—কদিন ব্লাডহাউন্ডের মত হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে হতাশ হয়ে যদি সে ফিরে যায় দেশে, সেটাই তো লাভ। ওদের চমকে দিতে হলে গভীর রাতে আজ আর একবার যেতে হবে ওর ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে একা। সোহানাকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিলে চলবে না। অন্য কোন লাইন যখন খুলছে না, এইদিকেই আর একটু চাপ দিয়ে দেখতে হবে ওদের প্রতিক্রিয়া। ঠিক কটার সময় রওনা হলে ভাল হয় ভেবেচিন্তে স্থির করবার চেষ্টা করছিল রানা, এমনি সময়ে হঠাৎ চোখ তুলে চাইল সে সামনের আয়নার দিকে। ই এস পি বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা ওই জাতীয় কিছু নয়, পরিচিত একটা গন্ধ নাকে আসতেই কৌতূহলী চোখ তুলল সে গন্ধের উৎসটা দেখবার জন্যে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আবছাভাবে পাচ্ছিল সে গন্ধটা, হঠাৎ বুঝতে পারল ওটা চন্দন কাঠের গন্ধ, চট করে মনে পড়ল এর আগে কোথায় পেয়েছিল সে এই গন্ধটা—তাই এই ঔৎসুক্য।

রানার ঠিক পেছনের টেবিলেই বসে রয়েছে মেয়েটা, টেবিলের ওপর একটা ড্রিঙ্ক, হাতে খবরের কাগজ। আয়নার দিকে চোখ তুলেই রানার মনে হলো, ওর দিকেই চেয়ে ছিল মেয়েটা, ও চোখ তুলতেই চট করে নামিয়ে নিল দৃষ্টি। অল্পবয়সী মহিলা, সবুজ একটা কোট পরনে, সোনালী চুল এতই আধুনিক ফ্যাশানে কাটা যে রানার মনে হলো ফুল বাগানের ডাল ছাঁটবার কাঁচি দিয়ে পাগলের হাতে ছাঁটা হয়েছে চুলগুলো।

আরেক পেগ হুইস্কি চাইল রানা, শেষ হয়ে যাওয়া গ্লাসটা তুলে নিয়ে নতুন একটা গ্লাস নামিয়ে রাখল ওয়েটার টেবিলের ওপর। দ্বিতীয় গ্লাসটা স্পর্শ না করেই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, ধীরপায়ে এগোল হোটেলের সদর দরজার দিকে। মেয়েটার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওর দিকে একবার চাইল না পর্যন্ত—এতই চিন্তামগ্ন ভঙ্গি রানার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা, বলল, 'বেশি দূরে কোথাও যাচ্ছি না, দুই মিনিটেই ফিরে আসছি। ঘাবড়াবার কিছুই নেই।'

রাস্তায় নেমে দ্রুতপায়ে চলে এল রানা বিশগজ দূরে মোড়ের পাবলিক টেলিফোন বুদে। রিঙ করল সোহানাদের হোটেলের নাম্বারে। পুরো দুই মিনিট লাগল ওর রিসিপশনের বুড়িকে বোঝাতে যে সোহানাকে চায় ও। আরও তিন মিনিট পর ধরল সোহানা।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

'বস্। মাসুদ রানা। এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যাও তোমরা আমার

হোটেলের উদ্দেশ্যে।'

'এখন?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সোহানা। 'শ্যাম্পু করছিলাম...'

'ঠিক আছে, চুল মুছে নেয়ার জন্য দুই মিনিট সময় দেয়া গেল। দুই মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে যাও। মারিয়া কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'তোলো ওকে। ওরও আসতে হবে। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছবে এখানে এসে। ভেতরে ঢুকবে না। সদর দরজা থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে অপেক্ষা করবে কোথাও।'

'কিন্তু...বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে আবার। বৃষ্টি নামলে?'

'ভিজতে না চাইলে ছাতা আনবে সঙ্গে। শোনো, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসবে এই হোটেল থেকে। তোমার সমানই লম্বা, তোমারই বয়স, তোমারই মত ফিগার—শুধু চুলটা সোনালী।'

'কমপক্ষে দশ হাজার মেয়ে আছে এই শহরে ঠিক এই রকম।'

'উঁহুঁ। এই মেয়েটা সুন্দরীও। তোমার মত অতটা না, তবে সুন্দর। সবুজ একটা কোট থাকবে মেয়েটার গায়ে, সবুজ একটা ছাতাও থাকবে সঙ্গে, স্যান্ড্যাল উড পারফিউম মেখেছে, যদি কাছে থেকে লক্ষ করবার সুযোগ হয়—দেখবে বামদিকের জুলফির কাছে কায়দা করে ঢাকা একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। গতকাল বিকেলে আমার সাথে এক সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে ওই ক্ষতচিহ্ন।'

'তোমার সাথে সংঘর্ষ! মেয়েমানুষের? আজকাল সুন্দরী মেয়েদের সাথেও মারামারি করছ এ খবরটা তো জানা ছিল না? আমাদের জানাবার প্রয়োজন বোধ করোনি নিশ্চয়ই?'

'প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি কথা মনে রাখা এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের জানানো আমার জন্যে ফরজ নয়। মেয়েটাকে অনুসরণ করতে হবে তোমাদের। কোথায় যায় দেখবে, একজন পাহারায় থাকবে, আরেকজন ফিরে এসে রিপোর্ট করবে আমার কাছে। না—এই হোটেলে ঢুকতে পারবে না। রেমব্রান্টপ্লেইনের শেষ মাথায় ওল্ডবেল নামে একটা পাব্ আছে—ওখানেই পাবে আমাকে প্রায় মাতাল অবস্থায়। বোঝা গেছে? ওভার।'

দ্রুতপায়ে ফিরে এল রানা। সবুজ কোট পরা মেয়েটা তেমনি বসে আছে সেই টেবিলে, ডুবে আছে খবরের কাগজে। রিসিপশন ডেস্ক থেকে গোটাকয়েক সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে ফিরে এল রানা নিজের টেবিলে, এবার একটু কাত হয়ে বসল, যেন ওর কার্যকলাপ সহজেই লক্ষ করতে পারে মেয়েটা।

গ্লাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে ওয়ালেট থেকে গত রাতের ডিনার বিলটা বের করে টেবিলের ওপর বিছাল রানা, তালু দিয়ে ঘষে সমান করল, তারপর একটা বলপয়েন্ট পেন বের করে সাদা কাগজের ওপর নোট লিখতে শুরু করল। খানিকক্ষণ নোট করবার পর বিরক্ত হয়ে পেনটা নামিয়ে রাখল সে টেবিলের ওপর, কাগজটা দলা-মোচড়া করে ফেলে দিল কাছেই একটা

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। আবার লিখতে শুরু করল আরেকটা কাগজে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার অসন্তোষ ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে, ভঙ্গিতে। এই কাগজটাও দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করল। বারকয়েক এইভাবে হিসেব মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমনি ভঙ্গিতে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল সে পাঁচমিনিট। একটা সিগারেট শেষ হয়ে যেতেই ধরাল আরেকটা, যেন অত্যন্ত জটিল কোন সমস্যার সমাধান বের করবার চেষ্টা করছে সে, ডুবে আছে গভীর চিন্তায়। আসলে সময় পার করছে রানা। দশ মিনিটের মধ্যে আসতে বলেছে সে সোহানাকে, কিন্তু আরও অন্তত দশটা মিনিট সময় দেয়া দরকার ওদের—হাজার হোক মেয়ে, তৈরি হয়ে নিয়ে বেরোতে একটু দেরি হবেই।

খানিকক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থেকে আবার লেখায় মন দিল রানা—কয়েক মিনিট ধরে লেখে, কয়েক মিনিট সেটা পড়ে, তারপর কাগজটা লাড্ডু পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। এইভাবে বিশ মিনিট পার করে হতাশ ভঙ্গিতে উঠে পড়ল রানা গ্লাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করে, বারম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে। বেরিয়ে গেল মানে, প্লাশ কার্টেনের আড়ালে গিয়েই থেমে দাঁড়াল। পর্দার আড়াল থেকে সাবধানে চোখ রাখল মেয়েটার ওপর। উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, বার কাউন্টারের কাছে গিয়ে অর্ডার দিল আরেকটা ড্রিঙ্কের, তারপর যেন কোন্ চেয়ারে বসেছিল ভুলে গিয়েছে এমনি ভঙ্গিতে বসে পড়ল রানার ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে। কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখবার জন্যে সহজ দৃষ্টিতে এপাশ-ওপাশ চাইল, তারপর আলগোছে তুলে নিল একটা দলা পাকানো কাগজ।

নিঃশব্দে এগোল রানা মেয়েটার দিকে। কাগজটা সোজা করেই কেমন একটু বিবর্ণ হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সে লেখাগুলোর দিকে। কাগজের ওপর বড় হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে: বোকা মেয়ে। কেমন্ জব্দ?

'আর সব কাগজেও এই একই গোপন বার্তা রয়েছে,' বলল রানা। 'গুড ইভনিং, মিস শেরম্যান।'

মেয়েটা এত জোরে পাশ ফিরল যে কড়মড় করে পিঠের হাড় ফুটল। রানার মুখের দিকে চেয়েই দপ করে নিভে গেল ওর চোখের জ্যোতি। প্রথমে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তারপরেই লাল হয়ে উঠল ওর মুখটা। লজ্জায়।

'বাহ্! খুব কম মেয়েই পারে এত সুন্দর ব্লাশ করতে।'

'আমি দুঃখিত। ইংরেজি বলতে পারি না।'

'হয় এরকম,' সমব্যথীর মত বলল রানা। 'একে বলে কংকাসিভ অ্যামনেশিয়া। অনেকে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, সেরে যায় এ রোগ সহজেই।' আলতো করে তর্জনী দিয়ে স্পর্শ করল রানা মেয়েটার জুলফির কাছে। 'জখমটা এখন কেমন, মিস শেরম্যান?'

'বলছি তো, আমি দুঃখিত, আমি...'

'ইংরেজি বলতে পারো না। শুনেছি। কিন্তু বুঝতে তো কোন অসুবিধে

আছে বলে মনে হচ্ছে না? বিশেষ করে লিখিত ইংরেজি। ইংরেজি কথায় লজ্জা পেয়ে লাল হতেও কোন অসুবিধে নেই।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। হাতের পত্রিকাটা গোল করে জড়াচ্ছে, আবার খুলছে নিজের অজান্তেই। শত্রুপক্ষের মেয়ে, সন্দেহ নেই। রানার বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের দরজার মুখে রানাকে বাধা দিয়ে খুনীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, তাও ভাল করেই জানা আছে রানার। কিন্তু তবু কেন যেন কৃপা হলো রানার মেয়েটির প্রতি। কেন করছে মেয়েটা এই কাজ? স্বেচ্ছায়, না বাধ্য হয়ে? হাবভাব, চালচলনে তো পাজি মেয়ে বলে মনে হয় না। তাহলে? ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে ওকে? যাই হোক, মেয়েটা শত্রুপক্ষের হোক আর যাই হোক, ওকে এই অপ্রস্তুত, অসহায় অবস্থায় ফেলে মনে মনে খুশি হতে পারল না রানা। তবু তির্যক ভঙ্গিতে বলল, 'বাকি কাগজগুলো দেব? দেখবে? ইচ্ছে করলে নিতে পারো তুমি ওগুলো, আমার আপত্তি নেই।'

ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের দিকে চাইল মেয়েটা। আমতা আমতা করে বলল, 'ওগুলো নিয়ে আমি কি…'

'হুম। ইংরেজি বলবার ক্ষমতা ফিরে আসছে আবার। দেখেছ? বলেছিলাম না?'

আরও লাল হয়ে উঠল মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলে ফেলেছে বুঝতে পেরে। 'প্লীজ, আমি…'

'পরচুলাটা সরে গেছে একপাশে, মিস শেরম্যান।'

চট করে হাতটা উঠল ওর চুলে, ঠকানো হয়েছে বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে নামাল হাতটা, নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে দাঁত দিয়ে, খয়েরী চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। এই কাজটা করে নিজের ওপর বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা, বরং অনুশোচনা হলো।

'প্লীজ। যেতে দিন আমাকে।' পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল মেয়েটা।

যে কোন মুহূর্তে কেঁদে ফেলতে পারে এখন, সেই ভয়ে চট করে সরে দাঁড়াল রানা মেয়েটার পথ ছেড়ে। এত সহজে ছাড়া পেয়ে যাবে সেটা হয়তো আশা করেনি, কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা হোটেল ছেড়ে। ধীর পায়ে পিছন পিছন এসে দাঁড়াল রানা দরজার সামনে। বেশ জোরেশোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বাইরে। ছাতাটা খুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে রওয়ানা হয়ে গেল বিট্রিক্স শেরম্যান ক্যানালের দিকে। বিশ সেকেন্ড পর দেখতে পেল রানা ছাতা মাথায়, ভিজে সপসপে অলেস্টার গায়ে ওই একই দিকে চলেছে সোহানা আর মারিয়া—একবারও চাইল না ওরা হোটেলের সদর দরজার দিকে।

খুব একটা সুখী বলে মনে হলো না ওদের মুখের দিকে চেয়ে।

আবার গিয়ে ঢুকল রানা বারে। অপেক্ষা করতে হবে ওকে আরও অন্তত আধঘন্টা।

আট

লোকজনের কথাবার্তায় আর গ্লাসের টুংটাং শব্দে সরগরম ওল্ডবেলে দরজার দিকে মুখ করে বসল রানা একটা টেবিলে। দরজার দিকে পিঠ ফিরে বসবার ব্যাপারে কোন কুসংস্কার বশে নয়, সোহানা বা মারিয়া যেই হোক পৌঁছলে যেন চট করে দেখতে পায় সেইজন্যেই দরজার দিকে মুখ করে বসল সে এক মগ বিয়ার নিয়ে। বিশ মিনিট অপেক্ষার পর ঢুকল মারিয়া। স্কার্ফ আর ছাতা থাকা সত্ত্বেও ভেজা চুল গালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে ওর।

'খবর সব ভাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল মারিয়া। বার দুয়েক লম্বা করে শ্বাস টেনে বলল, 'চুপচুপে হয়ে ভেজাটা যদি ভাল মনে করেন, তাহলে খবর খুবই ভাল।'

মৃদু হেসে একটা শেরির অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আর সোহানা?'

'সেও ভাল আছে।' শেরিতে চুমুক দিল মারিয়া।

'এবার তৃতীয়জনের কথা শোনা যাক। যাকে অনুসরণ করছিলে। তার খবর কি? কোথায় ও এখন?'

'গির্জায়।'

'কী?'

'মাথা দুলিয়ে হাইম গাইছে।'

'মাশাল্লা। আর সোহানা?'

'সেও গির্জায়।'

'ও-ও কি গান গাইছে?'

হাসল মারিয়া। 'তা বলতে পারব না। আমি ভেতরে ঢুকিনি।'

'সোহানারও বোধহয় না ঢোকাই উচিত ছিল,' ভুরু কুঁচকে বলল রানা।

'গির্জার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর আছে কোথাও?'

'তা ঠিক। ঠিকই বলেছ।' মুখে বলল ঠিকই, কিন্তু কেন যেন ভিতর ভিতর একটা অস্বস্তিবোধ খোঁচাতে শুরু করল ওকে।

রানার মনের ভাবটা আঁচ করে নিয়ে মারিয়া বলল, 'আমাদের একজনকে থেকে যেতে বলেছিলেন না?'

'বলেছিলাম।'

'সোহানা বলল, গির্জার নামটা শুনলে নাকি অবাক হবেন আপনি।'

'অবাক হব?' নাম শোনার আগেই অবাক হলো রানা। 'গির্জার নাম শুনে অবাক হওয়ার…' থেমে গেল রানা। বিস্ফারিত চোখে চাইল মারিয়ার মুখের দিকে। 'দা ফার্স্ট রিফর্মড চার্চ অফ দা অ্যামেরিকান হিউগানট সোসাইটি?' মারিয়াকে মাথা নাড়তে দেখে একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এতক্ষণে বলছ সেকথা! উঠে পড়ো। আমি বিলটা দিয়ে আসছি, চট করে শেষ করে ফেলো

গ্লাসটা।'

'কি ব্যাপার, মেজর রানা? গির্জার কথা শুনে…'

মারিয়ার কথা শেষ হওয়ার জন্যে আর অপেক্ষা করল না রানা, কাউন্টারে গিয়ে দাম চুকিয়ে এল চট করে। বাইরে বেরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'এত ব্যস্ত হওয়ার কি ঘটেছে?'

'আজ সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিল, কি কি ঘটেছে, কিছুই বলেনি তোমাকে সোহানা?'

'বলবার সুযোগ পায়নি,' বলল মারিয়া। 'ও যখন ফিরে আসে, আমি তখন ঘুমে। রাস্তায় চলতে চলতে শুনছিলাম। সবিস্তারে। কিন্তু ও যখন সেই ভয়ঙ্কর গলিতে দাঁড়িয়ে আপনার কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছে ঠিক সেই সময় গির্জার মধ্যে ঢুকে পড়ল সামনের মেয়েটা। ওল্ডবেলে ফিরে গিয়ে আপনাকে খবরটা জানাতে বলেই ঢুকে গেল সেও গির্জার মধ্যে।'

হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল রানা। দশ মিনিট পর একটা গলির মুখে ছেড়ে দিল ট্যাক্সিটা। সেই গলি ধরে ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটা বাঁক নিতেই হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া: 'আশ্চর্য! কোন্ রাস্তায় কিভাবে এলাম? ওই তো সামনে দেখা যাচ্ছে গির্জাটা!'

গজ পঞ্চাশেক দূরে খালের ধারে দেখা যাচ্ছে বিমর্ষ চেহারার এক গির্জা। একেবারে ঝুরঝুরে। দেখলে মনে হয় যে কোন সময়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। রানা আন্দাজ করল, বয়স এটার অন্তত চারশো বছর তো হবেই। একমাত্র বিশ্বাসের জোরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। এতদূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, গির্জার মাথায় চৌকোণ টাওয়ারটা অন্তত পাঁচ ডিগ্রী হেলে রয়েছে খালের দিকে—মনে হয় জোরে একটা ধমক দিলেই গোটা গির্জাটা ঝপাৎ করে ডাইভ দিয়ে পড়বে খালে। অল্পদিনেই ফান্ড সংগ্রহের কাজে নামতে হবে হিউগানট সোসাইটিকে গির্জাটা সম্পূর্ণ ধসিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে গড়ার জন্যে।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে রানা বুঝতে পারল, কেবল গির্জাটাই নয়, পুরো এলাকার প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িই তৈরি হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে। খালের ধারে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়িঘর। মস্ত লম্বা বুমসহ প্রকাণ্ড এক ক্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিষ্কার করা জায়গার ঠিক মাঝখানে। বুমটা এতই উঁচু যে অন্ধকারে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না ওটার শেষ মাথা। খুব দ্রুত কাজ চলছে বলে মনে হলো—একপাশে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে ফাউন্ডেশন পর্যন্ত উঠে পড়েছে গোটা কয়েক হবু মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং।

ক্যানেলের ধার ঘেঁষে এগোল ওরা ধীর পায়ে। কিছুদূর এগিয়েই কানে এল অর্গানের বাজনা, সেইসাথে মহিলা কণ্ঠের গান। গানের সুরে মধুর একটা নিরাপদ শান্তির বাণী টের পেল রানা—ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। মনে পড়ে গেল ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের সেই নিঃসঙ্গ গির্জাটার কথা; ব্রাদার জুড, ব্রাদার লিগোরির কথা, ধনাইয়ের কথা; ছাতখোলা ল্যাট্রিনের নালায় নিমের বীচি আর প্রস্রাবের ঝাঁঝের কথা; টিফিন আওয়ারে গোল্লাছুটের

কথা, কবে এই ধরাবাঁধা নিয়ম আর উঁচু পাঁচিলের বেড়া ডিঙিয়ে বেরোতে পারবে সেই ভেবে বড় হওয়ার তীব্র বাসনার কথা; ধনাইয়ের বাজানো ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টার কথা; স্কুল-মাঠের ওপর দিয়ে সুতো ঝুলিয়ে কাটা-ঘুড়ি উড়ে যাওয়ার কথা।

'কি ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'না, কিছু না। ভাবছি, সার্ভিস চলছে এখনও···তুমি বরং এক কাজ করো, ভেতরে গিয়ে···' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রানা। সাদা রেনকোট পরা কালো চুলের এক মেয়েকে ওদের পাশ কাটিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে গির্জার দিকে এগোতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর ডাকল, 'এ্যাই!'

নির্জন রাস্তায় পুরুষকণ্ঠে এই ধরনের ডাক এলে কি করতে হয় ভালমতই জানা আছে মেয়েটার—ঝট করে একবার রানার দিকে চেয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল সে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই ভেজা কাঁকরে পা পিছলে হোঁচট খেলো, সামলে নিয়ে আরও দুই কদম যেতে না যেতেই ধরে ফেলল ওকে রানা। কয়েক সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করেই হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল মেয়েটা, দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। কাছে এসে দাঁড়াল মারিয়া। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা।

'পরিচিত কেউ?' জিজ্ঞেস না করে পারল না সে।

'আজই সকালে পরিচয় হয়েছে। এর কথা বলেছি তোমাকে মারিয়া, এরই নাম ইরিন। ইরিন মাগেনথেলার।'

'ও।' ইরিনের বাহুর ওপর হাত রাখল মারিয়া, কিন্তু ওকে তেমন পাত্তা দিল না ইরিন, আরও একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার মুখের দিকে, ঠিক চার ইঞ্চি দূর থেকে।

'তুমি খুব ভাল,' দ্বিতীয়বার ঘোষণা করল ইরিন। 'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। সকালেই বলেছ তুমি আমাকে। মুসিবত!'

'কি করা যায় এখন?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'সেটাই ভাবছি। তুমি চিনতে পারবে না, আমারই পৌঁছে দিতে হবে ওকে বাড়িতে। ট্যাক্সিতে তুলে দিলে প্রথম ট্র্যাফিক লাইটে পৌঁছেই ভাগবে গাড়ি থেকে নেমে। খুব সম্ভব নাক ডাকাচ্ছে বুড়িটা, সেই সুযোগে পালিয়েছে ও বাড়ি থেকে। ওর বাপ হয়তো এতক্ষণে চষে বেড়াচ্ছে সারা শহর।'

বেশ কিছুটা জোর খাটিয়েই গলা থেকে ইরিনের একটা হাত খসাল রানা, আস্তিন তুলে ফেলল ওপরে। হাইপোডার্মিকের খোঁচায় খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হাতটার দিকে চেয়ে নিজের অজান্তেই 'ইশ্‌শ্‌' বলে উঠল মারিয়া। গাল দুটো কুঁচকে গেছে ওর হাতের অবস্থা দেখে। আস্তিনটা টেনে নামিয়ে দিল রানা। সকালের মত কান্নায় ভেঙে না পড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল খিল করে হাসতে শুরু করল ইরিন, যেন খুব মজার কাণ্ড হচ্ছে একটা। বামহাতটাও পরীক্ষা করে দেখল রানা, নামিয়ে দিল আস্তিন।

'নতুন কোন দাগ নেই,' বলল রানা।

'হাতে নেই,' বলল মারিয়া। 'অন্য কোথাও থাকতে পারে।'

'তাই বলে এতবড় মেয়েকে তো আর রাস্তার ওপর ন্যাংটো করে দেখা যায় না। দাঁড়াও, কথা বোলো না, ভাবতে দাও আমাকে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল: 'ওদের কেউ তোমাকে দেখেছে? গির্জায় যারা আছে, তাদের কেউ?'

'মনে হয় না।'

'কিন্তু সোহানাকে নিশ্চয়ই দেখেছে ওদের অনেকেই।'

'দেখেছে হয়তো, কিন্তু আবার দেখলে চিনতে পারবে, এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। স্কার্ফ জড়ানো রয়েছে ওর মাথায়, তার ওপর কোটের হুড রয়েছে। তাছাড়া দরজার বাইরে থেকে দেখেছি, ছায়ার মধ্যে আড়াল হয়ে বসেছিল ও।'

'ওকে বাইরে নিয়ে এসো। সার্ভিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে কোথাও অপেক্ষা করো। শেরম্যান বেরোলে ওকে অনুসরণ করবে তোমরা। আর চেষ্টা করবে ওদের মধ্যে যতগুলো সম্ভব চেহারা মনে রাখতে।'

'সেটা সহজ হবে না।' মাথা নাড়ল মারিয়া।

'কেন?'

'সবাই ওরা একই রকম দেখতে।'

'তার মানে?'

'বেশির ভাগই নান্। হাতে বাইবেল, কোমরে রশি, মাথা ঢাকা—চুল দেখবার উপায় নেই, সব ক'জনের লম্বা কালো কাপড়, আর সাদা…'

'নান্‌রা কি পোশাক পরে আমার জানা আছে।' একটু কঠোর শোনাল রানার গলা।

'তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা আপনার জানা নেই—এদের প্রত্যেকেই কমবয়সী, প্রত্যেকেই সুন্দরী। কয়েকজন তো রীতিমত…'

'নান্ আর স্কুল মিস্ট্রেস হলেই যে বুড়ি আর কুৎসিত হতে হবে তার কোন মানে আছে? অসম্ভব কিছু করতে বলছি না আমি তোমাদের…যতদূর সম্ভব, মনে রাখার চেষ্টা করবে ওদের চেহারাগুলো। শেরম্যানকে অনুসরণ করে যেখানে গিয়ে পৌঁছবে সে ঠিকানাটা ফোন করে জানাবে তোমাদের হোটেলে। বলে রাখবে, আমি ফোন করলে যেন জানানো হয় আমাকে। বোঝা গেছে? চলো ইরিন। বাড়ি।'

নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মত রানার হাত ধরে এগোল ইরিন, কিছুদূর হেঁটেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা, গাড়িতে উঠে আবোল-তাবোল শিশুর প্রলাপ বকে গেল ইরিন, নিজের চিন্তায় ডুবে রইল রানা। মাগেনথেলারের দোরগোড়ায় ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকল সে ইরিনকে নিয়ে।

ছেলেপিলের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা থেকে হঠাৎ মুক্তি পেলে বাপ-মা যেমন স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে এবং ঠিক যতটা কটু ভাষায় বকাবকি করে, তাই জুটল ইরিনের কপালে মাগেনথেলার আর মারগ্রিয়েটের কাছ থেকে। ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ঝটপট দুটো গ্লাসে খানিকটা করে হুইস্কি ঢালল

মাগেনথেলার, বসবার জন্যে অনুরোধ করল রানাকে। মাথা নাড়ল রানা।

'বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কর্নেল ডি গোল্ডকে এখন ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? একটা গাড়ি ধার নিতে চাই ওঁর কাছ থেকে—ফাস্ট কার।'

মৃদু হাসল মাগেনথেলার। 'কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করব না আমি। কর্নেলকে অফিসেই পাবেন, আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবেন উনি অফিসে।' গ্লাসটা উঁচু করল সে। 'আপনাকে লক্ষ-কোটি ধন্যবাদ। কতটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম, বোঝাতে পারব না আমি আপনাকে।'

'পুলিস অ্যালার্টের ব্যবস্থা করেছিলেন?'

'করেছিলাম—কিন্তু আন-অফিশিয়াল পুলিস অ্যালার্ট।' ম্লান হাসল ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার। 'কারণটা বলেছি আপনাকে। বিশ্বস্ত কয়েকজন বন্ধুকে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু অ্যামস্টার্ডামের নয় লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে একজনকে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'আচ্ছা, বলুন তো, বাড়ি থেকে অতটা দূরে কেন গিয়েছিল ও?'

'প্রায়ই তো যায় ওখানে ও মারগ্রিয়েটের সঙ্গে। গির্জায়। হাইলার দ্বীপের যত লোক এখানে আছে, সবাই যায় ওটাতে। ওটা একটা হিউগানট চার্চ, হাইলারেও আছে একটা। মারগ্রিয়েটের সঙ্গে মাঝে মাঝে দ্বীপেও যায় ইরিন চার্চ অ্যাটেন্ড করতে। গির্জা আর ভন্ডেল পার্ক—এই দুটোই তো বেচারীর একমাত্র আউটিং।'

বিশাল বপু নিয়ে কামরায় ঢুকল মারগ্রিয়েট, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইল মাগেনথেলার ওর দিকে। হাসিহাসি মুখে মাথাটা এপাশ-ওপাশ নেড়ে বেরিয়ে গেল মারগ্রিয়েট ঘর থেকে। মস্ত হাঁপ ছেড়ে রানার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর।

'থ্যাঙ্ক গড। নতুন কোন ইঞ্জেকশন পড়েনি।' একঢোকে গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'অন্তত আজকের মত নিশ্চিন্ত।'

গ্লাসটা শেষ করেই বিদায় নিল রানা। ট্যাক্সি সোজা এসে থামল মার্নিক্সস্ট্রাটে। আগেই ফোনে জানিয়ে দিয়েছে মাগেনথেলার, কাজেই রানার অপেক্ষাতেই বসে রয়েছে কর্নেল ডি গোল্ড। রানা ঢুকতেই ফাইল থেকে চোখ তুলল, খোলা পাতার ওপর একটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল ফাইলটা।

'বেশ অনেকদূর এগিয়েছেন আশা করলে কি ভুল হবে?'

'হবে।'

'বলেন কি? আপনার ওপর অনেক আশা করে রয়েছি আমি। কিছুই এগোতে পারেননি?'

'অতি সামান্য। উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়।'

'গাড়ির ব্যাপারে কি যেন বলছিল ইন্সপেক্টর ফোনে?'

'হ্যাঁ। একটু দরকার হয়ে পড়েছে।'

'কি দরকার জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'ওটা চালাব।' বলেই হাসল রানা। 'তবে কেবল ওই কারণেই আসিনি আমি আপনার কাছে।'

'আমি জানি, নিশ্চয়ই আরও কোন ব্যাপার আছে।'

'একটা সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার।'

'কিসের জন্যে?'

'সার্চ করার জন্যে।' আবার হাসল রানা। 'ব্যাপারটাকে আইনসঙ্গত করবার জন্যে সঙ্গে যদি কোন সিনিয়ার অফিসার দিতে পারেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'কোথায় সার্চ করতে হবে?'

'ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানী। সুভ্যেনিরের ওয়েরহাউজ। ডকের পাশ দিয়ে যেতে হয়, পুরানো শহরে—ঠিকানাটা বলতে পারব না।'

'ঠিকানা বের করে নিতে অসুবিধে হবে না। নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।' মাথা ঝাঁকাল ডি গোল্ড। 'কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কোনদিন কোনকিছু শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। আইনের চোখে টিকবে, এমন কোন চার্জ আছে আপনার ওদের বিরুদ্ধে?'

'না। তা নেই।'

'তাহলে বিশেষ করে ওদের সম্পর্কেই আপনার এই কৌতূহল কেন?'

'তা বলতে পারব না। কসম। আমি আসলে জানতে চাই, কেন এই কৌতূহল জাগছে আমার মধ্যে। আজ সন্ধের পর গিয়েছিলাম আমি ওদের ওখানে…'

'বন্ধ দেখে ফিরে এসেছেন।'

'না ফিরে আসিনি।' আবার হাসল রানা। একগোছা চাবি বের করে কর্নেলের নাকের সামনে দোলাল।

'বিপদে ফেলবেন দেখছি!' খেপে গেল কর্নেল। 'আপনি জানেন, এ ধরনের যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখা আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ?'

চট করে পকেটে ফেলল রানা স্কেলিটন চাবির গোছা। 'কোন্ ধরনের যন্ত্রপাতি, কর্নেল?'

'না, কিছু না। দৃষ্টিবিভ্রম।' চোখ দুটো ছোট হয়ে এল কর্নেলের।

সিগারেট ধরাল রানা। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে ছাতের দিকে ছাড়ল। তারপর অনেকটা আপন মনে বলল, 'ওদের অফিসঘরের স্টীলের দরজায় টাইম লকের ব্যবস্থা কেন করা হলো জানবার কৌতূহল বোধ করছি। আমার কৌতূহল: ওদের কাছে বাইবেলের স্টক কেন।' ক্যানাবিসের গন্ধ আর পুতুলের আড়ালে সজাগ দুটো চোখের কথা চেপে গেল সে। 'কিন্তু আমার আসল কৌতূহল ওদের সাপ্লায়ারদের সম্পর্কে। ওদের লিস্ট অভ সাপ্লায়ার হাতে পেতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে। সার্চ ওয়ারেন্ট একটা যে কোন প্রিটেক্সটে তৈরি করে নেয়া যাবে। আমি নিজে যাব আপনার সঙ্গে। কাল সকালে। কিন্তু আপনার এই কৌতূহল সম্পর্কে আরও কিছু জানাতে হবে কাল। এবার গাড়ির প্রসঙ্গে

আসা যাক। ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার চমৎকার এক সাজেশন দিয়েছে। স্পেশাল এঞ্জিন লাগানো একটা পুলিস-কার আছে আমাদের, হ্যান্ডকাফ থেকে শুরু করে টু-ওয়ে রেডিও পর্যন্ত সবই রয়েছে ওটাতে—কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ একটা ট্যাক্সি। দুই মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওটা। তবে ট্যাক্সি চালানোর ব্যাপারে রাস্তায় কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

হেসে ফেলল রানা। 'বুঝলাম। বাড়তি কিছু রোজগার করি, সেটা আপনার সহ্য হচ্ছে না। যাই হোক, আমার জন্যে আর কোন খবর আছে?'

'আসছে। দুই মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আপনার ওই গাড়িতে করেই আসছে সংবাদ রেকর্ড অফিস থেকে।'

ঠিক দুই মিনিট পর একটা ফাইল দিয়ে গেল একজন সেপাই কর্নেলের ডেস্কের ওপর। মুহূর্তে ওটার মধ্যে ডুবে গেল ভ্যান ডি গোল্ড, কয়েকটা পাতা উল্টে চোখ তুলল।

'বিট্রিক্স শেরম্যান। ডাচ ফাদার, গ্রীসিয়ান মাদার। ওর বাপ ছিল এথেন্সের ভাইস কনসাল—মারা গেছে। মা কোথায় কি অবস্থায় আছে, জীবিত কি মৃত জানা যায় না। বয়স চব্বিশ। ওর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছুই নেই আমাদের হাতে।' ফাইলের পাতায় চোখ রেখে গড়গড় করে বলে চলল কর্নেল। 'তবে ব্যাকগ্রাউন্ড বেশ কিছুটা আবছা বলে মনে হচ্ছে আমার। ব্যালিনোভা নাইট ক্লাবে কাজ করে হোস্টেসের, থাকে কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে। আত্মীয় বলতে একজনই আছে ওর—হেনরী, ছোটভাই, বয়স বিশ। এই দেখুন, এতক্ষণে একটু জমে উঠছে বলে মনে হচ্ছে—ভাইটি ছ'মাসের জন্যে জেলের ভাত খেয়েছেন।'

'কি ব্যাপারে? ড্রাগস?'

'অ্যাসল্ট এবং অ্যাটেম্পটেড রবারী। অ্যামেচারিশ প্রচেষ্টা। ভুল করে বেচারী এক সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দা পুলিসকে পাকড়েছিল শিকার হিসেবে। স্বীকার যায়নি, কিন্তু পুলিসের সন্দেহ—ছোকরা অ্যাডিক্ট। ড্রাগস কেনার পয়সার জন্যে ডাকাতি করবার চেষ্টা করেছিল। ব্যস। এই হচ্ছে বিট্রিক্স শেরম্যান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।' কয়েকটা পাতা উল্টে আরেক পৃষ্ঠায় স্থির হলো কর্নেলের দৃষ্টি। 'আর ওই যে নম্বর দিয়েছিলেন অর্থ উদ্ধারের জন্যে…একটা নম্বরের মানে বের করা গেছে। MOO 144 হচ্ছে বেলজিয়ান কোস্টার মেরিনোর কল-সাইন। আগামীকাল এসে ভিড়বে আমাদের ঘাটে। বেশ কিছু কাজের লোক আছে আমার, কি বলেন?'

'হ্যাঁ। কখন পৌঁছবে মেরিনো?'

'দুপুরে। সার্চ করতে হবে ওটাকে?'

'সার্চ করে কিছু পাবেন না। কাজেই দয়া করে ওটার কাছেও যাবেন না। আমার কাজের অসুবিধে হবে তাহলে।' কর্নেলকে ফাইল বন্ধ করে দিতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বাকি দুটো নম্বর থেকে কিছু বের করা গেল?'

'উঁহুঁ। কিছুই বোঝা যায়নি…' আবার ফাইলটা খুলল কর্নেল। 'কত যেন

ছিল নম্বরগুলো? নাইন ওয়ান ডাবল জিরো টু জিরো, আরেকটা টু সেভেন নাইন সেভেন। আচ্ছা!' ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল ডি গোল্ড। 'শেষেরটা সেভেন নাইন সেভেনের ডবল না তো? দেখুন তো, সেভেন নাইন সেভেন সেভেন নাইন সেভেন—নম্বরটা পরিচিত মনে হয়?'

মাথা নাড়ল রানা।

ড্রয়ার টেনে একটা টেলিফোন ডাইরেক্টরি বের করল কর্নেল, কিন্তু আবার ওটা রেখে দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিল। 'একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, লিখে নাও। সেভেন নাইন ডাবল সেভেন নাইন সেভেন। টেলিফোনটা কার নামে আছে বের করে জানাও আমাকে। এক্ষুণি।'

ঠিক বিশ সেকেন্ড পর বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভারটা কানে তুলে চুপচাপ তিন সেকেন্ড শুনে নামিয়ে রাখল কর্নেল। রানার দিকে চাইল হাসিমুখে।

'বালিনোভা নাইট-ক্লাব।'

'সত্যিই এফিশিয়েনসি আছে আপনাদের, স্বীকার করতেই হয়,' বলল রানা মুখে। মনে মনে বলল: তবু কি করে বছরের পর বছর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর এক গুপ্ত দল আপনাদের নাকের ডগায় বসে? কেন আমাকে আসতে হচ্ছে সুদূর বাংলাদেশ থেকে?

'এই বার? কি বুঝছেন?'

'বুঝতে পারছি, এই নাইট-ক্লাবের সাথে সম্পর্ক ছিল কার্লটন হোটেলের সাততলার ফ্লোর ওয়েটারের।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কর্নেল রানার মুখের দিকে। বুঝতে পেরেছে, নম্বরগুলো কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল রানা, কিভাবে সংগ্রহ করেছিল সেটাও আঁচ করে নিতে অসুবিধে হলো না তার। পনেরো সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'বড় বিপজ্জনক খেলায় নেমেছেন, মেজর মাসুদ রানা।'

উঠে দাঁড়াল রানা। হাত বুলাল নিজের গালে। 'অনেক লোকেরই চেনা হয়ে গেছে মুখটা। ছদ্মবেশের কিছু মালমশলা পাওয়া যাবে না আপনাদের হেডকোয়ার্টারে?'

'ছদ্মবেশ!' চোখ মিটমিট করল কর্নেল। হেসে ফেলল। 'ওহ্ নো! এই যুগে? শার্লক হোমস মারা যাওয়ার এত বছর পরেও?'

'শার্লক হোমসের অর্ধেক বুদ্ধি যদি থাকত আমার মাথায়, তাহলে ছদ্মবেশের কোন প্রয়োজনই পড়ত না।' কথাটা বলল রানা এমন সুরে, যাতে শ্রোতার বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। 'কিন্তু এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এছাড়া আর কোন গত্যন্তর দেখতে পাচ্ছি না।'

'অলরাইট,' বলল কর্নেল। 'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'দরকারটা আমার এক্ষুণি।'

বিশাল শরীরটা টেনে তুলল কর্নেল চেয়ার থেকে।

'বেশ। আসুন আমার সঙ্গে।'

নয়

সত্যিই, বাইরে থেকে দেখতে অবিকল একটা ট্যাক্সিই। ওপেল। কিন্তু গাড়িটার স্পীড দেখে রীতিমত খুশি হয়ে উঠল রানা। দারুণ এক এঞ্জিন লাগিয়ে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এর শক্তি। এছাড়াও আরও কিছু কারিগরী রয়েছে এর মধ্যে। সাইরেনের ব্যবস্থা তো আছেই, একটা বোতাম টিপলে একখানা আনব্রেকেব্‌ল্‌ ফাইবার গ্লাসের শীট নেমে আসে ছাত থেকে, মুহূর্তে আলাদা হয়ে যায় গাড়িটা দুটো কম্পার্টমেন্টে—পেছনের আরোহীর সঙ্গে চোখের দেখা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকে না ড্রাইভারের। আরেকটা বোতাম টিপলে ছাতের একটা অংশ খুলে মাথা তুলবে পুলিস লাইট। আরেকটা টিপলে পেছনের একটা প্যানেলে ফুটে উঠবে উজ্জ্বল লেখা—স্টপ! প্যাসেঞ্জার সীটের তলায়—অর্থাৎ, ড্রাইভারের পাশের সীটের নিচে রয়েছে পাকানো রশি, ফার্স্ট-এইড কিট, টিয়ার গ্যাস-ক্যানিস্টার। দরজার পকেটে রয়েছে একজোড়া হ্যান্ডকাফ, সেই সঙ্গে চাবি। পেছনের বুটে যে আরও কত কি কৌশল রয়েছে জানাবার চেষ্টা করেছিল কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড, কিন্তু শুনতে চায়নি রানা, মাথা নেড়ে বলেছে: ওসব আমার কোন কাজে লাগবে না কর্নেল, গাড়িটা জোরে চলে কিনা সেটাই আসল কথা।

ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবের কাছেই নো পার্কিং লেখা একটা জায়গায় গাড়িটা রাখল রানা রাস্তার অপর পাড়ে দাঁড়ানো এক ইউনিফর্ম পরা কনস্টেবলের ঠিক নাক বরাবর। তিন সেকেন্ড গাড়িটার দিকে চেয়ে থেকে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল কনস্টেবল, তারপর মর্যাদার সাথে দূরে সরে গেল হাঁটতে হাঁটতে। রানা বুঝল, পুলিসের গাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি কনস্টেবলের; কেউ যদি প্রশ্ন করে: যেখানে পার্ক করলে সবার গাড়িতেই হলুদ টিকেট সেঁটে দেয়া হয়, ঠিক সেই জায়গায় তোমার চোখের সামনে পার্ক করল একটা ট্যাক্সি, আর তুমি দেখেও দেখলে না কোন্ বিশেষ কারণে, ঘুষটুষ খেয়েছে নাকি—কোন উত্তর দিতে পারবে না সে; কাজেই মানে মানে কেটে পড়ল লোকটা।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা, দরজায় লক করে এগোল ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবের দিকে। ছোট্ট একটা নিয়ন সাইনে নাম লেখা, নামের দুইপাশে দু'জন প্রায়-উলঙ্গ নর্তকীর ফিগার আউটলাইন—জ্বলছে, নিভছে। সুইংডোরের দুইপাশে খানিকটা করে জায়গা কাঁচঢাকা, অনেকগুলো পেইন্টিং আর ফটোগ্রাফ সাজানো রয়েছে সেখানে আর্ট এগজিবিশনের কায়দায়। এগুলোর দিকে একনজর চাইলেই ভিতরে কি ধরনের সৌন্দর্যচর্চা চলেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। সবগুলোই মেয়েমানুষের ছবি। কোন কোনটায় কানের দুল আর পায়ের হাইহিল জুতো ছাড়া আর কোন পোশাক পরিচ্ছদের বালাই

নেই, এমন সব বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়ানো কিংবা বসা যে ওগুলোর দিকে দশ সেকেন্ড চেয়ে থাকলেই যৌবন ফিরে পাবে অশীতিপর বৃদ্ধ। কাঁচের গায়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। যদি জানা না থাকত ও কে, তাহলে চিনতেই পারত না সে নিজেকে। ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বেশ বড়সড় একটা ঘর। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বিদঘুটে গন্ধ এল রানার নাকে—অনেকটা রাবার-পোড়া মত। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, স্বাভাবিক কোন কারণে তৈরি হচ্ছে না গন্ধটা—স্প্রে করা হচ্ছে ওটা কয়েক মিনিট পর পর। কেন? নিশ্চয়ই আরও কিছু গন্ধ ঢাকবার উদ্দেশ্যে? মনে মনে ওদের বুদ্ধির প্রশংসা করল রানা। এই বিশেষ গন্ধটির একমাত্র গুণ হচ্ছে কিছুতেই আর কোন গন্ধ নাকে আসবে না কারও। ভাল। সারাটা ঘর ম্লান আলোয় আলোকিত। ঘরের এককোণে ছোট্ট একটা স্টেজের একপাশে উদ্দাম ছন্দে একটা আফ্রিকান ড্রাম বাজাচ্ছে একজন পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান নিগ্রো, ঘন কালো কোঁকড়া চুল খাড়া হয়ে রয়েছে মাথার ওপর আধহাত। চকচকে, পিচ্ছিল, কালো শরীরে কাপড়চোপড়ের কোন বালাই নেই—কোমরের কাছে কিছু পাতা-টাতা বেঁধে লজ্জা নিবারণ করেছে (অবশ্য যদি লজ্জা বলে কিছু থেকে থাকে), গলায় বন্য জন্তুর দাঁত দিয়ে তৈরি মালা। বিদঘুটে ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, আর দমাদম ড্রাম পেটাচ্ছে লোকটা—স্পট লাইটের বেগুনী আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওর অঙ্গভঙ্গি।

দপ করে জ্বলে উঠল একটা গোলাপী আলো। দেখা গেল স্টেজের এক কোণে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবধবে ফর্সা এক যুবতী, এক ইঞ্চি আকৃতির গোটা দুই চকচকে তারা দিয়ে বুক ঢাকা, কোমর থেকে ঝুলছে আধ হাত লম্বা একটা ঝাঁকিজাল। নাচতে শুরু করল যুবতী দুলে দুলে, প্রতিটা স্টেপিঙের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। দুলছে কোমর, যেন ঢেউ উঠছে ভূমধ্যসাগরে। স্পট লাইটের আলোয় দেখা গেল মেয়েটার পেছনে আবছামত দেখা যাচ্ছে সবুজ পাতা দিয়ে ছাওয়া একটা বড়সড় বাঁশের খাঁচা।

চারপাশে চেয়ে দেখল রানা। পুরুষের সংখ্যাই বেশি। তবে মেয়েও নেহায়েত কম নেই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দর্শকবৃন্দ নর্তকীর দিকে। ছন্দের গতি বাড়ছে ক্রমে। সাথে সাথে বাড়ছে দর্শকদের হৃৎপিণ্ডের গতি। বেশির ভাগেরই তেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স, তবে মাঝবয়সী বা বৃদ্ধও যে একেবারে নেই তা নয়। সবাই সমভাবেই উপভোগ করছে যুবতীর উদ্দাম নৃত্য। দর্শকমণ্ডলীর পোশাক দেখে সচ্ছলতার আভাস পেল রানা। নাইট-ক্লাব অবশ্য সব দেশেই ধনীদের জন্যে, তবে এটা দেখে মনে হচ্ছে এর চাকচিক্য যেন আরও কয়েক ডিগ্রী চড়া—অ্যামস্টার্ডামের সেরা নাইট-ক্লাবগুলোর মধ্যে এটা যে অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে এসে থামল রানার দৃষ্টি। বসে আছে মারিয়া আর সোহানা। এমন ভঙ্গিতে, যে ওদের মনের সাথে যে এই ক্লাবের মূল সুরের মিল নেই, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। কেমন একটা নিঃসঙ্গ, ছাড়াছাড়া দায়িত্বপালনের ভাব।

ছদ্মবেশের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হলো না রানার। কেউ

খেয়ালই করল না ওর উপস্থিতি। ছন্দের সাথে সাথে বাড়ছে উত্তেজনা—হাতের গ্লাসগুলো এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে সবাই, মনে হচ্ছে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে। স্বর্ণকেশী সুন্দরী স্টেজের ওপর কিলবিল করছে মেরুদণ্ডবিহীন গোলাপী সাপের মত। বাঁশের খাঁচাটার একটা অংশ খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নীল একটা কম পাওয়ারের স্পট লাইট জ্বলে উঠেছে। কি যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে খাঁচার মধ্যে।

সোহানা আর মারিয়া যে টেবিলে বসে আছে, ঠিক তার পাশের টেবিলে বসল রানা একটা চেয়ার টেনে। সোহানার এতই গায়ের কাছে বসল যে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে রানার মুখের দিকে। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিল রানা সোহানাকে। চমকে উঠল সোহানা রানার হাসি দেখে, চট করে সরে সরে গেল ছয় ইঞ্চি।

'ভয় কি? বড়জোর অশ্লীল কোন প্রস্তাব দিতে পারি, খেয়ে তো আর ফেলব না?' বলল রানা হাসিমুখে। আবার চমকে উঠল সোহানা। এবার ওর সাথে মারিয়াও। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে ওরা রানার মুখের দিকে।

'কি ব্যাপার?' বেশ কিছুক্ষণ পর কিছুটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'তোমার মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে দিল কে?'

'কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড। মাসুদ রানা দি গ্রেট এখন ছদ্মবেশে। অত জোরে চেঁচিয়ো না, গলাটা নামাও।'

'কিন্তু··· কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া। 'দুই মিনিটও হয়নি এই ঠিকানা জানিয়ে ফোন করেছি আমি আমাদের হোটেলে।'

'অন্য সোর্স থেকে খবর পেয়ে এসেছি আমি এখানে। গির্জা থেকে সোজা এখানে এসে ঢুকেছে শেরম্যান? সহজ গলায় কথা বলো, ফিসফিস করবার দরকার নেই।'

গলা দিয়ে আওয়াজ বের করল না কেউ, মাথা ঝাঁকাল দু'জন একসাথে।

'বেরিয়ে যায়নি এখান থেকে?'

'সদর দরজা দিয়ে বেরোয়নি।' স্টেজের পাশে একটা বন্ধ দরজার দিকে চাইল সোহানা। 'ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে মিনিট পাঁচেক হলো।'

দরজাটার দিকে চাইল রানা। চট করে চোখ গেল স্টেজের দিকে। নীল স্পট লাইনের আলোটা জোরদার হচ্ছে ক্রমে। কালো, লোমশ, বিশাল, বিকট একটা মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বাঁশের খাঁচার একটা অংশ খুলে গেছে—খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসছে মস্ত এক গরিলা, ঝকঝক করছে ভয়ঙ্কর সাদা দাঁত, হাতদুটো ঝুলছে হাঁটুর কাছে। আরও দুই পা এগোতেই পরিষ্কার দেখা গেল পুরুষ গরিলা। যদিও সবাই জানে ওটা গরিলার খোলস পরা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু ভয়ে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন। নিগ্রোটা তাল বাড়িয়ে দিয়েছে আরও, পাগলের মত বাজিয়ে চলেছে সারা শরীরে কাঁপন তুলে। মেয়েটা যেন টেরই পায়নি যে পিছন থেকে ভীষণ এক গরিলা এগিয়ে আসছে, আপন মনে নেচে চলেছে সে উদ্দাম অশ্লীল নাচ—এমন

সব অঙ্গভঙ্গি করছে যে নিজের অজান্তেই কুঁচকে উঠছে সোহানার নাক।

'গির্জার নানগুলোর চেহারা মনে রাখতে বলেছিলাম, রেখেছ?'

'চেষ্টা করেছি,' বলল মারিয়া।

'অদ্ভুত, বিসদৃশ বা ওই রকম কিছু চোখে পড়েছে তোমাদের কারও?'

'তেমন কিছু না,' বলল সোহানা। 'তবে ওখানকার সন্ন্যাসিনী প্রত্যেকেই দেখতে ভাল।'

'আগেই শুনেছি খবরটা মারিয়ার কাছে। আর কিছু চোখে পড়েনি?'

দু'জন দু'জনের দিকে চাইল, একটু ইতস্তত করে মারিয়া বলল, 'একটা ব্যাপার একটু অবাক লেগেছে আমার কাছে। গির্জায় ঢুকল অনেক বেশি লোক, বেরোল কম।'

'তার মানে?'

'ঠিকই বলছে মারিয়া,' বলল এবার সোহানা। 'প্রার্থনার সময় যত লোক দেখেছিলাম, বের হলো অনেক কম।'

'অনেক বলতে কি বোঝাতে চাইছ?'

একটু ইতস্তত করে সোহানা বলল, 'মানে··· বেশ কিছু।'

'বা বা! অনেক থেকে এক লাফে চলে এলে "বেশ কিছু"তে। এরপর আরেক লাফে শূন্যতে নেমে যাবে মনে হচ্ছে? যাই হোক তোমাদের মনে হচ্ছে, গির্জায় যত লোক ছিল সবাই বেরোয়নি, এই তো? কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্যে থেকে যেতে পারে। খুব একটা অবাক হওয়ার কি আছে এতে?'

কেউ কোন জবাব দিল না। দর্শকদের চিৎকারে তিনজনই চাইল স্টেজের দিকে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নর্তকী এখন গরিলার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। ধরে ফেলে ফেলে, এমনি অবস্থায় হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, চেঁচিয়ে উঠছে ভয়ে, দমাদম বুক পিটছে গরিলা, আবার চেষ্টা করছে ওকে ধরতে। ড্রামের দ্রুত ছন্দ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, নাচন শুরু হয়ে গেছে দর্শকদের রক্তে। তালে তালে শরীর ঝাঁকাচ্ছে সবাই, পৈশাচিক আনন্দ লাভ করছে ওদের ধর্ষণকামী প্রবৃত্তি। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আওয়াজ করে থেমে গেল ড্রাম। লোমশ বুকের ওপর চেপে ধরেছে গরিলা যুবতীকে। ছটফট করছে মেয়েটা ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। টানাহেঁচড়ায় সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা নক্ষত্রদুটো খসে গেল ওর বুক থেকে। মাথার ওপর তুলে নিয়েছে বিকট গরিলা যুবতীকে, বিজয়গর্বে ঘুরল কয়েক পাক, তারপর শুইয়ে দিল ওর জ্ঞানহীন দেহটা মেঝের ওপর। মাথাটা একপাশে হেলে রয়েছে যুবতীর। নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল গরিলাটা যুবতীর জ্ঞানহীন নগ্ন শরীরের ওপর। দপ করে নিভে গেল সব কটা স্পট লাইট। কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধতা। শুধু দর্শকদের উত্তেজিত শ্বাস শোনা যাচ্ছে। পর মুহূর্তে বিকট হৈচৈ আর হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকবৃন্দ।

'এবার আমাদের কাজ কি?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'শহরে যে ক'টা নাইট-ক্লাব আছে, সবগুলোতে একবার করে ঢুঁ দিতে

হবে তোমাদের। খুঁজে দেখবে, চেনা কোন মুখ পাওয়া যায় কিনা। নর্তকী, ওয়েট্রেস বা দর্শকদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারো কিনা দেখো।'

'নাইট-ক্লাবে সন্ন্যাসিনী?' চোখ কপালে উঠল সোহানার।

'কেন নয়? ওদের মানুষ বলে গণ্য করো না বুঝি?' হাসল রানা। 'বিশেষ করে যাদের দেখবে লম্বা-হাতা জামা, কিংবা কনুই পর্যন্ত লম্বা গ্লাভস্—তাদেরকে লক্ষ্য করবে ভাল মত। গির্জার কাউকে যদি পেয়ে যাও, তাহলে সে কোথায় থাকে বের করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যা-ই করো না কেন, রাত একটার মধ্যে ফিরে যাবে নিজেদের হোটেলে। ওখানে দেখা করব আমি তোমাদের সঙ্গে।'

'ইতিমধ্যে কোথায় কি কাজ তোমার?'

'কাজের অভাব নেই। প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে আমার সামনে এখন। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি?'

'অর্থাৎ, বলবে না।'

হলুদ একটা স্পট লাইট জ্বলে উঠল শূন্য স্টেজের ওপর। নিগ্রো ড্রামবাদক একলাফে অন্ধকার থেকে এসে দাঁড়াল আলোয়, লম্বা করে কুর্নিশ করল দর্শকদের। কুর্নিশরত অবস্থাতেই হ্যাঁচকা টান দিল সে নিজের কোঁকড়া চুল ধরে। চুলসহ একটা পাতলা রবারের মুখোশ খসে এল ওর হাতে—বেরিয়ে পড়ল লালচুলো এক ধবধবে ফর্সা যুবকের মুখ। প্রচুর হাততালি পড়ল, সেই সঙ্গে সিটি। আরেকবার বো করে একপাশে সরে দাঁড়াল ড্রামবাদক। দৌড়ে এসে দাঁড়াল নর্তকী, বো করতে গিয়ে নিজের বুকের দিকে চোখ পড়তেই জিভ কাটল আধ হাত। চকচকে নক্ষত্র লাগাতে ভুলে গেছে। লজ্জিত হাসি হাসল মেয়েটা, তারপর একহাতে বুক ধরলো, আরেক হাতে চুল—জোরে টান দিতেই খসে এল দুটোই। দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে ষোলো-সতেরো বছরের এক ছোকরা। প্রথমে বিস্মিত গুঞ্জরন, পরমুহূর্তে প্রচুর হাততালি পড়ল। এবার তড়াক করে স্টেজে উঠে এল গরিলাটা। কুৎসিত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ ঘুরে বারকয়েক কুর্নিশ করে লোমশ দুই হাতে ধরল নিজের মাথাটা। কাঁধ থেকে নিয়ে ওপরের অংশটা খসে এল ওর হাতে। মাথাটা ঝাড়া দিতেই একরাশ সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়ল গরিলার লোমশ কালো পিঠে। মেয়ে একটা। হাসছে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে। তুমুল হর্ষধ্বনি।

বাঁকা হাসি খেলে গেল সোহানার ঠোঁটে। বলল, 'কী সূক্ষ্ম রসবোধ, তাই না?' উঠে দাঁড়াল। 'চলো, মারিয়া, অন্যান্য নাইট-ক্লাবগুলোও নিশ্চয়ই শিল্প চেতনা আর সৌন্দর্য বোধের ব্যাপারে এদের চেয়ে কম যাবে না। দেরি হলে মিস্ করব আবার।'

বেরিয়ে গেল ওরা। কেউ ওদের অনুসরণ করে কিনা দেখবার জন্যে আড়চোখে চেয়ে রইল রানা ওদের গমন পথের দিকে। মস্ত মোটা এক দয়ালু চেহারার লোক পিছু নিল ওদের। এতই মোটা যে থুতনির তিনভাঁজ চলে এসেছে একেবারে বুক পর্যন্ত, গলা বা ঘাড়ের কোন অস্তিত্বই নেই। মোটা লোকটার পিছু নেয়াটা অনুসরণ কিনা ঠিক বোঝা গেল না, কারণ, কয়েক

ডজন লোক আবার পিছু নিল মোটার। আজ রাতের আসল আকর্ষণ শেষ, দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে ঘরটা। দেখতে দেখতে অর্ধেক টেবিলই খালি হয়ে গেল। হালকা হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার আস্তরণ। ব্যস্তপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়েটাররা। একটা নির্জলা স্কচ হুইস্কির অর্ডার দিল রানা। যা নিয়ে আসা হলো, এক চুমুক খেয়েই বুঝতে পারল সে, কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করলে হয়তো এর মধ্যে সামান্য একটু হুইস্কির ছিটেফোঁটা আবিষ্কার করা যেতে পারে—না-ও যেতে পারে। নির্জলা হুইস্কি নয়, নির্হুইস্কি জল। পয়সা লুটবার কোন দিকই আর বাদ রাখেনি এরা। বুড়ো এক লোক নিবিষ্টচিত্তে ভেজা এক ন্যাকড়া দিয়ে মুছছে ডান্সফ্লোরটা।

ভিতর দিকের একটা খোলা দরজার সামনে দেখতে পেল রানা বিট্রিক্স শেরম্যানকে। একটা শাল জড়াচ্ছে কাঁধে, পাশেই আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ফিসফিস করে বলছে ওর কানে কানে। দু'জনের উত্তেজিত, ব্যস্তসমস্ত হাবভাব দেখে মনে হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে। বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল বিট্রিক্স, চারপাশে চাইল সতর্ক দৃষ্টিতে, তারপর লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। যেন তাড়া নেই রানার, ধীরে সুস্থে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে-ও বাইরে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দূরত্বটা বিশফুটের মধ্যে নিয়ে এল রানা। রেমব্র্যান্টপ্লেইনের দিকে এগোচ্ছে মেয়েটা, বেশ কিছুদূর গিয়ে থামল একটা ছোট্ট কাফের সামনে। কাফের বাইরে ফুটপাথের ওপর একটা ব্যারেল অর্গান বাজাচ্ছে এক বুড়ো। চট করে রানার মনে পড়ল, কার্লটন হোটেলের বাইরেও এই রকম এক বুড়োকে দেখেছে সে ব্যারেল অর্গান বাজাতে। তবে সে লোকের দাড়ি ছিল। তার অবশ্য শ্রোতার সংখ্যাও এর চেয়ে বেশি ছিল—এর সামনে অর্গানের গায়ে হেলান দিয়ে মগ্ন হয়ে বেসুরো বাজনা শুনছে একটি মাত্র ছোকরা। একটু কাছে এগিয়ে পরিচিত ঠেকল রানার ছোকরার চেহারা। মনে হলো, দাড়িওয়ালা বুড়োর সামনেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে এই ছোকরাটাকে। একেবারে শুকনো, গালবসা, রুগ্ন চেহারা—অর্গানের গায়ে হেলান না দিলে দাঁড়িয়ে থাকবার সাধ্য ছিল না ওর। হঠাৎ হঠাৎ শিউরে উঠছে ছোকরার সর্বশরীর। অর্গান শিল্পী যে ছোকরাকে তেমন পছন্দ করতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে ওর বিরক্ত দৃষ্টি দেখে। বিরক্তি, সেই সঙ্গে ভয়। মাঝে মাঝে চারপাশে চাইছে বুড়ো ভীত চকিত দৃষ্টিতে।

অর্গানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বিট্রিক্স। একটা টুপি তুলে ধরল বৃদ্ধ, তারমধ্যে একটা কয়েন ছেড়ে দিয়ে ছোকরার হাত ধরে টানল মেয়েটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল ছোকরা। বিস্ফারিত চোখে চাইল বিট্রিক্সের দিকে। গালদুটো এতই বসা যে মনে হয় একটা দাঁতও নেই ওর। ঢাকার ফুটপাথে মরে পড়ে থাকা দুর্ভিক্ষের লাশ মনে হচ্ছে ওকে দেখে। বিট্রিক্সের ওপর ভর দিয়ে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেলো।

কাছে চলে এল রানা। বিনা বাক্যব্যয়ে একহাতে জড়িয়ে ধরল ছোকরার পিঠ—মনে হলো যেন কঙ্কাল জড়িয়ে ধরেছে সে। কিন্তু এই সাহায্যে খুশি

হলো না বিট্রিক্স, ওর চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ আর ভীতি দেখতে পেল রানা।

'প্লীজ!' মিনতি ফুটে উঠল মেয়েটার গলায়। 'সাহায্য লাগবে না। আমিই পারব। দয়া করে ছেড়ে দিন ওকে।'

'তুমি পারবে না, মিস শেরম্যান। একসঙ্গে পড়বে দু'জন ড্রেনের মধ্যে।'

হতবুদ্ধি বিট্রিক্স যেন কিছুই বুঝতে পারল না কয়েক সেকেন্ড, তারপর অস্ফুট গলায় বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা!'

'এটা কিন্তু বড়ই অন্যায় কথা,' অনুযোগের কণ্ঠে বলল রানা। 'এত সুন্দর চেহারা আমার, সেই চেহারাটা চিনতে পারলে না তুমি দুঘণ্টা আগে, নামই মনে করতে পারলে না—আর যেই ছদ্মবেশ নিলাম, অমনি ডেকে উঠলে নাম ধরে।'

হঠাৎ হাল ছেড়ে দিল ছোকরা, পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানার হাত ফসকে, চট করে ধরে ফেলল রানা আবার। এভাবে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বেশিদূর যাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে নিচু হয়ে ওকে কাঁধে তুলে নেয়ার উপক্রম করল সে। খপ করে হাত ধরল মেয়েটা রানার। আতঙ্কিত চোখমুখ।

'না, না! ওভাবে তুলবেন না ওকে! প্লীজ!'

'কেন? এভাবেই তো সহজ হবে।'

'না, না! পুলিস দেখলে ধরে নিয়ে যাবে ওকে।'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, এক হাতে ওর পিঠ জড়িয়ে ধরে খাড়া রাখবার চেষ্টা করল যতটা সম্ভব, পা বাড়াল সামনে। বলল, 'ফাঁদে পড়ে গেছ শিকারীর। সামনে এখন শুধু অন্ধকার।'

রানার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল মেয়েটা ওর মুখের দিকে।

'হেনরীর জন্যে তোমাকে…'

'হেনরী! ওর নাম জানলেন কি করে আপনি?'

'গোপন খবর জানাই তো আমার কাজ,' বলল রানা হাসিমুখে। 'যা বলছিলাম। পুলিসের কাছে ও যদি অপরিচিত হত, তবু এক কথা ছিল। কিন্তু জেল খাটা দাগী ভাই যদি নেশার খপ্পরে পড়ে তাহলে সত্যিই খুবই অসুবিধের কথা। সমাজে মাথা উঁচু করে চলা মুশকিল হয়ে যায়।'

কোন উত্তর দিল না মেয়েটা। পরাজিত, পাংশু মুখে হাঁটছে সে মাথা নিচু করে। চেহারায় হতাশা আর বিভ্রান্তির স্পষ্ট ছাপ। রানার উপস্থিতি যে ওর উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ, রানাকে সহ্য করা যে ওর পক্ষে কতখানি কঠিন—বুঝতে পারল রানা পরিষ্কার। যদি কোন যাদুমন্ত্রের বলে মুহূর্তে নাই হয়ে যেত রানা, মস্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারত হয়তো সে। কিন্তু হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে।

'থাকে কোথায় ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার সঙ্গেই।' ব্যাপারটা রানার জানা নেই বলে যেন একটু বিস্মিত হয়েছে সে। 'কাছেই। বেশি দূরে না।'

ব্যালিনোভা ছাড়িয়ে একটা সরু গলি দিয়ে গজ পঞ্চাশেক গিয়েই পৌঁছে

গেল ওরা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে। হেনরীকে কাঁধে নিয়ে সরু সিঁড়ি দিয়ে বহু কষ্টে তেতলায় উঠল রানা বিট্রিক্সের পিছু পিছু। দরজা খুলে দিতেই ঢুকল ভিতরে। বাথরুমের সমান দুটো ঘর—একটা বসবার একটা শোবার। বসবার ঘর পেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল রানা, খাটের ওপর কঙ্কালটা শুইয়ে দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। চলে এল বসবার ঘরে।

'এই সিঁড়ি দিয়ে রোজ ওকে নিয়ে ওঠো কি করে? মই বেয়ে ওঠাও তো এর চেয়ে সহজ।'

'কি করব…গার্লস হোস্টেল এর চেয়ে অনেক ভাল, সস্তাও, কিন্তু হেনরীকে নিয়ে…নাইট-ক্লাব থেকে বেশি পয়সা দেয় না আমাকে।'

ঘরের চারপাশে চাইল রানা। আসবাবের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে খুবই কম দেয়। বলল, 'তোমার মত কলে পড়া ইঁদুরকে কিছু যে দেয়, এই তো বেশি।'

'তার মানে?'

'মানেটা ভাল করেই জানা আছে তোমার। ফাঁদে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করছ, অথচ মানে বুঝতে পারছ না, এটা হতেই পারে না, বিট্রিক্স।'

'এত কিছু কি করে জানলেন আপনি? আমার নাম, আমার ভাইয়ের পরিচয়…'

'কি করে জানলাম বলে মনে হয় তোমার?' ভুরু নাচাল রানা। 'ভুলে যাচ্ছ, আমাদের একজন কমোন বয়ফ্রেন্ড ছিল।'

'বয়ফ্রেন্ড? আমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই।'

'আছে বলিনি, বলেছি ছিল। অতীতের বয়ফ্রেন্ড বা মরহুম বয়ফ্রেন্ড—যা খুশি বলতে পারো।'

'আমেদ?' অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'ঠিক ধরেছ। ইসমাইল আহমেদ। তোমার পাল্লায় পড়ে ছেলেটা মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু মরার আগে কিছু তথ্যও দিয়ে গেছে আমাকে।' মিথ্যের আশ্রয় নিল রানা। 'এমন কি তোমার একটা ছবিও রয়েছে আমার কাছে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বিট্রিক্স। 'কিন্তু…তাহলে এয়ারপোর্টে—'

'এয়ারপোর্টে তোমাকে চিনতে পারিনি কেন? ঠিকই চিনেছিলাম। কিন্তু যদি সেটা প্রকাশ করতাম, হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে হাজতে বাস করতে হত তোমাকে এতক্ষণে। যাই হোক, কিছু একটা জেনে ফেলেছিল বলেই মরতে হয়েছে ইসমাইলকে। আমি জানতে চাই কি সেটা।'

'দুঃখিত। এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না আপনাকে।'

'পারবে না, নাকি করবে না?'

নিরুত্তর রইল বিট্রিক্স।

'তিনমাসে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তোমাদের মধ্যে—তাই না?'

চোখ নিচু রেখে মাথা ঝাঁকাল বিট্রিক্স।

'ইসমাইল কেন, কি কাজে এখানে এসেছিল বলেছে তোমাকে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।
'কিন্তু তুমি আঁচ করতে পেরেছিলে, তাই না?'
এবার মাথা ঝাঁকাল।
'এবং কি আঁচ করেছিলে সেটা জানিয়েছিলে কাউকে?'
ঝট করে চাইল বিট্রিক্স রানার মুখের দিকে। 'না। কাউকে কিছুই বলিনি আমি। সত্যি।'
'তোমাকে দিয়ে ওকে কিছু বলিয়েছিল কেউ, তাহলে?'
'জানি না। হতে পারে। জেনেশুনে কোন ক্ষতি করিনি আমি আমেদের।'
'আমার সম্পর্কে কোন কথা বলেছিল ইসমাইল তোমাকে?'
'না।'
'কিন্তু তোমার ভাল করেই জানা আছে আমি কে?'
চুপ করে রইল বিট্রিক্স। জল ভরে উঠল দুচোখে। চেয়ে রইল রানার দিকে, কিন্তু জবাব দিল না।
'তুমি ভাল করেই জানো যে ইন্টারপোল থেকে এসেছি আমি নারকোটিকসের ব্যাপারে।' চুপ করে রইল মেয়েটা। কাঁধ ধরে ঝাঁকাল ওকে রানা। 'উত্তর দাও। জানা নেই তোমার?'
নীরবে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।
'ইসমাইল যদি তোমাকে বলে না থাকে, কে বলেছে?'
আবার চুপ। দুচোখ থেকে পানি ঝরতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে উঠে মাথাটা একপাশে ফিরিয়ে নাড়ল মেয়েটা।
'প্লীজ। কিছুই বলতে পারব না আমি। আপনি এখন যান। আপনার পায়ে ধরি, একা থাকতে দিন আমাকে।'
অসহায় ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। বুঝল এদিক থেকে আর এগোনো যাবে না। কাজেই দিক পরিবর্তন করল সে। খোলা দরজা দিয়ে ঘুমন্ত হেনরীর কঙ্কালটার দিকে চেয়ে বলল, 'হেনরী সংসারের কোন খরচ দেয়? কিছু উপার্জন-টুপার্জন করে?'
'ও উপার্জন করবে কি করে? কাজ করবার ক্ষমতাই নেই ওর। এক বছর ধরে সম্পূর্ণ বেকার। কিন্তু এসবের মধ্যে আবার ওর কথা কেন? এসবের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?'
'ওর সঙ্গেই জড়ানো আছে সবকিছু।' বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। স্থিরদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল ওর মুখটা। একটা চোখের পাতা তুলে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর ওটা নামিয়ে দিয়ে ফিরল বিট্রিক্সের দিকে। 'এই রকম জ্ঞান হারালে কি করো?'
'কি আর করব? কিছুই করার নেই।'
মাথা ঝাঁকাল রানা। আস্তিন গুটিয়ে দেখল ক্ষতবিক্ষত কঙ্কালসার হাতটা। কত হাজার বার ছিদ্র করা হয়েছে হাতটা তার ইয়ত্তা নেই। ইরিনের হাতটা এর তুলনায় কিছুই না। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক বলেছ। সীমার বাইরে চলে গেছে একেবারে। কারও কিচ্ছু করবার নেই এখন। ওর সেরে

ওঠার সব পথ বন্ধ—ব্যাপারটা জানা আছে তোমার?'

'জানি।' একটা রুমাল বের করে চোখ মুছল বিট্রিক্স। 'জানি, মারা যাচ্ছে ও কিছুদিনের মধ্যেই।'

'যারা হত্যা করছে ওকে, তাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তোলারও সাহস নেই তোমার। ঠিক আছে, এজন্যে দোষ দিচ্ছি না আমি তোমাকে। কয়েকটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি? কতদিন নাগাদ এই অবস্থা চলছে হেনরীর?'

'তিন বছর।'

'কতদিন যাবৎ কাজ করছ তুমি ব্যালিনোভায়?'

'তিন বছর।'

'কাজটা ভাল লাগে তোমার?'

'ভাল!' লক্ষ্মীপেঁচার মত মুখ করে হাসল বিট্রিক্স। 'ওই রকম একটা জঘন্য নাইট-ক্লাবে কাজ করা যে কি, কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি। বাপের বয়সী সব বুড়োরা লোভাতুর...'

'ইসমাইল আহমেদ তো বাপের বয়সী ছিল না?'

'না। ওর কথা বলছি না...'

'দেখো, বিট্রিক্স। মারা গেছে ইসমাইল। কেন মারা গেছে জানো? মারা গেছে নাইট-ক্লাবের এক হোস্টেসকে বিশ্বাস করতে গিয়েছিল বলে, সে নিজেই ব্ল্যাকমেইলের শিকার।'

'আমাকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে না।'

'তাই নাকি? তাহলে কারা চাপ সৃষ্টি করছে তোমার ওপর? কাদের ভয়ে চুপ করে থাকছ—উত্তর দিচ্ছ না আমার প্রশ্নের? কাদের ভয়ে যে কাজ এত অপছন্দ তোমার সেই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছ? কিসের জোরে চাপ সৃষ্টি করতে পারছে ওরা? হেনরী নয়? কি করেছে ও, যেজন্যে বাঁধা পড়ে গেছ তুমি? কারা বাধ্য করছে তোমাকে আমার ওপর নজর রাখতে?' একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারল না বিট্রিক্স। কাজেই আবার ইসমাইলের প্রসঙ্গে ফিরে গেল ও। 'ইসমাইল আহমেদের মৃত্যুর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? কিভাবে ও মারা গেছে আমি জানি, দেখেছি নিজের চোখেই। কিন্তু কারা মারল ওকে? কেন?'

'আমি জানতাম না ওকে মেরে ফেলবে!' ফুঁপিয়ে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকল বিট্রিক্স। 'সত্যিই জানতাম না মেরে ফেলা হবে ওকে।'

'অন্যান্য সবকিছুই জানতে, শুধু জানতে না যার পালিয়ে যাবার সুবিধের জন্যে দরজার সামনে পথ আটকাতে হবে আমার, সেই লোকের ওপর ইসমাইলকে হত্যার নির্দেশ ছিল। হয়তো সত্যিই তাই। তোমাকে কোন দোষ দিতে চাই না আমি, বিট্রিক্স। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্যে অনেককে দেখেছি আমি দুনিয়ার অনেক ক্ষতি করতে। তবে তোমার ভালর জন্যেই একটা কথা বলব: ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার জীবন পড়ে রয়েছে সামনে। মস্তবড় বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি। হেনরীর কথা ভেবে কোন লাভ নেই এখন, জীবন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর—তোমার নিজের কথাই

অনেক বেশি করে ভাবা দরকার তোমার এখন।'

'কিছুই করবার নেই আমার, কিছুই বলবার নেই।' দুহাতে মুখ ঢেকে রেখে মাথা নাড়ল সে। 'দয়া করে আপনি যান।'

রানা বুঝল, এর পরে ওরও আর কিছুই করবার বা বলবার নেই—কিছুতেই জবান খুলবে না আতঙ্কিত মেয়েটা—কাজেই দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঠিক একটা পাঁচে সোহানা আর মারিয়ার হোটেল কক্ষের অ্যাটাচড বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা মাসুদ রানা। হাতের তোয়ালেটায় বিশ্রী রকম ছোপ ছোপ দাগ লেগে গেছে মেকাপ তুলতে গিয়ে। বাথরূমের আয়নায় মোটামুটি নিজের চেহারাটা পরিচিত ঠেকতেই বেরিয়ে এসেছে সে, ঘাড়ে, গলায় এখনও কিছু রঙ লেগে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো ঢেকেঢুকে কোনমতে কার্লটনের ছশো বাইশ নম্বর কামরায় ঢুকতে পারলেই চলবে আপাতত।

খাটের ওপর সোজা হয়ে বসে আছে সোহানা ও মারিয়া, দুজনেই এমন নাইট-ড্রেস পরেছে যে সেগুলোকে মশারী না বলে ড্রেস কেন বলে, কিংবা প্রস্তুতকারক কি পরিমাণ কাপড় বাঁচিয়েছে এগুলো থেকে, ইত্যাদি নিয়ে একটা থিসিস লিখে ফেলা যায়। কিন্তু আপাতত হাতে সময় নেই বলে কলারের কাছে লালচে হয়ে যাওয়া শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বোতাম লাগাতে শুরু করল সে দ্রুত হাতে।

'তাহলে বেশির ভাগ নাইট-ক্লাবের মেয়েই ওই হোস্টেল প্যারিসে থাকে?'

'তাই তো মনে হলো। যে চারটে দলকে অনুসরণ করলাম, প্রত্যেকটাই ঢুকল গিয়ে হোস্টেল প্যারিসে। আরও কয়েকটা মেয়েকে ঢুকতে দেখেছি আমরা ওই হোস্টেলে—মনে হলো ওরাও ফিরছে নাইট-ক্লাব থেকেই।'

'একটা মুখও চিনতে পারলে না?'

'চেনা চেনা লেগেছে এক আধটা মুখ, কিন্তু শিওর হতে পারিনি। তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

হেনরী এবং বিট্রিক্সের কথা বলল রানা।

'এত সময় লেগে গেল ওদের ওখানে?'

'না। আরও দু'একটা জায়গায় গিয়েছি। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।' বিট্রিক্স শেরম্যানের ওখান থেকে বেরিয়ে আবার যে সে গিয়েছিল ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে সেকথা চেপে গেল রানা। গলার স্বর পাল্টে নিয়ে বলল, 'এবার তোমাদের কিছু কাজ দেয়া যাক। অযথা নাইট-ক্লাবে ঘোরাঘুরি রেখে এবার সত্যিকার কিছু কাজ দেখাও দেখি?' বিনা দ্বিধায় রানাকে এই ধরনের একটা কথা বলতে দেখে রেগে উঠতে যাচ্ছিল মারিয়া, চট করে সোহানার মুখের দিকে চাইল, তারপর হাসল। রানা বলেই চলল, 'মারিয়া কাল সকালে যাবে ভন্ডেল পার্কে। রোজ সকালে যায় ওখানে ইরিন। ওর ওপর লক্ষ রাখতে

হবে। কিন্তু সাবধান…ও চেনে তোমাকে। পার্কে গিয়ে ও কি করে, কারও সঙ্গে দেখা করে কিনা, কথা বলে কিনা, ইত্যাদির রিপোর্ট চাই আমি কাল। পার্কটা বিরাট, কিন্তু ওকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না; পুতুলের পোশাক পরা এক বুড়ি থাকবে ওর সঙ্গে, সে বুড়ির পেটের বেড় হবে কমপক্ষে নয় ফিট। আর সোহানা, কাল ওই হোস্টেলের ওপর নজর রাখবে তুমি। যদি চার্চের কোন সন্ন্যাসিনীকে পাও ওদের মধ্যে, পিছু নেবে; কোথায় যায়, কি করে তার পূর্ণ বিবরণ চাই আমার।' ভেজা, স্যাঁৎসেঁতে কোটটা গায়ে চড়াল রানা। 'চলি, গুডনাইট।'

ত্রিশ গজ দূরে পার্ক করে রাখা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল রানা। ভাবল, আজ অন্ধকারে অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়েছে সে। এর মধ্যে একটাও কি লাগবে না ওদের ভীমরুল চাকে? কখন টের পাওয়া যাবে প্রতিক্রিয়া?

দশ

হোটেলে ফিরে দেখল রানা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ফুটপাথের ব্যারেল অর্গান বাদক এবং তার ভক্তবৃন্দ কেউ নেই। পোর্টার নেই, ডোরম্যান নেই। একটু অবাক হলো রানা—গেল কোথায় সব? হাত বাড়িয়ে আলগোছে হুক থেকে চাবিটা খসিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সে দোতলায়, তারপর বোতাম টিপল লিফটের জন্যে।

ভেজা কাপড় সব খুলে ফেলে গরম পানিতে ভিজল রানা দশ মিনিট। তারপর শুকনো কাপড় পরে নিয়ে একটা সিগারেট ধ্বংস করল ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে। নিচের রাস্তায় লোক চলাচল অনেক কমে গেছে। কর্তব্য স্থির করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে ঘরে তালা মেরে।

খটাং করে চাবিটা রাখল রানা ডেস্কের ওপর। চমকে সোজা হয়ে বসে চোখ মিটমিট করল ঝিমন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। রানাকে দেখে চট করে চোখ গেল ওর দেয়াল ঘড়ির দিকে, তারপর ডেস্কের ওপর চাবির দিকে।

'মিস্টার মাসুদ রানা। কখন, কখন ফিরলেন, দেখিনি তো?'

'অনেক আগে,' বলল রানা। 'দু'তিনঘণ্টা তো হবেই। বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন আপনি তখন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু…'

ওর দৃষ্টিটা চট করে ঘুরে এল আর একবার ঘড়ির ওপর থেকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এখন কি আবার বেরোচ্ছেন কোথাও? রাত আড়াইটা!'

'তাতে কি হয়েছে? চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল।' হাসল রানা। 'ডোরম্যান নেই, পোর্টার নেই, ট্যাক্সিম্যান নেই, অর্গান-ভিখারী নেই, অনুসরণ করবার কেউ নেই—ব্যাপার কি? এজন্যে রীতিমত জবাবদিহি করতে হতে পারে আপনার।'

'প্লীজ…কি বলছেন ঠিক…'

'বুঝতে পারছেন না। আমি নিজেও কি ছাই বুঝে বলছি? যাই হোক,

হেয়ার কাটিং সেলুনটা কোনদিকে?'

'হেয়ার কাটিং সেলুন! এত রাতে আপনি চুল ছাঁটতে...'

'বুঝেছি।' আবার হাসল রানা। 'জানা নেই আপনার। ঠিক আছে, আমি নিজেই খুঁজে নেব।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। বিশ গজ গিয়ে একটা ডোরওয়েব আড়ালে দাঁড়াল, উঁকি দিল কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখবার জন্যে। তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হলো সে ওর প্রতি কারও তেমন কোন আগ্রহ নেই দেখে। নজর রাখবার প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ ওর গতিবিধির ওপর। কেউ অনুসরণ করছে না। আরও ত্রিশ গজ গিয়ে পুলিস-কারে উঠে পড়ল রানা। ফার্স্ট রিফর্মড চার্চ অফ দা অ্যামেরিকান হিউগানট সোসাইটির দুই গলি আগে রাস্তার ধারে পার্ক করে নেমে পড়ল সে ট্যাক্সি থেকে, ক্যানেলের ধার ঘেঁষে সতর্ক পায়ে এগোল গির্জার দিকে।

ক্যানেলের জলে কোন আলোর প্রতিবিম্ব দেখতে পেল না রানা। খালের দুধারে একটা বাড়িতেও আলো জ্বলছে না। গির্জাটাকে আরও শান্ত, আরও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। বিশাল ক্রেনের প্রকাণ্ড বুমটা মনে হচ্ছে আকাশ ফুঁড়ে চলে গেছে ওপরে, ভয় ভয় একটা ভাব বিরাজ করছে ওটার চারপাশে। আশেপাশে প্রাণের কোন সাড়া নেই। মনে হচ্ছে গভীর রাতের গোরস্থান।

কাছাকাছি এসে চট করে রাস্তা পেরোল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দাঁড়াল একটা মোটা থামের আড়ালে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলাল চারপাশে। কারও সাড়া বা শব্দ পাওয়া গেল না। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ডানহাতে হ্যানডেল চাপ দিয়ে বাম হাতে চাবির গোছাটা বের করতে যাচ্ছিল, প্রায় চমকে উঠল সে দরজাটা খোলা দেখে। গির্জার দরজায় তালা না থাকা তেমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু রানা হয়তো মনে মনে স্থির নিশ্চিত ছিল যে দরজাটা তালা মারা থাকবে, তাই এতটা অবাক হয়েছে। নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল সে দরজাটা। টর্চটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে, দ্রুত একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে আনল সে আলোটা। নিঃসন্দেহ হলো, ও একা।

এবার আরেকটু যত্নের সাথে গির্জার অভ্যন্তরটা পরীক্ষার কাজে মন দিল রানা। বাইরে থেকে যতটা মনে হয় তার চেয়েও ছোট আসলে গির্জাটা। খুবই প্রাচীন। টর্চটা উঁচু দিকে ধরল সে। কোন ব্যালকনি নেই, গোটা কয়েক ধূলিমলিন বন্ধ কাঁচের জানালা রয়েছে—কড়া রোদ উঠলেও কাঁচের মালিন্য ভেদ করে ভিতরে আলো ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ। বেরোবার একমাত্র রাস্তা দেখা যাচ্ছে ওই প্রবেশদ্বারই। দ্বিতীয় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে ভিতরের ঘরে ঢুকবার, পুলপিট আর প্রাচীন এক অর্গানের মাঝামাঝি জায়গায়। বন্ধ।

এই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, নবের ওপর হাত রেখে নিভিয়ে দিল টর্চটা। জং ধরা কজায় সামান্য আওয়াজ হলো দরজাটা খুলতে। অতি সাবধানে পা বাড়াল সে সামনে। ভাগ্যিস সাবধানে বাড়িয়েছিল, নইলে হোঁচট খেয়ে সামনে হুড়মুড় করে পড়তে হত। পাশের ঘরটা আসলে ঘর না—সিঁড়ি ঘর। দরজার পরেই একফুট নিচে প্রথম ধাপ। সাবধানে নামতে শুরু করল

রানা ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ বেয়ে, মনে মনে আঠারো গুনতেই পৌঁছে গেল নিচে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধের মত দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগোল রানা। আশা করছে এক্ষুণি একটা দরজা পাওয়া যাবে, কিন্তু কয়েক কদম গিয়েও যখন দরজা পাওয়া গেল না, থেমে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালল। এবার তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘোরাল সে টর্চ। কেউ নেই। জানালা বিহীন একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে—একা।

গোটা গির্জার আয়তনের প্রায় অর্ধেক হবে ঘরটা। সিলিং থেকে একটা উলঙ্গ বালব ঝুলছে তারের মাথায়। দেয়ালের গায়ে সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিল রানা। শতশত বছরের ধুলো জমে আছে কাঠের মেঝের ওপর। ঘরের মাঝখানে গোটা কয়েক চেয়ার-টেবিল পড়ে রয়েছে এলোমেলো ভাবে, দু'পাশের দুই দেয়ালের গায়ে সারি বাঁধা চারটে চারটে আটটা কেবিন। মনে হচ্ছে, মধ্যযুগীয় কোন কাফে।

পরিচিত একটা গন্ধে নিজের অজান্তেই নাকটা একটু কুঁচকে উঠল রানার। গন্ধটা ডানদিকের কোন কেবিন থেকে আসছে বলে মনে হলো ওর। ছোট্ট টর্চটা বুক পকেটে গুঁজে পিস্তল বের করল রানা। সাইড পকেট থেকে সাইলেন্সারটা বের করে লাগাল পিস্তলের মুখে। তারপর ওটা বাগিয়ে ধরে প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে এগোল সামনে।

প্রথম কেবিনটা খালি। দ্বিতীয়টার সামনে গিয়েই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রানা। অতি সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল, না, এটাও খালি। তৃতীয় কেবিনের দরজার কাছে এসে গন্ধটা প্রবল হলো। সাইলেন্সারের মুখ আর রানার বামচোখ একই সাথে উঁকি দিল তৃতীয় কেবিনের ভিতর।

এত সাবধান না হলেও চলত। ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর দুটো জিনিস চোখে পড়ল রানার: একটা অ্যাশট্রের মধ্যে আধ ইঞ্চি লম্বা একটা সিগারেটের টুকরো, আর তার পাশে হাতের ওপর রেখে ঘুমিয়ে থাকা একটা মাথা। মুখটা ওপাশে ফেরানো রয়েছে, কিন্তু এক সেকেন্ডও লাগল না রানার ওকে চিনতে। হেনরী। ওকে যে অবস্থায় খাটে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল, তাতে রানার ধারণা হয়েছিল চব্বিশ ঘন্টার জন্যে পড়ে থাকবে ছোকরা আউট হয়ে। এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পেয়ে কি করে এতদূর এসে হাজির হলো ভেবে একটু অবাকই হলো সে। অবশ্য, জানা আছে রানার, নেশার চরম পর্যায়ে যারা চলে যায় তারা অনেক সময় অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত জ্ঞান ফিরে পায়, পেয়েই পাগল হয়ে যায় আবার নেশা করবার জন্যে। আপাতত একে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। পা বাড়াল সে সামনে।

কেবিনগুলো সব একবার করে দেখে নিয়ে সামনের দেয়ালের গায়ে একটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কান পেতে শুনল ভিতর থেকে কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে, বাতির সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিল।

এ ঘরে আসবাবের কোন বালাই নেই, শুধু চার দেয়ালের গায়ে চারটে উঁচু র‍্যাক রাখা, র‍্যাকগুলোর প্রত্যেকটা তাকে ঠাসা রয়েছে বাইবেলের পর

বাইবেল। ফার্স্ট রিফর্মড চার্চের বাইবেল। জায়গার অভাবে এক্কেক তাকে তিন সারি করে সাজানো। ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে এই স্টকেরই একটা অংশ দেখে এসেছে সে। এই কিছুক্ষণ আগেই। কাজেই এগুলোর মধ্যে নতুন কিছু পাওয়া যাবে না বুঝতে পারল সে, তবু এগিয়ে গিয়ে ঘাঁটতে শুরু করল সে বাইবেলগুলো। অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে, কাজেই প্রথম বা দ্বিতীয় সারি পরীক্ষা করল না সে, দুই সারি থেকে দুটো বই সরিয়ে তৃতীয় সারি থেকে টেনে বের করে আনল একটা বাইবেল। যা আশা করেছিল, তাই। দেখতে অন্যসব বাইবেলের থেকে তফাৎ নেই কোন, কিন্তু আসলে এটা বই-ই নয়, বইয়ের মত দেখতে বাক্স একটা, ভিতরটা ফাঁপা।

বাংলাদেশে বেশ কিছু উকিল আছে, যারা মক্কেলের কাছে নিজেদের পাণ্ডিত্যের বহর দেখাবার জন্যে চেম্বারের কয়েকটা আলমারি ভর্তি করে রেখেছে এই ধরনের চামড়া বাঁধাই করা ফাঁপা বই দিয়ে—কিন্তু ফার্স্ট রিফর্মড চার্চ মুগ্ধ করতে চায় কাকে?

বাইবেলের মলাট, অর্থাৎ ঢাকনিটা খুলে ভিতরে একবার নজর বুলিয়েই বন্ধ করে দিয়ে এদিক ওদিক চাইল রানা। এঘরে দেখবার আর কিছুই নেই। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে, ঠিক তার উল্টোদিকের দেয়ালে ওই রকম আর একটা দরজা। আবার কান পাতল রানা, খুলল, ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল।

ছোট্ট একটা শিস বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। অত্যন্ত আধুনিক ঝকঝকে সব যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে এ ঘরে। ছোটখাট একটা ফ্যাক্টরি। কি জিনিস তৈরি হয় তার কোন নমুনা নেই ঘরের কোথাও, কিন্তু মেশিনগুলো যে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। মার্সেই শহরের 'লাভ লজে' ঠিক এই রকম আর একটা ফ্যাক্টরি দেখেছিল সে, মনে পড়ল রানার।

ঘরের মাঝামাঝি গিয়েই ওর মনে হলো যেন আবছা একটা শব্দ কানে এল। যে দরজা দিয়ে ও এইমাত্র ঘরে ঢুকেছে, সেই দরজার কাছে। ঘাড়ের পিছনে সেই সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতিটা বোধ করল রানা। মনে হলো, পিছন থেকে কেউ চেয়ে রয়েছে ওর পিঠের দিকে, মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে।

কিছুই টের না পাওয়ার ভান করল রানা, যেমন হাঁটছিল তেমনি আপন মনে হাঁটতে থাকল সামনের দিকে। কিন্তু স্বাভাবিক থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ল ওর পক্ষে। মনের ভিতর যখন পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিপদের স্বরূপ চাক্ষুষ করবার, কিংবা সাঁৎ করে সরে কোন কিছুর আড়ালে লুকোবার অদম্য ইচ্ছে, যখন রানা পরিষ্কার জানে যে কোন মুহূর্তে একটা থারটি এইট ক্যালিবার অথবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বুলেট এসে ঢুকতে পারে মাথার পিছনে—আগামী পদক্ষেপেই ঘটতে পারে ঘটনাটা, তখন সহজ ভঙ্গিতে সোজা হয়ে হাঁটাও সহজ নয়। বিশেষ করে অস্ত্র বলতে যদি বাম হাতে ধরা থাকে একটা ফাঁপা ধর্মগ্রন্থের খোলস তাহলে হৃৎকম্প শুরু হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড বেগে লাফাতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভিতর। কোন শাসন মানছে না।

নিজের বোকামিতে ভয়ানক রাগ হলো রানার নিজের ওপর। আর কেউ

এই ভুল করলে বিনা দ্বিধায় বলত সে: উচিত সাজা হয়েছে ব্যাটা গর্দভের। কি করে নিজে করল সে এই ভুলটা? গির্জার দরজাটা খোলা দেখে? বাইরের দরজা খোলা, বেজমেন্টে নামবার দরজা খোলা, কোথাও কোন তালা নেই, কোথাও কোন বাধা নেই—যার খুশি আসো, ঢোকো, দেখো।—এই অবস্থা দেখে প্রথমেই তো বোঝা উচিত ছিল ওর, একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে এর। সেটা হচ্ছে: নিশ্চয়ই সশস্ত্র পাহারাদারের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে, যার ওপর হুকুম রয়েছে, ঢুকতে বাধা দেবে না কাউকে, বাধা দেবে বেরোতে গেলে—প্রাণ নিয়ে যেন কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে এখান থেকে। নিশ্চয়ই পুলপিট কিংবা আর কোন গোপন জায়গায় চুপচাপ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। হয়তো আরও কোন দরজা রয়েছে যেটা লক্ষ্যই করেনি সে।

আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের শেষ মাথায় পৌঁছল রানা, বামপাশে লেদ মেশিনের মত দেখতে একটা যন্ত্রের ওপাশে কিছু দেখে যেন অবাক হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কিছু বলল, তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকল যন্ত্রের আড়ালে—যেন মেঝেতে রাখা কিছু জিনিস পরীক্ষা করে দেখছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ দেয়ায় যার-পর-নাই কৃতজ্ঞ বোধ করল সে লোকটার প্রতি। ঠিক দুই সেকেন্ড পর যখন মাথাটা তুলল রানা, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

বারো ফুট দূরে দেখতে পেল রানা লোকটাকে। পায়ে রাবার সোলের মোকাসিন, মুখটা ছুঁচোর মত লম্বাটে, উত্তেজনায় ফ্যাকাসে, চোখদুটো জ্বলছে। ওর হাতে রানার দিকে মুখ করে ধরা রয়েছে পয়েন্ট থ্রী এইট পিস্তলের চেয়েও কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর এক পিলে চমকানো হুইপেট। ডিবিবিএল টুয়েলভ বোর শটগানের ব্যারেল কেটে ফেলে দিয়ে তৈরি হয়েছে এই হুইপেট—শর্টরেঞ্জের খুনোখুনিতে এর বাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

হাতে গুলি করবে, না বুকে, নাকি মাথায় চিন্তা করবার সময় পেল না রানা। যখন এক সেকেন্ডের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যায় দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে বাঁচবে আর কে মরবে, সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই যে কোন দিকে চলে যেতে পারে জয় বা পরাজয়, সেই মুহূর্তটা মাথা খাটাবার মুহূর্ত নয়—প্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করে তখন মানুষ। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রিগারে চাপ দিল রানা।

ছুঁচো মুখো লোকটার একটা চোখ অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা ঢুকল দুই চোখের ঠিক মাঝখান দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল ওর মুখটা ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসায়। মরা অবস্থাতেই এক পা পিছিয়ে গেল, তারপর যেমন নিঃশব্দে এগোচ্ছিল তেমনি কোন শব্দ না করে হুইপেটটা আঁকড়ে ধরে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরের দিকে চাইল রানা। এর সঙ্গে আরও লোক আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আক্রমণ না করা পর্যন্ত বোঝা যাবেও না। কাজেই দেরি করবার কোন অর্থ হয় না। লক্ষ করল, কাঁপছে ওর সর্বশরীর।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, দ্রুতপায়ে চলে এল বাইবেলের ঘরে—কেউ

নেই। তার পাশের ঘরে তেমনি ঘুমিয়ে রয়েছে হেনরী, অন্যান্য কেবিন খালি—কেউ নেই। এক হ্যাঁচকা টানে কাঁধে তুলে নিল সে হেনরীকে। উঠতে শুরু করল ওপরে। পুলপিটের পেছনে ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা নামিয়ে দিয়ে আর একবার সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করল রানা গির্জাটা, তারপর বাইরে বেরোবার দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে পুরো একমিনিট চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কাউকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

তিন মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিটা নিয়ে এল সে গির্জার দোরগোড়ায়। ভিতরে ঢুকে তুলে নিয়ে এল হেনরীকে, পিছনের সীটে বসিয়ে দিতেই ঢলে পড়ল ও গাড়ির মেঝেতে। চট করে চারটাপাশ দেখে নিয়ে আবার রানা ঢুকল গিয়ে গির্জার ভিতর।

মৃত লোকটার পকেট থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। বাইবেলটা যথাস্থানে রেখে বামহাতে হুইপেটটা নিয়ে ডানহাতে কোটের কলার চেপে ধরল লাশটার, তারপর হেঁচড়ে টেনে নিয়ে এগোল দরজার দিকে। একটা একটা করে বাতি নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেনে নিয়ে এল সে লাশটা ওপরে, বাইরে বেরোবার দরজার মুখে। বাইরেটা আবার একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যতটা সম্ভব ট্যাক্সির আড়ালে আড়ালে একেবারে খালের ধারে টেনে নিয়ে এল রানা লাশটা, তারপর আস্তে করে নামিয়ে দিল পানিতে, ঠিক যেমন করে নামাত ওই লোকটা রানার লাশ যদি আর একটা সেকেন্ড সময় পেত। হুইপেটটাও নামিয়ে দিল রানা খালের জলে, তারপর দ্রুতপায়ে চলে এল গাড়ির কাছে। গাড়ির দরজা খুলতে যাবে, এমনি সময়ে গির্জার ঠিক পাশের একটা বাড়িতে বাতি জ্বলে উঠল বাইরের দিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল সদর দরজা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একজন লোক, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে চাইল এদিক ওদিক, তারপর এগিয়ে এল ট্যাক্সির দিকে।

লম্বা-চওড়া এক লোক, চকমকে নাইট গাউন গায়ে জড়ানো, একমাথা এলোমেলো পাকা চুল, নাকের নিচে চওড়া একজোড়া পাকা গোঁফ, মুখের ভাবে প্রসন্ন বদান্যতার ছাপ।

'কোন সাহায্য দরকার?' ঝনঝনে ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'কোন অসুবিধেয় পড়েছেন?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'না, না। অসুবিধে কিসের? কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার।'

'গির্জার ভিতর থেকে কিসের যেন আওয়াজ শুনলাম মনে হলো?'

'গির্জার ভিতর থেকে?'

'হ্যাঁ। আমার গির্জা। ওই যে।' আঙুল তুলে গির্জার দিকে দেখাল লোকটা। 'আমিই প্যাসটর। রজার। ডক্টর নিকোলাস রজার। আমি ভাবলাম কোন গুণ্ডা বা ডাকাত ঢুকে পড়ল নাকি ভেতরে।'

'আমি না, রেভারেন্ড,' বলল রানা। 'গত দশ বছর কোন চার্চের ভেতর ঢুকিনি আমি।'

সমঝদারের মত পাকা মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ঈশ্বরবিহীন এক দুনিয়ায় বাস করি আমরা। যেন তাকে ছাড়াই চলে! যাই হোক, এত রাতে আপনি কি করছেন এখানে, ইয়ংম্যান? রাত একটু বেশি হয়ে গেছে না?'

'নাইট শিফটের ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্যে খুব একটা রাত কোথায়?'

এই পাল্টা প্রশ্ন তেমন একটা সন্তুষ্ট করতে পারল না বৃদ্ধকে। কয়েক পা সামনে এগিয়ে উঁকি দিল গাড়ির ভিতর। হেনরীকে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। 'মাই গড! গাড়ির ভেতর ডেডবডি!'

হেসে উঠল রানা। দাঁড়াল প্যাসটরের মুখোমুখি। 'ওটা ডেডবডি নয়, রেভারেন্ড। মাতাল এক নাবিক, জাহাজে পৌঁছে দেয়ার জন্যে নিয়ে চলেছি। লোকটা সীট থেকে পড়ে যাওয়াতেই এইমাত্র গাড়ি থামিয়ে সীটে তুলে বসাতে যাচ্ছিলাম আমি।' আবার হাসল রানা। 'মরা হলে ওকে তুলে বসাবার প্রয়োজন হত না।'

এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারল না বৃদ্ধ, দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, 'আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব।'

রানাকে ঠেলে এগোবার চেষ্টা করল বৃদ্ধ, কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই ঠেলে রেখে দিল ওকে রানা। কাতর মিনতির মত শোনাল ওর গলাটা। 'আপনি চাপাচাপি করলে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খোয়া যাবে, রেভারেন্ড। প্লীজ!'

'আমি জানতাম! আমি জানতাম! মস্ত কিছু গোলমাল রয়েছে কোথাও। আন্দাজ করতে পেরেছিলাম আমি। স্বীকার করছেন যে, আমি চাপাচাপি করলে আপনার লাইসেন্স খোয়া যাবে?'

'হ্যাঁ। চাপাচাপি করলে আপনাকে খালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে হবে আমার, ফলে ক্যানসেল হয়ে যাবে লাইসেন্সটা। অবশ্য,' মুচকি হাসল রানা, 'যদি সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারেন, তবেই।'

'কি বললেন? খালে ফেললেন? আমাকে? একজন প্যাসটরকে! আপনি দৈহিক হামলার হুমকি দিচ্ছেন আমাকে, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল ডক্টর রজার। সেখান থেকে বলল, 'আপনার লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার আমার মনে থাকবে, স্যার। কাল সকালেই আমি...'

রাত বেড়ে চলেছে। আর কথা না বাড়িয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রবল বেগে হাত নাড়াচ্ছে লোকটা মুঠি পাকিয়ে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কোন লক্ষণ নেই ওর ভাবভঙ্গিতে।

হেনরীকে কাঁধে নিয়ে আবার তেতলায় উঠে এল রানা সরু সিঁড়ি বেয়ে। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় তালা নেই। লাইট জেলে দেখা গেল বেঘোরে ঘুমোচ্ছে বিট্রিক্স সোফার ওপর। হেনরীকে নিয়ে পাশের ঘরে যাওয়ার সময় ছায়া পড়ল ওর চোখে, চট করে চোখ মেলে চাইল, তারপর উঠে বসল

বিট্রিক্স। পাশের ঘরের বিছানায় কঙ্কালসার দেহটা নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল রানা বসবার ঘরে। কোন কথা না বলে চেয়ে রইল চোখ ডলতে থাকা বিট্রিক্সের দিকে।

'কখন বেরিয়ে গেছে টের পাইনি,' বলল মেয়েটা অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে। রানা যখন কোন কথা বলল না, তখন আবার বলল, 'সত্যিই টের পাইনি আমি। কোথায় পেলেন ওকে?'

'তুমি কল্পনা করতে পারবে না কোথায় পেয়েছি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল একটা ব্যারেল অর্গানের ওপর।'

'কিন্তু এত রাতে তো...'

'ব্যারেল অর্গানের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুড়ো ছিল না। তালা ভাঙার চেষ্টা করছিল ও।'

মাথা নিচু করে বসে রইল বিট্রিক্স। আবার কান্নার সেশন শুরু না হয়, সেই ভয়ে চট করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এর মধ্যে মাথা নিচু করবার কি আছে? আমি ভাবছি, ব্যারেল অর্গানের প্রতি ওর এত ইন্টারেস্ট কেন। অদ্ভুত ব্যাপার। গানবাজনা খুব পছন্দ করে বুঝি?'

'না। হ্যাঁ। সেই ছোটবেলা থেকেই গানবাজনা...'

'হয়েছে! আর গুলপট্টি মারতে হবে না।' কঠোর কণ্ঠে বলল রানা। 'গানবাজনার ভক্ত হলে ওই বেসুরো ব্যারেল অর্গানের বাজনা না শুনে বরং সেলাই মেশিনের আওয়াজই ওর বেশি পছন্দ করবার কথা। খুবই সহজ একটা কারণ রয়েছে ওর ব্যারেল অর্গানের কাছে যাওয়ার। খুবই সহজ। কারণটা তুমিও জানো, আমিও জানি।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল বিট্রিক্স রানার চোখের দিকে। ভীতি দেখতে পেল রানা ওর চোখে। বসে পড়ল সে সোফায়।

'বিট্রিক্স?'

'বলুন?'

'মিথ্যাভাষণে আমার চেয়ে কোন অংশে কম যাও না তুমি। হেনরীকে খুঁজতে যাওনি তুমি, তার কারণ তোমার ভাল করেই জানা ছিল কোথায় গেছে ও, ভাল করেই জানা আছে কোথা থেকে ধরে এনেছি আমি ওকে। এমন এক জায়গা, যেখানে অত্যন্ত নিরাপদেই থাকবে ও, এমন এক জায়গা, যেখানে ধরা পড়বে না ও পুলিসের হাতে; এমনই সম্মানিত জায়গা, যে কেউ কোনদিন ভাবতেই পারবে না ওখানে খুঁজবার কথা।' লম্বা এক শ্বাস ফেলল রানা। 'ধোঁয়াতে সুঁইয়ের মজা নেই, কিন্তু নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।'

একেবারে ছাইবর্ণ ধারণ করল বিট্রিক্সের মুখ। ভয় পেয়েছে মেয়েটা এবার। রানা লক্ষ করল থরথর করে কাঁপছে ওর হাত।

'কাকে ভয় পাচ্ছ, বিট্রিক্স? ওদের, না আমাকে?'

'আপনাকে। এতদিন ঠিকই ছিলাম, আপনি...'

'আমি এসেই গোলমাল শুরু করে দিয়েছি। তাই না? কিন্তু একটু ভাল করে ভেবে উত্তর দাও দেখি: তোমার কি মনে হয়, কেন আমি তোমার ঘরে

আবার ফিরে এসেছি আজ? তোমার ক্ষতি করবার জন্যে? বুঝতে পারছ না, সেটা করতে চাইলে এখানে আসবার কোন প্রয়োজনই ছিল না আমার? তোমার প্রেমে যে পড়িনি সেটা বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে। ব্ল্যাকমেইলড হচ্ছ, এই ধারণাটা যদি আমার মনে না আসত তাহলে নিজের ঘুম নষ্ট করে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না। আমি তোমাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই: নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছ তুমি। এখনও সময় আছে। ইচ্ছে করলে দিক পরিবর্তন করতে পারো। পরে আর সময় থাকবে না।'

'ভুল বলছেন।' চোখ তুলল বিট্রিক্স। 'কোন উপায় নেই আমার। শেষ হয়ে গেছি আমি।'

মাথা নাড়ল রানা।

'হেনরীর কথা যদি বলো, আমি স্বীকার করব, হ্যাঁ, ওর জন্যে কোন রাস্তা খোলা নেই আর। কিন্তু তোমার জন্যে একটা রাস্তা খোলা আছে। একটাই মাত্র রাস্তা। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা। তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমি সাহায্য করব তোমাকে।'

'কিভাবে কি সাহায্য করবেন আপনি আমাকে?'

'প্রথমত, হেনরীর জীবনটা যারা শেষ করে দিয়েছে, তাদের শেষ করে দিয়ে। তোমার জীবনটা যারা বিষময় করে তুলেছে, তাদের শেষ করে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে পুলিসের সমস্ত ঝামেলা থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার সাহায্য দরকার। পৃথিবীর প্রত্যেকেরই দরকার একে অপরের সাহায্য। আমাকে যদি সাহায্য করো, আমি তোমাকে সাহায্য করব···যদি কসম খেতে বলো, খেতে পারি। আমার কথায় নিশ্চয়ই টের পেয়েছ, ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে? কি, সাহায্য করবে আমাকে?'

দুশ্চিন্তা, হতাশা, ভয়—নানান রকম ভাবের খেলা খেলে গেল বিট্রিক্সের মুখের ওপর দিয়ে। দু'মিনিট চুপচাপ বসে থেকে তিনবার মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে পয়েন্ট টু ওয়ান বোরের ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে দিল রানা ওর হাতে।

'এটা রেখে দাও। কাজে লাগতে পারে। প্রয়োজন হলেই ব্যবহার করতে দ্বিধা কোরো না।'

ঠিক তিন মিনিট পর বেরিয়ে এল রানা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ থেকে। রাস্তার অপর পারে একটা সিঁড়ির ওপর বসে গভীর তত্ত্বালোচনায় মত্ত রয়েছে দুই মাতাল, তর্ক করছে ফিসফিস কণ্ঠে। পিস্তল ধরা হাতটা কোটের পকেটে পুরে দ্রুতপায়ে এগোল রানা বিশ গজ দূরে পার্ক করে রাখা ট্যাক্সির দিকে। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে ওর দুচোখ ভেঙে। বেলা নটার বেশি ঘুমানো যাবে না, দশটার সময় কর্নেল ডি গোল্ডের সঙ্গে সার্চ করতে যাওয়ার কথা ওর ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে।

ভোঁ করে ছেড়ে দিল রানা ট্যাক্সি। দেখতে পেল না, ট্যাক্সিটা রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছে মাতাল দু'জন—মাতলামির লেশমাত্র নেই ওদের চেহারায়।

প্রবেশ নিষেধ-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৬

এক

ঠিক সকাল ন'টায় বালিশের নিচে বেজে উঠল খাপে পোরা ছোট্ট অ্যালার্ম ঘড়িটা।

বিরক্তি লাগল রানার। শুয়ে শুয়েই আড়মোড়া ভাঙল, এপাশ-ওপাশ ফিরল বারকয়েক, হাই তুলে লম্বা ডাক ছাড়ল নিশি রাতে ক্রন্দনরত কুকুরের মত, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

শেভ-স্নান সেরে বেরিয়ে এল সে দশ মিনিটের মধ্যেই। জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিতে লাগল আরও পাঁচ মিনিট, তারপর নেমে গেল নিচে, রেস্তোরাঁয়। গতরাতে মিস হয়ে গেছে খাওয়াটা, ডাবল ব্রেকফাস্ট দিয়ে পুষিয়ে নিল সে সুদে আসলে। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে ধরাল দিনের প্রথম সিগারেট।

ঝকঝকে দিন। আকাশে ছিটেফোঁটাও নেই মেঘের। প্রফুল্ল মনে বেরিয়ে এল রানা হোটেল কার্লটন থেকে, গজ তিরিশেক গিয়ে নজর বোলাল চারপাশে, কিন্তু এমন কাউকে চোখে পড়ল না যে কিনা ওকে অনুসরণ করতে পারে। কেন যেন দমে গেছে অনুসরণকারীরা, কাল রাত থেকে কেউ পিছু নিচ্ছে না আর। ট্যাক্সিটার কাছে এসে হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিল ওর মনে—ওকে শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি তো ওরা? গাড়িতে কিছু ফিট করে রেখে যায়নি তো আবার? সামনের এঞ্জিন, পেছনের বুট, গাড়ির তলা এবং ভেতরটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখল সে পাঁচ মিনিট, তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। বোমা বিস্ফোরণে মারা গেল না দেখে রওনা হয়ে গেল সে খুশি মনে, সোজা এসে থামল মার্নিক্সস্ট্রার্টের পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ঠিক দশটায়।

রাস্তার উপরেই একটা মার্সিডিজের মাডগার্ডে হেলান দিয়ে রানার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ড। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার। সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ। রানা টের পেল, দু'জনেই মনে মনে স্থিরনিশ্চিত—অনর্থক নষ্ট করা হচ্ছে ওদের সময়। ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলছে না, কিন্তু দু'জনেই জানে, অহেতুক এই ঝামেলা না করলেও চলত।

'সার্চ ওয়ারেন্ট তৈরি?'

'হ্যাঁ।' সোজা হয়ে দাঁড়াল ডি গোল্ড। 'আপনার কি এখনও মনে হচ্ছে এই সার্চটা জরুরী? মানে, না করলেই নয়?'

শোফার চালিত মার্সিডিজের পেছনের সীটে উঠে বসল রানা, জানালা দিয়ে কর্নেলের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

'কাল রাতে যতটা মনে করেছিলাম, আজ সকালে তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী বলে মনে হচ্ছে।'

চট করে উঠে পড়ল কর্নেল গাড়িতে। ইন্সপেক্টর উঠল সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিতেই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে চাইল মাগেনথেলার। 'বিশেষ কোন কারণ ঘটেছে, যেজন্যে আপনার ধারণাটা ঘন হয়েছে আগের চেয়ে?'

ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল রানা। 'ইনটিউইশন।'

নিজেদের মধ্যে চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল ডি গোল্ড এবং মাগেনথেলার। এই জিনিসটার উপর নির্ভর করে যে পুলিসী-তৎপরতা চলে না, সেটা ভাল করেই জানা আছে তাদের। রানার প্রতি ঠিক কতটা আস্থা রাখা যায় বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল কর্নেল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'একটা ভ্যানে করে আটজন সাদা পোশাক পরা পুলিস পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে আগেই। গলির মুখে অপেক্ষা করবে ওরা আমাদের জন্যে। কিন্তু কাল আপনার কথায় মনে হলো, সার্চ করাটা আপনার ঠিক উদ্দেশ্য নয়, আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে…'

'সার্চটাই প্রধান নয়,' বলল রানা, 'কিন্তু সেটাও একটা উদ্দেশ্য। আমি আসলে যা চাইছি সেটা হচ্ছে ওদের ইনভয়েসগুলো—যার থেকে ওদের সমস্ত সাপ্লায়ারদের একটা লিস্ট তৈরি করে নেয়া যায়।'

'যা করছেন, আশা করি বুঝেশুনেই করছেন?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাগেনথেলার। 'ভাবছি, আমাদের আবার কোন বিপদে পড়তে না হয়।'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল রানা। কেন যেন কথোপকথন জমছে না আজ। সবাই চুপচাপ রইল ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীর গলিমুখে না পৌঁছানো পর্যন্ত। মার্সিডিজটা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থামল ভ্যানের পাশে। সিভিলিয়ানের স্যুট পরা এক লোক এগিয়ে এল গাড়ির পাশে। ওর দিকে একনজর চেয়েই মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। এই লোক যে পোশাকই পরুক, ধুতি পাঞ্জাবি বা মওলানার আলখেল্লা পরলেও এক মাইল দূর থেকে বলে দিতে পারবে সে—এ লোক পুলিসের লোক, এমনই ছাপ পড়ে গেছে চেহারায়।

স্যালিউট করল না বটে, কিন্তু খুট করে জুতোর গোড়ালি না ঠুকে পারল না লোকটা। নিচু হয়ে ঝুঁকে বলল, 'আমরা রেডি, স্যার।'

'গুড। আমরা যাচ্ছি আগে, তোমরা লোকজন নিয়ে এসো পিছু পিছু।'

ওয়েরহাউজের সামনে থেমে দাঁড়াল মার্সিডিজ। প্যাকিঙের ঘরে ঢুকতেই একজন লোক দোতলায় নিয়ে গেল ওদের। টাইম লক লাগানো অফিসের দরজা এখন দুপাট হাঁ করে খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন।

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা অফিস। ওয়েরহাউজে এমন একটা হাল ফ্যাশনের অফিসঘর আশা করা যায় না। কার্পেট, ড্রেপিং, আসবাব—সবকিছুতেই আধুনিক রুচির ছাপ। বিশাল একটা টেবিলের ওপাশে বসেছিল এক বিশালবপু লোক, ওদের দেখেই উঠে দাঁড়াল হাসিমুখে, হাত

বাড়িয়ে সামনের চেয়ার দেখাল।

'আসুন, আসুন। বসুন।'

চেয়ারের দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। ফিরল কর্নেল ডি গোল্ডের দিকে।

'অল্প কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষমা করতে হবে আমাকে, কর্নেল,' বলল সে। 'এক্ষুণি একজনের সাথে দেখা করতে হবে আমার। অত্যন্ত জরুরী। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কর্নেল রানার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'এতই জরুরী, এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ভুলেই গিয়েছিলেন একেবারে?'

টিটকারিটা গায়ে মাখল না রানা। এইভাবে ডেকে এনে হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ে গেছে বললে কর্নেলের পক্ষে রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক ওর এই হঠাৎ ভয় পাওয়া। এক মুহূর্ত বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না ওর—যে ভুল করে ফেলেছে, সেটা এক্ষুণি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে, নইলে পরে হয়তো আর সুযোগই পাওয়া যাবে না কোনদিন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। নানান ঝামেলায় ভুলে গিয়েছিলাম। বেশি সময় লাগবে না আমার···'

'একটা ফোন করলে হয় না? এখান থেকে না হয়···' টেবিলের উপর রাখা একটা টেলিফোন সেটের দিকে চোখের ইঙ্গিত করল কর্নেল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলে উঠল মোটা লোকটা। 'ইচ্ছে করলে আপনি এখান থেকেই···'

'সেটা সম্ভব নয়। আমার নিজের যেতে হবে।'

'কী এমন জরুরী, গোপনীয় ব্যাপার যেটা···' রানার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল কর্নেল।

'আপনার গাড়ি এবং শোফার ধার নিতে পারি কয়েক মিনিটের জন্যে?'

'পারেন।' নিরুদ্যম কণ্ঠে বলল কর্নেল। রানার খ্যাপামি দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে, বোঝা গেল।

'আর···আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে পারেন···'

'কতক্ষণ? কতক্ষণ বসে থাকতে হবে আমাদের আপনার জন্যে?'

'কয়েক মিনিট। বেশি না।'

মিনিট দুয়েক চলবার পর একটা কাফের সামনে থামতে বলল রানা মার্সিডিজের ড্রাইভারকে। গাড়ি ঘোরাতে বলে প্রায় দৌড়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ওদের টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে দ্রুতহাতে ডায়াল করল সোহানাদের হোটেলের নাম্বারে। হোটেল ডেস্কের বুড়িকে ডিঙিয়ে ওদের ঘরে পৌঁছুতে আজ দশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

'সোহানা?'

'হ্যাঁ। কি খবর, রানা?'

'মারিয়া বেরিয়ে গেছে?'

'এই তো, ঘণ্টাখানেক হলো। আমিও বেরোচ্ছি…'

'শোনো। যে কাজ দিয়েছিলাম, তার চেয়েও জরুরী একটা কাজ পড়ে গেছে। এক্ষুণি…আই রিপিট, এক্ষুণি এই হোটেল ছেড়ে দাও। এক্ষুণি বলতে আমি বোঝাচ্ছি বড়জোর দশ মিনিট। সম্ভব হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে তোমাকে।'

'বেরিয়ে পড়তে হবে মানে…'

'মানে জিনিসপত্র প্যাক করে বিল চুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে হবে ওখান থেকে। অন্য কোন হোটেলে গিয়ে উঠবে। যে কোন হোটেল…না, না, গর্দভ, কার্লটনে না। তোমাদের যোগ্য যে-কোন হোটেলে। কেউ যেন অনুসরণ করতে না পারে সেজন্যে ট্যাক্সি যতগুলো খুশি ব্যবহার করতে পারো। হোটেলের টেলিফোন নাম্বারটা কর্নেল ডি গোল্ডের অফিসে ফোন করে জানাবে। উল্টে নেবে নাম্বারটা।'

'উল্টে নেব!' সোহানার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। 'পুলিসকেও তুমি…

'কাউকেই বিশ্বাস করি না। আমরা এখানে কাজ করতে এসেছি, সোহানা, বিশ্বাস করতে নয়।'

'আর মারিয়া?'

'আগে হোটেল বদলাও। তারপর যেমনভাবে পারো এই হোটেলে উঠতে বাধা দাও মারিয়াকে। পার্কে না গিয়ে চেষ্টা করবে পথেই ওকে আটকাতে। মারিয়াকে ধরে নিয়ে চলে যাবে দু'জন বিট্রিক্স শেরম্যানের আস্তানায়। এখন বাসাতেই পাবে আশা করি, বাসায় না পেলে খোঁজ করবে ব্যালিনোভায়। ওকে বলবে, ওর ভালর জন্যেই ওর এখন তোমাদের সাথে নতুন হোটেলে থাকা দরকার। যতক্ষণ না ওর বাইরে বেরোনো আমি নিরাপদ মনে করছি ততক্ষণ ওর থাকতে হবে তোমাদের সাথে।'

'আর ওর ভাই…'

'ওর ভাই থাকুক যেখানে আছে সেখানেই। আপাতত ওর কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না। বিপদ এখন তোমাদের তিনজনের মাথার ওপর। যদি তোমাদের সাথে যেতে ও রাজি না হয়, ওকে বলবে হেনরীর ব্যাপারে পুলিসে ফোন করবে তাহলে তুমি।'

'পুলিসে ফোন করব!'

'দরকার হবে না, পুলিসের নাম শুনলেই সুড়সুড় করে তোমাদের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করবে মেয়েটা।'

'কিন্তু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না? মানে, পুলিসের ভয় দেখিয়ে একটা মেয়েকে…'

'তর্ক কোরো না, সোহানা। যা হুকুম করছি, পালন করো।' বলেই নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল সে ওয়েরহাউজের অফিসরুমে। ইতিমধ্যেই এখানে আসবার কারণ জানানো হয়েছে ভলেনহোভেনকে। রানা ঢুকে দেখল অমায়িক, দয়ালু ভাবটা দূর হয়ে গেছে মোটা লোকটার মুখের

চেহারা থেকে, সেই জায়গায় ফুটে উঠেছে অসন্তোষ বিক্ষোভ আর অবিশ্বাস। বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়া থুতনি কাঁপছে আবেগে। একহাতে ধরা রয়েছে একটা কাগজ। খসে পড়ে গেল কাগজটা টেবিলের উপর।

'সার্চ ওয়ারেন্ট!' দুঃখে ফেটে যাচ্ছে ভলেনহোভেনের বুক। পাথরের মূর্তি পর্যন্ত কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেবে ওর এক্সপ্রেশন দেখে। চেহারাটা অর্ধেক হলে বেশ মানিয়ে যেত হ্যামলেট হিসেবে। 'দেড়শো বছর ধরে···বাপ-দাদারও বাপের আমল থেকে ব্যবসা করছি আমরা ভলেনহোভেন ফ্যামিলি, সম্মানের সাথে, সততার সাথে। আজ তার এই পরিণতি! ভলেনহোভেন কোম্পানীতে সার্চ ওয়ারেন্ট! হায়রে, এই ছিল কপালে! শুনলে এক্ষুণি হার্টফেল করবে আমার বুড়ো বাপ।' নিজের কপালে দুটো চাপড় দিল লোকটা। 'এইবার চুনকালি পড়ল··· গেল গুডউইল! সর্বনাশ! সার্চ ওয়ারেন্ট!' নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর চোখ বুজল, 'ঠিক আছে, সার্চ করুন। যেখানে খুশি, যা খুশি দেখুন সার্চ করে। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমরা কি খুঁজতে এসেছি সেটা জানতে চান না আপনি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'কী হবে জেনে!' দুঃখে ভেঙে গেল ওর গলা! 'শেষ! মান-সম্মান-ইজ্জত-ব্যবসা সব গেল আমার, খোদা! একশো পঞ্চাশ বছর ধরে···'

'সার্চ ওয়ারেন্ট আর পুলিসের নাম শুনলেই কেন যে পাবলিকের এই রকম অবস্থা হয়!' হাসিহাসি মুখ করে বলল কর্নেল ডি গোল্ড। 'শুনুন, মিস্টার ভলেনহোভেন, ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। আমার ধারণা, স্বর্ণমৃগের পেছনে ছুটছি আমরা। এটা রুটিন চেক। অফিশিয়াল অনুরোধ এসেছে আমাদের কাছে, কাজেই নিয়ম অনুযায়ী সার্চ করতেই হবে আমাদের। এতে আপনার সুনাম ক্ষুণ্ন হবে না। ভেঙে পড়বারও কিচ্ছু নেই। আমাদের কাছে ইনফরমেশন এসেছে যে আপনাদের এখানে বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা কিছু ডায়মন্ড আছে···'

'ডায়মন্ড!' একেবারে আসমান থেকে পড়ল মোটা লোকটা। রানা লক্ষ করল, এই একটি শব্দে অর্ধেক দুশ্চিন্তা যেন দূর হয়ে গেল লোকটার মুখ থেকে। কোলাব্যাঙের মত মাথাটা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। ম্লান হেসে বলল, 'ডায়মন্ড? আশ্চর্য! ঠিক আছে, দেখুন খুঁজে। শুধু একটা অনুরোধ: যদি পাওয়া যায়, এক-আধটা দয়া করে দিয়ে যাবেন আমাকে। জীবনে দেখিনি আমি এ জিনিস।'

এসব টিটকারি গায়ে না মেখে অবিচলিত দৃঢ়তার সাথে বলল কর্নেল, 'তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে: সন্দেহ করা হচ্ছে, আপনাদের এখানে ডায়মন্ড কাটিং মেশিনারিও রয়েছে।'

'তাই নাকি?' আরও সিকিভাগ দুশ্চিন্তা উড়ে গেল লোকটার চেহারা থেকে। 'সত্যিই? সেটা তো নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখবার মত জিনিস না, পেয়ে যাবেন একটু খুঁজলেই। দেখুন খুঁজে।'

'সেইসাথে আপনাদের ইনভয়েস ফাইলটাও দেখতে হবে।'

'একশোবার। দেখুন, দেখুন। ভাল করে খতিয়ে দেখুন সব। কোন আপত্তি নেই আমার।'

'আপনার সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল কর্নেল ডি গোল্ড। মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারকে। চট করে উঠে দাঁড়াল মাগেনথেলার, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সার্চের ব্যবস্থা করতে। যেন গোপনীয় কিছু বলছে এমনি ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে এল কর্নেল। 'এই অসুবিধে সৃষ্টি করার জন্যে আমি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত, মি. ভলেনহোভেন। পুলিসের কাজ জনসাধারণকে সাহায্য করা, তাদের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয়। কিন্তু কি করব···জানি, এটা বেহুদা সময় নষ্ট, আপনাকে হয়রানি করা, নিজেরাও হয়রানি হওয়া, তবু···'

তিরিশ মিনিটের মধ্যেই হয়রান হয়ে ফিরে এল মাগেনথেলার। ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সার্চ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বুঝতে পেরে আবার হাসিখুশি দয়ালু ভাবটা ফিরে এসেছে ভলেনহোভেনের মধ্যে! কেক, বিস্কিট, কফি আনিয়ে আপ্যায়ন করল, অবাঞ্ছিত হলেও, ক্ষমতাধারী অতিথিদের। এক ফাঁকে রানাও ঘুরে এল পুরোটা বাড়ি। গতরাতে যেখানে যা দেখে গিয়েছিল, প্রায় তেমনি রয়েছে সবকিছু। শুধু ক্যানাবিসের গন্ধটা অনুপস্থিত। সেই জায়গায় মিষ্টি একটা এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ। এ ব্যাপারে কাউকে কিছুই বলল না সে।

নিচে নেমে এসে বিদায় দিল ভলেনহোভেন ওদের হাসিমুখে, যতটা না ওদের কৃতার্থ করতে, তার চেয়ে বেশি প্রতিবেশী আর সব ওয়েরহাউজের মালিক ও কর্মচারীদের জানাতে যে সার্চ হয়েছে বটে, কিন্তু বে-আইনী কিছুই পাওয়া যায়নি ওর ঘরে। গাড়িতে ওঠার আগে ওর হাত ঝাঁকিয়ে দিল কর্নেল।

'আপনার অসুবিধের জন্যে সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত, মিস্টার ভলেনহোভেন। আমাদের ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। অবশ্য কবেই বা ঠিক তথ্য পাই আমরা! যাই হোক, এই সন্দেহ এবং সার্চ সম্পর্কে সব কিছু কেটে দেব আমরা আমাদের ফাইল থেকে।' হাসল। ইনভয়েসের ফাইল ধরা বামহাতটা নাড়ল। 'এগুলো পরীক্ষার জন্যে দেব আমরা সেই ইন্টারেস্টেড ডিপার্টমেন্টকে। যে মুহূর্তে ওরা নিশ্চিত হবে যে এর মধ্যে কোন বে-আইনী ডায়মন্ড সাপ্লায়ারের নাম নেই, সাথে সাথেই ফেরত দেয়া হবে ফাইলটা। ঠিক আছে? চলি, গুডমর্নিং।'

মাগেনথেলার এবং রানাও ওর হাত ধরে ঝাঁকাল, বিরক্ত করবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল, তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে। রানার হাসিতে কোন মালিন্য দেখতে পেল না ভলেনহোভেন। পাওয়ার কথাও নয়, কারণ বেচারা তো আর থট রিডিং জানে না। জানা থাকলে টের পেত, বন্ধুত্বের বিন্দুমাত্র ছিটেফোঁটাও নেই ওর ভিতর; বরং শত্রুতা রয়েছে রানার হাসিতে, হাত ঝাঁকুনিতে—সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চিন্তা চলেছে ওর মাথায়।

কারণ, গতরাতে এই লোকটাকেই দেখেছিল সে ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাব

থেকে সোহানা ও মারিয়ার পিছন পিছন রওনা হতে।

দুই

প্রায় নিঃশব্দে ফিরে এল ওরা পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ভ্যান ডি গোল্ড আর মাগেনথেলারের মধ্যে যে সামান্য কথা হলো সেটা ভলেনহোভেন বা সার্চ সংক্রান্ত কিছুই না, সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে সাধারণ আলাপ। বোঝা গেল আজকের এই সার্চটা যে একেবারে অনর্থক সময় নষ্ট, বাজে ব্যাপার হয়েছে, সে সম্পর্কে দুজনের কারও মনেই কোন সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এই প্রসঙ্গে কোন কথা তুললে পাছে রানা লজ্জা পায় সেজন্যেই নেহায়েত ভদ্রতার খাতিরে অন্য কথা বলছে ওরা। নেমেই নিজের কাজে চলে গেল মাগেনথেলার।

কর্নেলের পিছু পিছু তার অফিসে গিয়ে ঢুকল রানা।

'কফি?' ভুরু নাচাল কর্নেল ডি গোল্ড। 'অ্যামস্টার্ডামের সেরা কফি খাওয়াতে পারি আপনাকে।'

'না, ধন্যবাদ। পরে একদিন হবে। আজ একটু বেশি ব্যস্ত।'

'ব্যস্ত? তার মানে প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে? কাজে নামতে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?'

'আরে না।' হাসল রানা। 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে খানিক আকাশ পাতাল ভাবব।'

'তাহলে···তাহলে কেন···'

'তাহলে কেন এখানে এলাম? ছোট্ট দুটো অনুরোধ আছে আমার। আমার জন্যে কোন টেলিফোন মেসেজ আছে কিনা একটু খোঁজ করে দেখবেন?'

'মেসেজ?'

'ওয়েরহাউজে আপনাদের বসিয়ে রেখে যার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার কাছ থেকে আপনার অফিসে একটা মেসেজ আসবার কথা আছে। দেখবেন একটু?'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল ডি গোল্ড, একটা রিসিভার কানে তুলে নিয়ে দু'একটা কথা বলল, ভ্রূ কুঁচকে কি যেন শুনল, তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে বলল, 'রিপিট করো।'

খসখস করে ইঞ্চি চারেক লম্বা ইংরেজি অক্ষর ও নম্বরযুক্ত একটা মেসেজ লিখে কাগজটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কর্নেল। অক্ষরগুলো অর্থহীন, রানা জানে, কিন্তু সংখ্যাগুলো ওল্টালেই পাওয়া যাবে সোহানাদের হোটেলের টেলিফোন নাম্বার। কাগজটা পকেটে ফেলল সে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা ডিকোড করতে হবে আমার আবার।'

'এবার দ্বিতীয় অনুরোধ!'

'একজোড়া বিনকিউলার ধার দিতে পারবেন?'

'বিনকিউলার?'

'আমার হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বহুদূরে একটা সুইমিং পুল দেখা যায়। আমার বিশ্বাস অনেক সুন্দরী মেয়ে আসে ওখানে, এতদূর থেকে ভালমত দেখা যায় না। একটা বিনকিউলার হলে...'

'অবশ্যই, অবশ্যই। নিরানন্দ অবিবাহিত জীবনে এইটুকু আনন্দ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা নিতান্তই অন্যায় হবে। এক্ষুণি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' কথাগুলো হালকা সুরে বলল ঠিকই, কিন্তু সামান্যতম হাসির আভাসও নেই কর্নেলের মুখে। গলার সুর পরিবর্তন করে বলল, 'দেখুন, মেজর মাসুদ রানা, আপনার সাথে আমার কথা ছিল ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার। ছিল কি না?'

'নিশ্চয়ই ছিল, এবং আছে।'

'তাহলে এইসব গোপন তৎপরতার কি অর্থ? অনেক কিছুই আপনি আমাদের এড়িয়ে চেপে যাচ্ছেন।'

'চাপছি না,' বলল রানা। 'আপনাদের জানাবার মত কোন তথ্য হাতে এলেই জানাব। ভুলে যাবেন না, আপনারা বছরের পর বছর কাজ করছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে, আমি এখানে এসে পৌঁছেছি দুদিনও পুরো হয়নি। চেপে যাওয়ার মত তথ্য থাকলে বরং আপনাদের কাছেই থাকা সম্ভব, আমার কাছে তথ্য কোথায় যে চাপবার প্রশ্ন উঠবে? মিথ্যে বলিনি, আমার কাছে কয়েকটা ব্যাপার বেশ বিদঘুটে ঠেকেছে, ঘরে ফিরে শুয়ে শুয়ে ওগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব আমি এখন।'

রানাকে বেশি ঘাঁটাল না কর্নেল। বুঝে নিয়েছে, এই লোকটার কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করা বোকামি হবে। এর কাজের ধারা আলাদা হতে পারে, কিন্তু যোগ্যতা সম্পর্কে কোনরকমের কোন সন্দেহ নেই তার মনে। পুলিসী নিয়ম মেনে এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে মেমো আর সার্কুলারের মাধ্যমে করবার মত কাজ যে এটা নয়, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা তার আছে—বিশেষ করে গত কয়েকটা বছরের নিষ্ফল চেষ্টার পর ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে। বিনকিউলারটা কাঁধে ঝুলিয়ে রানা যখন বেরিয়ে গেল, মস্তবড় একটা শ্বাস ছেড়ে মন দিল সে কাজে।

আধমাইল দূরে একটা টেলিফোন বুদের সামনে গাড়ি থামাল রানা। কর্নেলের কাছ থেকে পাওয়া নাম্বারে ডায়াল করতেই একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হোটেল প্লাযা।'

রানার মনে পড়ল শহরের পূর্বদিকে এই নামের একটা হোটেল দেখেছে সে। ভাল কোন হোটেল না, কিন্তু ওদের দুজনের পরিচয় অনুযায়ী ঠিক যে ধরনের হোটেলে ওঠা উচিত, তাই পছন্দ করেছে সোহানা।

'আমার নাম রানা। মাসুদ রানা। দুজন মহিলা আজ আপনাদের ওখানে উঠেছেন। এই ঘণ্টাখানেক কি তার চেয়ে কিছু বেশি হবে। ওদের সাথে কথা বলতে পারি?'

'আমি দুঃখিত। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন একটু আগে।'
'দুজনই?' আরও একটু নিশ্চিত হতে চাইল রানা।
'হ্যাঁ। দুজনই।' হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। তার মানে মারিয়াকে পেয়ে গেছে সোহানা, এখন হয় বিট্রিক্সের খোঁজে বেরিয়েছে, নয়তো গেছে হোস্টেল প্যারিসের মেয়েদের উপর নজর রাখতে। রানার অকথিত প্রশ্ন আঁচ করে নিয়ে অপর প্রান্ত থেকে লোকটা বলল, 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন ওঁরা, মিস্টার রানা। আপনাকে জানাতে বলেছেন যে আপনার হোস্টেস বান্ধবীকে পাওয়া যায়নি।'
ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল রানার। লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার। একলাফে উঠে পড়ল গাড়িতে। বিট্রিক্সকে পাওয়া না যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?
একেবারে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে এসে গাড়ি থামাল রানা। দৌড়ে উঠে গেল তিনতলায়। বন্ধ। তালামারা। খুলতে অবশ্য এক মিনিটও লাগল না রানার। ভেতরে ঢুকে দেখল, গতরাতে যেমন দেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে ঘরটা। সাদামাঠা, বাহুল্যবর্জিত, ছিমছাম। কোথাও ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। ঘরের যেটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। তন্নতন্ন করে দুটো ঘরই খুঁজল রানা, কিন্তু এমন কোন তথ্য বা ইঙ্গিত চোখে পড়ল না যা দেখে টের পাওয়া যায় বিট্রিক্স বা হেনরী কি অবস্থায় কোথায় গেছে। বারবার আশঙ্কার একটা কালো ছায়া ভর করতে চাইল ওর মনের উপর, বারবারই মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল সে অশুভ চিন্তা। দরজায় তালা দিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এল সে নিচে। ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবে দেখতে হবে খোঁজ করে।
পাঁচ মিনিট দমাদম দরজা পিটবার পর সামান্য একটু ফাঁক হলো ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবের সদর দরজাটা। চট করে ফাঁকের মধ্যে জুতোসুদ্ধ পা ভরে দিয়ে হাত দিয়ে টেনে আর একটু বড় করল রানা ফাঁকটা। একমাথা সোনালি চুল দেখা গেল প্রথমে, তারপর দেখা গেল আবছামত একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুকের কাছে চাদর জাতীয় কিছু একটা দিয়ে লজ্জা ঢেকে। গতরাতে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছে রানা একে ড্রিঙ্কস সার্ভ করতে, আজ দিনের বেলা হঠাৎ এর এত লজ্জার কারণ বুঝে উঠতে পারল না সে।
'ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই,' বলল রানা।
'ছ'টার আগে খুলি না আমরা।'
'যেটুকু খুলেছ তাতেই চলবে। আমি রিজার্ভেশনের জন্যে আসিনি। চাকরির জন্যেও না। ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই। এই মুহূর্তে।'
'উনি...উনি তো এখানে নেই।'
'চাকরিটা খোয়াবার ইচ্ছে আছে?' কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি এখানে ইয়ার্কি মারতে আসিনি।'
চাকরির কথায় বেশ একটু সতর্ক হয়ে গেল মেয়েটা।
'মানে?'
কণ্ঠস্বর নিচু করল রানা বক্তব্যে গাম্ভীর্য বাড়াবার জন্যে। 'মানে হচ্ছে: যে

মুহূর্তে ম্যানেজার জানতে পারবে যে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম এবং তুমি বোকার মত ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে আমাকে বিদায় করে দিয়েছ, তোমার চাকরিটা নাই হয়ে যাবে।'

একটু ইতস্তত করল মেয়েটা, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে বারকয়েক দেখল রানাকে আপাদমস্তক, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন।' বলেই দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু রানার জুতোর সোল রয়েছে দুই দরজার ফাঁকে, বারকয়েক দরজা বন্ধ করবার বিফল চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ভেতরে। আধ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক লোককে সাথে নিয়ে।

এক নজরেই অপছন্দ করল রানা লোকটাকে। বেশির ভাগ মানুষের মতই রানাও সাপ পছন্দ করে না। কিন্তু একে দেখবার সাথে সাথে ওই প্রাণীটার কথাই মনে পড়ল ওর। এই সাপের বগলের কাছে শোলডার হোলস্টারের আভাস টের পেল সে পরিষ্কার। যেমন লম্বা তেমনি চিকন লোকটা, কিন্তু হাতের কব্জি বক্সারের মত চওড়া। ফ্যাকাসে গায়ের রঙ, চলার ভঙ্গিতে নিশাচর হিংস্র জন্তুর ক্ষিপ্রতা। লম্বা নাক, নাকের দুপাশে কাছাকাছি বসানো একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ। ঠোঁটের কোণে সিগারেট। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে পরীক্ষা করল সে রানার নির্বিকার মুখটা।

'কি ব্যাপার, মিস্টার? এই সাতসকালে কি চান? এটা নাইট-ক্লাব—দিনে বন্ধ।'

'আগেই শুনেছি খবরটা। আপনি ম্যানেজার?'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনি যদি পরে এক সময়ে আসেন—পরে মানে, এই ধরুন, সন্ধে ছ'টা নাগাদ আসেন, তাহলে হয়তো ম্যানেজারের সাথে একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা…'

'ইংল্যান্ড থেকে এসেছি, আমি একজন উকিল, অত্যন্ত জরুরী এক ব্যাপারে।' থেমে থেমে বলল রানা। একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিল লোকটার হাতে। 'এক্ষুণি দেখা করা দরকার আমার ম্যানেজারের সাথে। অনেক টাকার মামলা।'

আবার একবার সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টি বোলাল লোকটা রানার উপর। কার্ডটা দেখল। তারপর ঠোঁটে বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল, 'কোন কথা দিচ্ছি না, মিস্টার রবার্টসন। ঠিক আছে, কার্ড দেখাই ওঁকে। হয়তো বলেকয়ে কয়েক মিনিট সময় আদায় করা যাবে ওঁর কাছ থেকে।'

লম্বা পা ফেলে চলে গেল লোকটা, ফিরে এল প্রায় সাথে সাথেই। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল সে রানাকে সামনে এগোবার জন্যে, সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলল পিছু পিছু। এই ধরনের লোক পেছন পেছন হাঁটলে সবসময় অস্বস্তি বোধ করে রানা, কিন্তু আপাতত কিছুই করবার নেই, ওপাশের দরজা ঠেলে সরু একটা ম্লান আলোকিত প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে ফিরল। সামনেই একটা ভারী দরজার গায়ে ছোট্ট নেমপ্লেট—তাতে লেখা: ম্যানেজার।

পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে দরজার গায়ে দুটো টোকা দিয়ে হ্যান্ডেলে চাপ দিল লম্বা লোকটা, রানার পিঠে মৃদু চাপ দিল ভেতরে ঢোকার জন্যে। ঢুকে পড়ল রানা।

ছোট্ট অফিসঘর। অত্যন্ত সুসজ্জিত। দুপাশের দুই দেয়াল জুড়ে ফাইলিং ক্যাবিনেট, অন্য দুই দেয়াল ক্রিমসন ও ভায়োলেট রঙের ড্রেপ দিয়ে মোড়া। জানালা আছে কি নেই বোঝা যায় না। কাঁচ ঢাকা মেহগনি-ডেস্কের ওপাশে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে রয়েছে নীল আলপাকা স্যুটপরা একজন হালকা পাতলা সম্ভ্রান্ত চেহারার মাঝবয়সী লোক। রানা ঢুকতেই চশমাটা খুলে রাখল টেবিলের উপর, আট-দশটা আংটি পরা বামহাতে একটা চোখ ডলতে ডলতে অন্য চোখ দিয়ে চাইল রানার দিকে।

'আসুন, মিস্টার রবার্টসন।' উঠে দাঁড়াবার বা হ্যান্ডশেক করবার চেষ্টা করল না সে। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব সুখী হলাম। বসুন। আমার নাম গুডবডি, আমিও ইংরেজ।'

ভদ্রতার হাসি হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা, যেন সত্যিই যে ওর নাম গুডবডি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বসল সামনের চেয়ারে। সাথে সাথেই কাজের কথায় চলে এল গুডবডি।

'আমার সাথে জরুরী কোন ব্যাপারে আলাপ আছে আপনার। কি সেটা?'

'আমার কাজটা ঠিক আপনার সাথে নয়,' বলল রানা। 'আপনার এক কর্মচারীর সাথে।'

মুহূর্তে ফ্রিজিং পয়েন্টে চলে এল গুডবডির শীতল দৃষ্টি। 'আমার কর্মচারীর সাথে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে বিরক্ত করবার মানে?'

'ওকে ওর বাসায় পেলাম না। ওখানেই জানতে পারলাম আপনার এখানে কাজ করে মেয়েটা।'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ। ওর নাম হচ্ছে বিট্রিক্স শেরম্যান।'

'কি নাম বললেন? বিট্রিক্স শেরম্যান। উঁহুঁ।' যেন রানাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হত, কিন্তু না পারায় বিব্রত বোধ করছে, এমনি ভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'এখানে কাজ করে? অনেক মেয়েই কাজ করে এখানে, কিন্তু ওই নামে···নাহ্, ওই নামে কেউ আছে বলে তো মনে পড়ছে না!'

'কিন্তু ওর প্রতিবেশীরা যে বলল এখানেই কাজ করে?' বোকা হয়ে যাওয়ার ভাব করল রানা।

'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে কোথাও। স্যামুয়েল?'

প্যাঁচামুখ করে মাথা নাড়ল লম্বা লোকটা। 'ও নামে কেউ নেই আমাদের এখানে।'

'আগে ছিল?' সহজে হাল ছাড়তে চাইল না রানা।

বিরক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যামুয়েল, এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে বসানো ফাইলিং ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার টেনে তার মধ্যে থেকে ফাইল বের করল একখানা। ঝপাং করে সেটা রানার সামনে টেবিলের উপর ফেলে বলল, 'গত একবছর ধরে যত মেয়ে এখানে কাজ করেছে বা করছে তাদের সবার নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে। নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।'

এর উপর আর কোন কথা চলে না। ফাইলের দিকে না চেয়ে সোজা গুডবডির দিকে চাইল সে, হাসল লজ্জিত ভঙ্গিতে। 'বোঝা যাচ্ছে, ভুল তথ্য দিয়েছে ওরা। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।'

রানার উঠি উঠি ভাব দেখে সামান্য একটু প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠল গুডবডির মুখে। হয়তো কৃপা হলো। বলল, 'আমার মনে হয়, আশেপাশে আরও নাইট-ক্লাব আছে, সেখানে খোঁজ করলে পেয়ে যেতেও পারেন।' কথাটা শেষ করবার আগেই চশমাটা লাগিয়ে নিয়ে কাজে মন দিল ম্যানেজার। খসখস করে লিখছে একটা কাগজের উপর দামী পার্কার বলপেন দিয়ে। চোখ না তুলেই বলল, 'গুড ডে, মিস্টার রবার্টসন।'

ইতিমধ্যেই দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করছে স্যামুয়েল। রানাও এগোল ওর পেছন পেছন। দরজার কাছে গিয়ে আবার পেছন ফিরল সে। মুখে লজ্জিত হাসি টেনে এনে বলল, 'সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত…'

'গুড ডে।' মাথা তুলবার প্রয়োজন বোধ করল না লোকটা। ব্যস্ত। দুই সেকেন্ড অনিশ্চিত হাসি হেসে সৌজন্যের খাতিরে আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল রানা দরজাটা। মনে মনে আশা করল, কেবল পুরু আর ভারীই নয়, দরজাটা হয়তো সাউন্ডপ্রুফও।

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে নিমপাতার রস খাওয়ার হাসি হাসল স্যামুয়েল রানার দিকে চেয়ে। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল আগে আগে হাঁটবার জন্যে। রানা বুঝল, ওরই মত অস্বস্তি বোধ করে লোকটা বিপজ্জনক কেউ পিছু পিছু হাঁটলে। মিষ্টি করে হাসল রানা, পাশ কাটিয়ে সামনে যাওয়ার সময় হাসিমুখেই, অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে কনুইটা চালাল সে প্রচণ্ডবেগে। নাক দিয়ে 'হুঁক্' শব্দ বেরোল লোকটার, দু'ভাঁজ হয়ে গেল ওর লম্বা শরীরটা পেটের উপর বেমক্কা গুঁতো খেয়ে। একটাই যথেষ্ট, তবু ফাউ হিসেবে আরেকটা রদ্দা কষিয়ে দিল সে লোকটার ঘাড়ের পাশে। গুলি খাওয়া সাদা বকের মত ভেঙেচুরে পড়ে গেল লোকটা মেঝের উপর।

পিস্তল বের করে সাইলেন্সারটা পেঁচিয়ে লাগাল রানা ওটার মাথায়। তারপর কলার চেপে ধরে টেনে নিয়ে এল স্যামুয়েলকে আবার ম্যানেজারের দরজার সামনে। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়েই কাঁধের ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা।

চোখ তুলে আঁতকে উঠল গুডবডি। চশমার ওপাশে বিস্ফারিত চোখ আরও বড় দেখাচ্ছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে। রানা লক্ষ করল, সামান্য একটু পরিবর্তন হলো লোকটার মুখের চেহারায়—মানুষ মনের কোন ভাব বা ইচ্ছা গোপন করতে চাইলে যেমন হয়, তেমনি।

'উঁহুঁ! ভাল হবে না!' মাথা নাড়ল রানা। 'কোন চালাকি করতে যাবেন না। কোন বোতামে চাপ দিতে গেলে, কিংবা ডান পাশের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বের করতে গেলে মারা পড়বেন। কেউ কোন সাহায্য করবার অনেক আগেই।'

হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা রানার কথা শুনে। এবার সত্যিকার ভীতি দেখা দিল ওর চেহারায়।

'দুই ফুট পেছনে সরিয়ে নিন চেয়ারটা।'

চেয়ার সরিয়ে নিল গুডবডি। ওর উপর থেকে চোখ না সরিয়েই কলার ধরে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে এল রানা স্যামুয়েলের জ্ঞানহীন দেহ, পেছনে হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল দরজা, ফুটোয় লাগানো চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে পকেটে ফেলল চাবিটা। ছোট একটা হুঙ্কার ছাড়ল গুডবডির প্রতি, 'উঠে দাঁড়ান!'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল গুডবডি। টেলিফোনটার দিকে একবার চাইল, তারপর বলল, 'দয়া করে গোলাগুলি ছুঁড়বেন না, মিস্টার রবার্টসন। যা খুশি নিয়ে যান, আপনার কাজে বাধা দেব না আমি। ডাকাতি করতে···'

'এদিকে আসুন,' মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে ডাকল রানা। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল গুডবডি। 'আপনি জানেন, আমি কে?'

'কি করে জানব?' গুডবডির চেহারায় বিভ্রান্তির ছাপ। 'এই একটু আগে আপনি বললেন···'

'যে আমার নাম রবার্টসন। আসলে কে আমি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি···'

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা কানের উপর সাইলেন্সারের এক গুঁতো খেয়ে। পিস্তলের ফোরসাইট দিয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা করে চিরে দিল রানা ওর গালটা। কুলকুল করে রক্ত নেমে এল, টপটপ চিবুক বেয়ে পড়ছে সাদা শার্টের উপর।

'কে আমি?'

'মাসুদ রানা।' ভীতির পাশাপাশি ঘৃণাও দেখতে পেল রানা এবার ওর দৃষ্টিতে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা, 'ইন্টারপোল।'

'এই তো বাছার মুখ ফুটেছে!' আবার আঘাত করবার ভঙ্গিতে পিস্তলটা উঁচু করল রানা। 'কিন্তু আঘাত না করে জিজ্ঞেস করল, 'বিট্রিক্স শেরম্যান কোথায় কাজ করে?'

মারের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল গুডবডি, প্রশ্নের উত্তরে চট করে জবাব দিল, 'এখানে।'

'কোথায় ও?'

'জানি না। আপন গড, সত্যিই জানি না। রানাকে আবার পিস্তল তুলতে দেখে শেষের শব্দ দুটো বলতে গিয়ে কয়েক পর্দা চড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। কানের উপর ঠিক একই জায়গায় ঠকাশ করে বাড়ি পড়ল পিস্তলের বাঁটের। ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। 'কিছু বললে ঠিক দুই ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ব আমি!'

'না বললে মারা পড়বেন দুই সেকেন্ডের মধ্যে। কোন্‌টা ভাল?' আবার হাত তুলল রানা। 'কি? বলবেন?'

'বলব।'

'কোথায় ও?'

'পালিয়ে গেছে। এথেন্সে।'

'এথেন্সে?'

'হ্যাঁ। ভোরবেলায় এসেছিল এখানে। দু'মাসের বেতন পাওনা ছিল, সেই টাকার জন্যে।'

'একা?'

'না, ওর ভাইও ছিল সঙ্গে। দু'জনেই পালিয়েছে। আজ সাড়ে দশটার ফ্লাইটে। বিশ্বাস না হয় ফোন করে জেনে দেখতে পারেন এয়ারপোর্টে। আমি নিজেই এই কিছুক্ষণ আগে...'

রানাকে একটু আন্ডার-এস্টিমেট করেছিল লোকটা। মনে করেছিল, আরও দু'তিনটা সেকেন্ডের জন্যে আকর্ষণ করে রাখতে পারবে ওর মনোযোগ। অবাক হলো রানার ঠোঁটে মৃদুহাসি খেলে যেতে দেখে। পাঁই করে ঘুরেই লাথি চালাল রানা।

পিস্তল বের করে ফেলেছিল স্যামুয়েল। খটাং করে লাথি এসে লাগল ওর কনুইয়ের নিচে হাড়ের উপর। সাঁ করে উড়ে গিয়ে পিস্তল পড়ল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। ওর পাঁজরের উপর আরেকটা লাথি লাগিয়ে উঠে বসবার ইঙ্গিত করল রানা। ফিরল গুডবডির দিকে। পিস্তল দিয়ে টেলিফোনের দিকে ইশারা করে বলল, 'ডায়াল করুন।'

ডায়াল করে তিনবারের চেষ্টায় কানেকশন পেল গুডবডি, রানার দিকে এগিয়ে দিল রিসিভারটা।

'আমি পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার বলছি,' বলল রানা। 'আজকের এথেন্স ফ্লাইট সম্পর্কে জানতে চাই...খুব সম্ভব কে এল এমই হবে। বিট্রিক্স শেরম্যান আর হেনরী শেরম্যান বলে দু'জন কি এই ফ্লাইটে...কী বললেন?'

অপর প্রান্ত থেকে পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর এল, 'আজ সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটে এঁরা দু'জন চলে গেছেন এথেন্সে। হেনরী শেরম্যানের ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু তেমন কোন অসুবিধে হয়নি, দু'জন একসাথেই উঠেছেন প্লেনে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার।

গুডবডি আর সাপের বাচ্চা স্যামুয়েলকে ঘরের এককোণে পেছন ফিরে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজায় তালা মেরে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে চাবিটা ঢুকিয়ে দিল কার্পেটের নিচে। অ্যালার্ম বেল রয়েছে, টেলিফোন রয়েছে, স্পেয়ার কী সংগ্রহ করে এই ঘর থেকে বেরোতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না ওদের। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সে ব্যালিনোভার সদর দরজা খুলে।

বিট্রিক্সের এই হঠাৎ অন্তর্ধানে বেশ দুঃখই বোধ করল রানা। সাহায্য করব বলে করেনি, সেজন্যে নয়; নিজের অজান্তেই নিজেরই সব পথ বন্ধ করে

দিল বেচারী। ওর উপর ভরসা রাখতে পারেনি মেয়েটা। একটি মাত্র কারণে ওর প্রভুরা এখনও খুন করেনি ওকে—ওরা জানে এই হত্যার সাথে জড়িয়ে দেবে রানা ওদের।

এখন আর কোন বাধাই রইল না।

তিন

বন্দরের কাছেই বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপার হ্যাভেঞ্জবো। এর ছাতে দাঁড়ালে গোটা অ্যামস্টার্ডাম শহরটা দেখতে পাওয়া যায় এক নজরে। চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ওঠেনি রানা এখানে।

জোর হাওয়া বইছে সমুদ্রের দিক থেকে। শীতল। ঝলমল করছে চারদিক উজ্জ্বল রোদে। উদ্বেল সমুদ্রে ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। রানার চোখে বিনকিউলার। চেয়ে রয়েছে দূর সমুদ্রের দিকে।

অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে গেছে রানা। কাঁধে ক্যামেরা, হাতে বিনকিউলার—আর সব ট্যুরিস্টদের থেকে আলাদা করবার কোন উপায় নেই। এপাশ-ওপাশ থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ের ধ্বনি ভেসে আসছে ওর কানে, হাওয়ায় উড়ছে মহিলা ট্যুরিস্টদের চুল, একদল আসছে, দেখছে ঘুরে ফিরে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে আরেক দল, কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রানার। স্থির হয়ে রয়েছে ওর দৃষ্টিটা বহুদূরের একটা কোস্টারের উপর। এক হাজার কি বারোশো টনের কোস্টাল স্টীমার, বাঁকা হয়ে ঘুরে ধীরগতিতে গদাই লশকরী চালে এগোচ্ছে জেটির দিকে। এতদূর থেকেও বেলজিয়ান ফ্ল্যাগ দেখতে পেল রানা পরিষ্কার, বাতাসে উড়ছে আগুনের শিখার মত। বয়াগুলোর একেধারে ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে কোস্টারটা। কেন?

অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ করল রানা ওটার গতিবিধি, ঘাটের কাছে এসে নোঙর ফেলা। ঘড়ি দেখল। দুপুর দেড়টা। ক্যাপ্টেনের সময়জ্ঞান যে টনটনে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আইন শৃঙ্খলাবোধ যে তেমনি ঢিলে তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবছা হলেও নামটা পড়তে পারছে রানা এখন, হলুদ রঙ দিয়ে লেখা আছে ওটার গায়ে—মেরিনো।

এপাশের বার্জ-বন্দরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালমত দেখে নিয়ে নেমে পড়ল রানা অবজার্ভেশন টাওয়ার থেকে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখ পড়ল ওর হ্যাভেন রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডের উপর। খিদে নেই, তবু ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে—চাট্টে খেয়ে নেয়া দরকার। পরে আর কবে কখন সুযোগ হবে কে জানে।

দুপুর দুটোর দিকে পৌঁছুল রানা হোটেল প্লাযায়। ডেস্কে জানা গেল ফেরেনি এখনও সোহানা বা মারিয়া। লাউঞ্জে অপেক্ষা করবে, বলল রানা লোকটাকে। একটা সোফায় গিয়ে বসল ও, কিন্তু রিসেপশনিস্ট একটু

অন্যমনস্ক হতেই চট করে উঠে পড়ল লিফটে। চারতলায় উঠে সোজা গিয়ে ঢুকল সে সোহানাদের কামরায়। দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল একটা আরামকেদারায়। গদিটা একটু নরম ঠেকল—বোঝা গেল, আগের হোটেলের চেয়ে এটার স্ট্যান্ডার্ড কিছুটা উঁচু; ওটা যদি উনিশ হয়, এটা বিশ।

ঘণ্টাদেড়েক শুয়ে শুয়ে পাতা ওল্টাল রানা ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানী থেকে পাওয়া ইনভয়েস ফাইলের। বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের মাল সাপ্লাই পেয়েছে এরা। কিন্তু কয়েকশো ইনভয়েস ঘাঁটতেই একটা নাম ঠিকানা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল রানার। গত ছয়মাসে কমপক্ষে বিশ বার মাল সাপ্লাই দিয়েছে এরা এই কোম্পানীকে। মালের ধরনটা রানার ধারণার সাথে মিলে গেল অনেকটা—মনে মনে বারকয়েক উচ্চারণ করে ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল সে।

ক্লিক শব্দ তুলে তালা খুলল দরজার, ঘরে ঢুকল সোহানা আর মারিয়া। রানাকে দেখামাত্রই একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল দু'জনের চোখেমুখে, পরমুহূর্তে বিরক্ত ভঙ্গিতে ভ্রূ কোঁচকাল ওরা একসাথে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ব্যাপার? ঘটনা আছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আমাদের এরকম বোকা বানাবার কি অর্থ?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল মারিয়া। 'ডেস্কের লোকটা বলল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন আপনি আমাদের জন্যে…এটা কি লাউঞ্জ হলো?'

'আধঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকলাম আমরা লাউঞ্জে,' বলল সোহানা। 'চলে গেছ মনে করে ফিরে এলাম ঘরে। না এলে আরও কয়ঘণ্টা বসে থাকতে হত ওখানে কে জানে!'

'ক্লান্তি লাগছিল খুব, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম,' বলল রানা। 'যাই হোক, মাফটাফ চাওয়া হয়ে গেল, এবার শোনা যাক কে কতদূর কি করলে?'

'কোথায় মাফ চাওয়া হলো?' একেবারে আকাশ থেকে পড়ল মারিয়া। 'একটু নরম করে কথা বলা মানেই মাফ চাওয়া এবং পাওয়া হয়ে গেল?'

'বসদের জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট। এবার কাজের কথা কে শুরু করবে, তুমি, না সোহানা?'

'খুব বেশি কিছু বলবার নেই। আপনার সেই বিট্রিক্স শেরম্যান…'

'পালিয়েছে। তোমাদের মেসেজ পেয়ে আমি খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। ভেগেছে।'

'ভেগেছে মানে?'

'দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

'দেশ ছেড়ে পালিয়েছে?'

'এথেন্সে।'

'কেন?'

'ভয়ে। ওর এক কাঁধে ভর করেছিল খারাপ লোক, আরেক কাঁধে ভাল লোক—মানে, আমি। দিশে হারিয়ে একেবারে পগার পার হয়ে গেছে।'

'কি করে জানলে যে সত্যিই পালিয়েছে ও?'

'ব্যালিনোভার ম্যানেজারের কাছে শুনলাম, তারপর এয়ারপোর্টে ফোন করেও জানা গেল, ব্যাপারটা সত্যি।'

'বেশ। তাহলে একটা ঝামেলা চুকল। এবার অন্য কাজের রিপোর্ট দেয়া যাক। কারটা শুনবে আগে···আমি, না মারিয়া।'

'আগে এটা দেখো।' একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল রানা সোহানার দিকে। তার উপর স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে 910020। 'দেখো তো এর কোন অর্থ বের করা যায় কিনা?'

নানান ভাবে দেখল সোহানা নম্বরটা—সোজা করে, উল্টে নিয়ে, কাত করে। কাগজের উল্টোপিঠ দেখল। তারপর মাথা নাড়ল। 'নাহ্। আমার মাথায় ঢুকছে না কিছু।'

'দেখি, আমি দেখি?' হাত বাড়াল মারিয়া। 'ক্রসওয়ার্ডে আমার তুলনা হয় না।' সত্যিই তুলনা হয় না। কাগজটা হাতে নিয়ে তিন সেকেন্ড ওটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'নম্বরটা উল্টে নিন। জিরো টু ডাবল জিরো ওয়ান নাইন। রাত দুটো, উনিশ তারিখ। অর্থাৎ আগামীকাল রাত দুটো। ঠিক এগারো ঘণ্টা পর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল রানার চোখে। মুখে বলল, 'দারুণ!' মারিয়া যেটা তিন সেকেন্ডে বুঝে ফেলেছে সেটা বের করতে ওকে প্রায় দেড়ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়েছিল।

'কি ঘটতে চলেছে?' সরাসরি জানতে চাইল সোহানা।

'লেখক সেটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে।' সোহানা, মারিয়া দুজনেই বুঝল কিছু একটা চেপে যাচ্ছে রানা ওদের কাছে, এ-ও বুঝল যে রানা জানে যে ওরা বুঝে ফেলেছে। কাজেই আপাতত চুপ করে রইল ওরা দু'জনেই। রানা বলল, 'মারিয়া তুমি ফার্স্ট হয়েছ, তোমার রিপোর্ট দিয়েই শুরু করা যাক।'

'এই নতুন ড্রেসটা পরলাম, কারণ এটা ইরিন দেখেনি আগে। বাতাস ছিল, একটা স্কার্ফও জড়িয়ে নিয়েছিলাম মাথায়। সেইসাথে···'

'একটা গাঢ় রঙের সানগ্লাস পরে নিয়েছিলে চোখে।' বলল রানা।

'হ্যাঁ।' রানার সানগ্লাসের কথা বলবার অর্থ: আজেবাজে বিবরণ বাদ দিয়ে আসল কথায় এসো, বুঝল মারিয়া, কিন্তু পাত্তা দিল না। অফিশিয়াল রিপোর্টে কোথাও ফাঁক রাখবার অভ্যেস তার নেই, একেবারে নিখুঁতভাবে কর্তব্য পালন করতে না পারলে ভাল লাগে না ওর। বলল, 'একটু আগেই চলে গিয়েছিলাম। আধঘণ্টা রিটায়ার্ড বুড়ো আর বাচ্চাদের প্র্যামের ভিড় বাঁচিয়ে ঘুরলাম এদিক ওদিক। তারপর দেখতে পেলাম ওকে। ওকে ঠিক না, ওর সাথের সেই বিশাল মোটা বুড়িটাকে। ঠিক পুতুলের মত ড্রেস। পাশেই ইরিন। সাদা একটা ফুলহাতা কটন ড্রেস পরেছে, কোথাও একদণ্ড স্থির থাকতে পারছে না, সর্বক্ষণ তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে বাচ্চা ছাগলের মত।' একটু থেমে বলল, 'মেয়েটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দরী।'

'তোমার অন্তরটা মহৎ, মারিয়া।'

ইঙ্গিতটা বুঝল মারিয়া। বলল, 'যাই হোক, খানিক ঘোরাঘুরি করে, পায়রাদের বুট খাইয়ে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল ওরা। আমিও গজ তিরিশেক দূরে একটা বেঞ্চে বসে একটা ম্যাগাজিনের উপর দিয়ে চোখ রাখলাম ওদের ওপর। ডাচ ম্যাগাজিন।'

'চমৎকার! তারপর?'

'তারপর পুতুলের চুল আঁচড়াতে শুরু করল ইরিন। আমি...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। পুতুল? পুতুল কিসের?'

'বলিনি বুঝি? বড়সড় একটা পুতুল ছিল ওর হাতে। চুল আঁচড়াচ্ছে, এমনি সময় দোহারা চেহারার একজন লোক এসে বসলেন ওদের পাশে। কালো একটা ওভারকোট, প্রিস্ট কলার, সাদা গোঁফ, মাথাভর্তি ধবধবে পাকা চুল। খুব ভাল লোক বলে মনে হলো।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। রেভারেন্ড ডক্টর নিকোলাস রজারকে ভাল না লেগে উপায় নেই কারও।

'ইরিনকে মনে হলো ভদ্রলোকের খুব বড় ভক্ত একজন। আপনাকে যেভাবে ধরেছিল, সেইভাবে জড়িয়ে ধরল বুড়ো লোকটার গলা, কানে কানে কি যেন বলল। ভদ্রলোক কথাটা শুনে এমন ভাব করলেন যেন চমকে গেছেন মেয়েটার প্রস্তাবে। আসলে ভান। হাসিমুখে পকেট থেকে কি যেন বের করে গুঁজে দিলেন ইরিনের হাতে। খুব সম্ভব পয়সা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, লাফাতে লাফাতে ছুটল একটা আইসক্রীম ভ্যানের দিকে। আইসক্রীম কিনে সোজা হাঁটতে লাগল আমার দিকে।'

'তুমি ভাগলবা?'

'আরও খানিকটা উঁচু করে ধরলাম ম্যাগাজিনটা।' গম্ভীরভাবে বলল মারিয়া। 'আমার সামনে দিয়ে চলে গেল ও বিশ গজ দূরে দাঁড়ানো আরেকটা খোলা ভ্যানের দিকে!'

'পুতুল দেখতে?'

'আপনি জানলেন কি করে?' জানা খবর জানাচ্ছে মনে করে হতাশ হয়ে পড়ল মারিয়া।

'আন্দাজ। অ্যামস্টার্ডামে ভ্যান বলতে প্রতি দুটোর মধ্যে একটা পুতুল বিক্রির ভ্যান বোঝায়।'

'তারপর পুতুল ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল মেয়েটা। কোনটা কোলে নেয়, কোনটাকে চুমো খায়। ফেরিওয়ালা বুড়ো রেগে ওঠার চেষ্টা করল বারকয়েক, কিন্তু অমন একটা মেয়ের ওপর কি রাগ করা যায়? ভ্যানের ওপাশে চলে গেল মেয়েটা। কোলের পুতুলটাকে আইসক্রীম সাধছে বারবার।'

'এই সময়ে বুড়ো আর বুড়ি কি করছিল?'

'গল্প করছিল। নাকে-মুখে কথা বলছিলেন বুড়ো ভদ্রলোক, মাথা ঝাঁকাচ্ছিল বুড়ি। খানিক বাদেই ফিরে এল ইরিন। তিনজনে গল্প করল আরও কিছুক্ষণ, তারপর ইরিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে উঠে পড়লেন প্যাসটর, বাকি

দুজনও রওনা হয়ে গেল বাড়ির পথে।'

'প্যাসটর আলাদা, বাকি দুজন আলাদা?'

'হ্যাঁ।'

'এদের কাউকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলে?'

'না।'

'গুড গার্ল। তোমাকে কেউ অনুসরণ করেছিল?'

'মনে হয় না।'

'অর্থাৎ, শিওর না?'

'অনেকেই সেই সময় পার্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। কেউ অনুসরণ করছে কিনা বোঝার উপায় ছিল না। নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে ফিরে আসবার সময় সোহানার সাথে দেখা হয়ে গেল মাঝপথে, তিনবার ট্যাক্সি আর দুইবার ট্রাম বদলে এই হোটেলে পৌঁছেছি—মনে হয় না, কেউ অনুসরণ করতে পেরেছে।'

'এবার সোহানা।' সোহানার দিকে ফিরল রানা।

'হোস্টেল প্যারিসের ঠিক উল্টোদিকে একটা কাফে আছে। সেটার মধ্যে ঢুকে বসেছিলাম আমি। অনেক মেয়েই ঢুকল বেরোল। চতুর্থ কাপ কফি শেষ করে একটা মেয়েকে পেয়ে গেলাম—কাল রাতে দেখেছি ওকে গির্জায়। লম্বা, ব্রুনেট, দারুণ দেখতে—তুমি একবার দেখলেই...'

'প্রেমে পড়ে যেতাম? অসম্ভব। তোমাদের দুইজনের প্রেমেই অস্থির হয়ে আছি, প্রাণ যায় যায়। আপাতত আর কারও প্রেমে পড়ার তেমন ইচ্ছে নেই। কাল নানের বেশে দেখেছ তুমি ওকে। কি করে বুঝলে ব্রুনেট কিনা? চুল তো আর দেখতে পাওনি?'

'বাম গালে একটা আঁচিল ছিল মেয়েটার।'

'লাল আঁচিল? চীফ বোনের উপর না? সবুজ চোখ?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই মেয়েটাই। ধিঙ্গিমার্কা হাঁটা।' হাল ছেড়ে দিল রানা। বুঝল, এসব ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ পোষণ করবার কোন মানে হয় না। অকপটে আস্থা রাখা যায় মেয়েদের উপর। এক সুন্দরী মেয়ে যখন আরেক সুন্দরী মেয়েকে দেখে তখন লঙরেঞ্জ দূরবীন হয়ে যায় ওদের চোখ। 'ওই মেয়েটার পেছন পেছন ক্যালভারস্ট্রাটে গিয়ে পৌঁছুলাম,' বলে চলল সোহানা। 'বিরাট একটা দোকানে ঢুকল মেয়েটা। প্রথমটায় মনে হলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আবোলতাবোল, কিন্তু দেখলাম খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই, "সুভ্যেনির, এক্সপোর্ট ওনলি" লেখা একটা কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। এটা-ওটা-সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করছে ঠিকই, কিন্তু পাপেটগুলোর প্রতিই যে ওর আসল আগ্রহ বুঝতে পারলাম আমি পরিষ্কার।'

'চমৎকার!' বলল রানা। 'আবার সেই পুতুল। কি করে বুঝলে ওর আগ্রহটা ওই দিকেই?'

'এমনিই বুঝতে পারলাম,' এমন সুরে বলল সোহানা যেন জন্মান্ধকে

রঙের পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা করছে। 'দেখলাম, বিশেষ এক ধরনের পুতুলের প্রতিই ওর আগ্রহ বেশি, নাড়াচাড়া করছে। আমি বুঝলাম, ওটা লোক দেখানো, কোন্‌টা কিনবে ঠিক করাই আছে ওর মনে মনে। এটা ওটা নেড়েচেড়ে শেষ পর্যন্ত পুতুল পছন্দ করল, একজন সেলসম্যানকে কিছু বলল, লোকটা কি যেন লিখে দিল একটা কাগজের টুকরোয়।'

'কতক্ষণ লাগল লিখতে?'

'বেশি না। একটা ঠিকানা লিখতে যতটা সময় লাগে, ততটা। দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেয়েটা।'

'ওকে অনুসরণ করলে তুমি?'

'না। দেড়টায় মারিয়ার সাথে দেখা করবার কথা ছিল, তাই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটা দিলাম অন্যপথে। আমিও গুড গার্ল, না?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ অনুসরণ করেনি আমাকে।' বলেই হাসল। 'খুব সম্ভব।'

'দ্যাট্‌স্ গুড।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর ঘোষণা করল, 'ওয়েল ডান্। অকম্মার ঢেঁকি তোমরা। আই লাভ ইউ বোথ।'

চোখ মটকে পরস্পরের দিকে চাইল সোহানা আর মারিয়া। সিরিয়াস টাইপের মেয়ে মারিয়া ভ্রুকুজ। প্রথম দিকে যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সাথে গ্রহণ করেছিল রানাকে, কিন্তু গত দুইদিনে কিছুটা সোহানার কাছ থেকে শুনে, কিছুটা নিজে থেকেই পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে রানার চরিত্র। পৃথিবীর সেরা দশজন স্পাইয়ের একজন রানা, জানা আছে ওর, ভেবেছিল না জানি কেমন দাপট আর অহঙ্কার থাকবে লোকটার। ভয়-ভয় একটা ভাব ছিল ওর পুরো একটা দিন। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে আশ্চর্য এক করুণার ধারা রয়েছে এই গম্ভীর লোকটার বুকের ভেতর, যন্ত্র নয়—সত্যিকার মানুষের মতই মায়া-মমতা আর গভীর সহানুভূতি রয়েছে ওর মানুষের জন্যে, বাইরের শক্ত খোলসের আড়ালে রয়েছে একটা হাসিখুশি, নিরহঙ্কার অমায়িক মন, সেই মুহূর্তেই দূর হয়ে গেছে ওর সমস্ত ভয়। সোহানার মতই সহজভাবে গ্রহণ করেছে সে রানাকে। বলল, 'দ্যাট ইজ ভেরি নাইস অফ ইউ।'

'হ্যাঁ। সাধারণ দুই টাইপিস্টের পক্ষে এটাকে পরম সৌভাগ্যই বলা যায়। আচ্ছা সোহানা, যে পুতুলটা পছন্দ করল, সেটা ভালমত দেখেছ তো?'

'দেখছি। অনেক পয়সা খরচ করে অবজার্ভেশন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে।'

ভুরুজোড়া কপালে তুলে বারকয়েক পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা সোহানাকে বাঁকা দৃষ্টিতে, তারপর বলল, 'সুসংবাদ। হাইলারের কস্টিউম পরা পুতুল ছিল ওটা। ঠিক যেমনটা দেখেছিলাম আমরা ওয়েরহাউজে।'

'আশ্চর্য! তুমি জানলে কি করে?'

'বলতে পারতাম ইনটিউশন, কিংবা বলতে পারতাম অনেক পয়সা খরচ করে আন্দাজ ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে, কিংবা এটা একটা বিশেষ প্রতিভা। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে: কিছু তথ্য জানা আছে আমার যেটা

তোমরা জানো না।'

'বললেই জানতে পারি। বলে ফেলো।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল রানা।

'কেন নয়?' ভুরু নাচাল সোহানা। 'আমাদের মানুষ বলে গণ্য করো না তুমি?'

'করি। তবে ঠিক মানুষ বললে ভুল বলা হবে। তোমাদের আমি মেয়েমানুষ বলে গণ্য করি। খারাপ অর্থে নয়, ভাল অর্থেই মেয়েমানুষ। এসব কথা তোমাদের জানানো যায় না এজন্যে যে অ্যামস্টার্ডামে খুব একটা নিরাপদ নও তোমরা। এখানে এমন একটা দল আছে যারা ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময় যে-কোনখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে তোমাদের, পুরে দিতে পারে নিরিবিলি, অন্ধকার কোন কুঠুরিতে। যা জানো সব গড়গড় করে বলে দিতে বাধ্য হবে তাহলে তোমরা।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সোহানা। তারপর বলল, 'তোমাকে ধরলে তুমিও বলবে।'

'হয়তো তাই,' মেনে নিল রানা। 'নির্যাতন সহ্য করবার ক্ষমতা সবার সমান হয় না, কিন্তু সবারই একটা শেষ সীমা আছে। ওটা পেরিয়ে গেলে "আমি" ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না মানুষের কাছে। ওই পর্যায়ে গেলে হয়তো আমিও বাধ্য হব সব কথা বলতে। কিন্তু তোমরা দুজন সেই পর্যায়ে নিতে পারবে না আমাকে। আর ওদের পক্ষে আমাকে নিরিবিলি অন্ধকার কোন কুঠুরিতে পুরে দেয়া খুব একটা সহজ কাজ হবে না।' ইনভয়েসের ফাইলটা হাতে তুলে নিল রানা। 'ক্যাসটিল লিন্ডেন বলে কোন প্রতিষ্ঠানের নাম শুনেছ কখনও? শোনোনি? আমিও না। এর মধ্যে পেলাম নামটা। দেখা যাচ্ছে ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীকে প্রচুর দেয়ালঘড়ি সাপ্লাই দিয়ে থাকে এরা।'

'তাতে কি?' প্রশ্ন করল মারিয়া।

'নিঃসন্দেহ হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের সাথে। বিট্রিক্স থাকলে ওকে লাগানো যেত এই ব্যাপারে, কিন্তু ও ভড়কে গিয়ে ভেগে যাওয়ায় কাজটা আমাকেই করতে হবে এখন। ঠিক আছে, কাল দেখা যাবে, এটা নিয়ে এখন তেমন কোন চিন্তা নেই।'

'আমাদের ওপর ভার দিলে আজই সেরে রাখতে পারি আমরা কাজটা,' বলল মারিয়া। 'একদিন এগিয়ে থাকবেন তাহলে। আমরা ওই ক্যাসটিলে গিয়ে...'

'না।' সোজা মারিয়ার চোখের দিকে চাইল রানা। গম্ভীর। 'আমার নির্দেশ ছাড়া যদি কোনকিছু করতে যাও, নেক্সট প্লেনে ফিরে যেতে হবে প্যারিসে। তাও আবার হেঁটে উঠতে পারবে না প্লেনে, কফিনের মধ্যে শুয়ে পা আগে মাথা পেছনে, এই অবস্থায় উঠতে হবে। আমিও খুব খুশিমনে বিদায় দিতে পারব না তোমাদের—কারণ পুরো একটা বেলা নষ্ট হবে আমার ওই

দুর্গের পরিখা থেকে তোমাদের লাশ খুঁজে বের করতে। বোঝা গেছে?'

একসাথে মাথা নাড়ল সোহানা আর মারিয়া। ফাইলের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ব্যস, আজকের দিনের জন্যে তোমাদের ছুটি। কাল সকালে দেখা হবে, ইনশাল্লাহ।'

'আর তুমি?' রানাকে দরজার দিকে রওনা হতে দেখে চট করে ওর কোটের হাতা খামচে ধরল সোহানা। 'কাল সকাল পর্যন্ত তুমি কোথায় কি করছ?'

'বিকেলে গাড়িতে করে গ্রামের দিকে বেড়াতে যাব ভাবছি। উন্মুক্ত হাওয়ায় মাথাটা পরিষ্কার করে আনব। তারপর ঘুম। তারপর হয়তো নৌকাভ্রমণে বেরোতে পারি।'

'রাত দুটোয়?' প্রশ্ন করল মারিয়া।

চট করে ওর মুখের দিকে চাইল রানা। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে মেয়েটা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই খামচে ধরল সে রানার আরেক হাতের আস্তিন। দুজনের চোখের দৃষ্টিতে অনুনয় দেখতে পেল রানা। বুঝল, কিছু একটা টের পাচ্ছে ওরা, যেটা ও নিজে বুঝতে পারছে না।

'প্লীজ!' বলল মরিয়া। 'আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। ভয়ানক কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে আজ রাতে। আমরাও যাব। অন্তত পেছন থেকে যেন কোন অতর্কিত আক্রমণ না হয়, সেটুকু দেখতে পারব আমরা।'

'সেসব আরেকদিন দেখো। আজ না। আমার জন্যে ভেব না। বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা আমার আছে। তোমরা এই ঘরে বসে থেকেও আমার চেয়ে অনেক বেশি বিপদে পড়তে পারো। কিছুই বলা যায় না।'

'কিন্তু কথাটা শোনার সাথে সাথেই মনে হলো, কেউ যেন আমার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। আমি বুঝতে পারছি, আজ রাতে লাক ফেভার করবে না আপনাকে।'

'লাক ইজ ইনফ্যাচুয়েটেড উইথ দ্য এফিশিয়েন্ট!' মুখস্থ বুলি ঝেড়ে দিল রানা সুযোগ পেয়ে। 'আর একটা কথা। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের জন্যে ঘর থেকে যত কম বেরোতে পারো ততই মঙ্গল। যদি একান্তই বেরোতে হয়, লোকজনের মধ্যে থাকবে—এমন কোথাও, যেখান থেকে খপ করে মুখ চেপে ধরে একটানে গাড়িতে তোলা যায় না। খেয়াল রেখো, তোমাদের পরিচয় জানা হয়ে গেছে ওদের।'

'রাত দুটোর সময় যেতেই হবে তোমার ওই কোস্টারে?' এবার আক্রমণ এল সোহানার তরফ থেকে।

'কি আছে তাতে? তুমি তো জানো আমাকে, সোহানা। তুমি···'

'থেকে যাও, প্লীজ! রানা! মারিয়া ঠিকই বলেছে। ভয়ানক অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে আজ রাতে।'

'হ্যাঁ,' কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিল মারিয়া। 'সোহানা বলতে চায়, আমাদেরও তো কিছু অমঙ্গল ঘটে যেতে পারে। আজ রাতটা থেকে যান

আমাদের সাথে।'

'তুমি একা হলে সানন্দে রাজি হয়ে যেতাম, মারিয়া,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কিন্তু দুজনকে দুপাশে নিয়ে ঘুমোতে আমার খুব লজ্জা লাগে। তাছাড়া সোহানাটা দারুণ পাজি, হয়তো তোমার দিকে পাশ ফিরতেই দেবে না সারারাত, তার ওপর দেশে ফিরে যা-তা রটাবে তোমার-আমার নামে।'

এসব কথায় হাসি এল না ওদের কারও মুখে। হাল ছেড়ে দিল সোহানা। হাত ধরে টানল মারিয়ার।

'ওকে কিছু বলে লাভ নেই, মারিয়া। তার চেয়ে একখণ্ড পাথরের সাথে কথা বলা বরং ভাল। সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন, ঠেকানো যাবে না ওকে, ও যাবেই।'

কথাটা বলেই উঁচু হয়ে চট করে একটা চুমু খেলো সোহানা রানার গালে, দেখাদেখি মারিয়াও তাই করল রানার আরেক গালে। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা এপাশ-ওপাশ।

'দেখো, বসের সাথে এরকম ব্যবহার করাটা খুবই অন্যায়। এসব ডিসিপ্লিনের জন্যে খুব ক্ষতিকর। ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্বলতা তোমাদের পরিহার করবার চেষ্টা করা উচিত। বসের গালে চুমো খাওয়া কি?'

গজর গজর করতে করতে বেরিয়ে গেল রানা আর কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে।

নিজের হোটেলে ফেরার পথে দুইশীট ব্রাউন পেপার আর কিছু সুতো কিনে নিল রানা। ঘরে ঢুকে একসেট জামাকাপড় সুন্দর করে ভাঁজ করে পেপার মুড়ে প্যাকেট তৈরি করল একটা। প্যাকেটের উপর যা-তা আবোল তাবোল নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে তরতর করে নেমে এল নিচে। ডেস্কে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

'পোস্ট অফিসটা কোন্দিকে হবে বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একগাল হাসল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, নাম-ঠিকানা লেখা প্যাকেটটা দেখল। 'এসব কাজ আমাদের ওপর নিশ্চিন্তে চাপাতে পারেন, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'তা তো নিশ্চয়। কিন্তু আপাতত আপনাদের কষ্ট না দিয়ে এটা নিজের হাতে পোস্ট করতে চাই।'

'ও, আচ্ছা···বুঝতে পেরেছি।' বলল লোকটা। রানা মনে মনে বলল: কচু বুঝেছিস শালা। আসল ব্যাপার, ও চায় না বগলের নিচে প্যাকেট নিয়ে ওকে হোটেল থেকে বেরোতে দেখে কেউ অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠুক। পোস্ট অফিসের ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

পুলিস-কারের বুটে কাপড়ের প্যাকেটটা রেখে সোজা উত্তর দিকে গাড়ি হাঁকাল রানা। শহর ছাড়িয়ে চলে এল শহরতলিতে, তারপর আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলল গ্রামের দিকে। রাস্তার ডানদিকে উঁচু পাড় থাকায় দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরই অনুভব করতে পারল রানা, সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে সে এখন। বেশিদূর নেই আর হাইলার দ্বীপ। রাস্তার বামদিকে

মাইলের পর মাইল নিচু জমি দেখা যাচ্ছে—সী-লেভেল থেকেও বেশ খানিকটা নিচু। প্রকৃতির সাথে কঠোর সংগ্রাম করে এরা নিজেদের অস্তিত্ব কেবল টিকিয়ে রেখেছে তাই নয়, দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বীর জাতি হিসেবে, ভাবতে গিয়ে শ্রদ্ধাবোধ জাগল ওর অন্তরে। অনেক আগেই এদের হারিয়ে যাওয়ার কথা সাগরের তলে। ডাইক বেঁধে ঠেকিয়ে দিয়েছে ওরা শত্রুকে, বেড়ি দিয়েছে সমুদ্রের পায়ে।

একটা সাইনপোস্টে রানা দেখল হাইলার আর পাঁচ কিলোমিটার। কয়েকশো গজ গিয়েই বাঁয়ে একটা সরু রাস্তা পেয়ে সেই পথ ধরে চলে গেল আরও কয়েকশো গজ। ছোট্ট একটা গ্রাম। পোস্ট অফিস আছে, পাবলিক টেলিফোন বুদও দেখা যাচ্ছে একটা সাথেই লাগানো। পোস্ট অফিসের সামনে পার্ক করে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল রানা, দরজা আর বুট লক করে দিয়ে রওনা হয়ে গেল মেইন রোডের দিকে।

বড় সড়কে পৌঁছে রাস্তা পেরিয়ে ডাইক বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল সে। ঘাস বিছানো ঢাল বেয়ে উপরে উঠেই দেখতে পেল সে সমুদ্র। নীল জলে শেষ বিকেলের রোদ পড়ে আশ্চর্য মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বেশ জোর একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সমুদ্র থেকে ডাঙার দিকে। বহুদূরে কালো একটা রেখার মত দেখা যাচ্ছে বাঁকা তীর। তার ওপাশে জমির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এখান থেকে একমাত্র দর্শনীয় বস্তু হচ্ছে উত্তর-পূর্বদিকের মাইলখানেক দূরের একটা দ্বীপ।

এরই নাম হাইলার দ্বীপ। যদিও পুরোপুরি দ্বীপ বলা যায় না একে। এককালে এটা দ্বীপ ছিল, কিন্তু কারিগরি উন্নতির যুগে ওটাকে আর আলাদা থাকতে দেয়নি এদেশের প্রেকৌশলীরা। মেইনল্যান্ড থেকে উঁচু করে পাথরের বাঁধ তৈরি করে নিয়ে গেছে ওই দ্বীপে। বাঁধের উপর দিয়ে টারম্যাকারে চমৎকার হাইওয়ে। আদি দ্বীপবাসীদের অদ্ভুত আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ আর লোকনৃত্য দেখতে প্রতিবছর অসংখ্য ট্যুরিস্ট আসে এখানে। বাঁধের খরচ উঠে গেছে কবে!

এখান থেকে দেখে অবশ্য তেমন কিছু মোহিত হওয়ার কারণ খুঁজে পেল না রানা। দেখে মনে হচ্ছে এত নিচু যে দশ ফুট উঁচু একটা ঢেউ এলেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাড়ি-ঘর, খামার, হাট-বাজার, সব। বেশির ভাগই ধু-ধু করছে মাঠ, মাঝে মাঝে এক আধটা খামার বাড়ি, গোলা। দ্বীপের পশ্চিম দিকে মুখ করে গড়ে উঠেছে একটা ছোটখাট মফঃস্বল শহর। ওপাশে বন্দরের একাংশও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দ্বীপের বুকে বেশ কয়েকটা ক্যানেল চকচক করছে। যা দেখবার দেখে নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে এল রানা। গজ পঞ্চাশেক এগিয়েই পেয়ে গেল বাসস্ট্যান্ড। একটা সিগারেট শেষ হওয়ার আগেই শহরগামী বাস পেয়ে উঠে পড়ল সেটায়।

কার্লটন হোটেলে ফিরে এল রানা সন্ধের পরপরই। খেয়ে নিল সকাল সকাল। অ্যালার্মের কাঁটা ঠিক সাড়ে বারোটার উপর এনে খাপ বন্ধ করে ঘড়িটা ঢুকিয়ে দিল সে বালিশের নিচে। তারপর শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে। মন

থেকে সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, দূর করে দিতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না ওর। তৃতীয় মিনিট পার হওয়ার আগেই তলিয়ে গেল সে অতল গভীর ঘুমে।

ডানহাতটা রয়েছে ওর বালিশের পাশে রাখা পিস্তলের বাঁটে।

চার

ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠতেই শিকারি বিড়ালের মত চোখ মেলল রানা। নিঃশব্দে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। কাপড় পরতে পরতে কেমন যেন সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি হলো ওর পাকস্থলীতে—অনিশ্চিত জানার পথে পা বাড়াতে হলে হয় ওর এরকম। নেভি রোল-নেক জাম্পারের উপর গাঢ় ছাইরঙের ক্যানভাস জ্যাকেট চাপাল, পায়ে ক্যানভাসের হকি কেড্‌স্। একটা জিপ লাগানো প্লাস্টিকের ব্যাগে পিস্তল, সাইলেন্সার আর দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন পুরে ঢুকিয়ে দিল জ্যাকেটের পকেটে। তৈরি হয়ে নিয়ে নেমে এল সে রাস্তায় ফায়ার এসকেপের সিঁড়ি বেয়ে। সরু গলিতে জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও।

নিরাপদেই পৌঁছুল রানা গাড়ি পর্যন্ত। কেউ অনুসরণ করবার চেষ্টা করল না ওকে। ওর উপর নজর রাখবার দরকার বোধ করছে না আর কেউ কাল সন্ধে থেকে। কেন? এর একমাত্র কারণ, রানার গতিবিধি সম্পর্কে অন্য কোন উপায়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকছে শত্রুপক্ষ। বারণ করে দেয়া হয়েছে অনুসরণকারীদের। আজকে তো বিশেষ করে বারণ করা হবে যেন কোনভাবে বিরক্ত করা না হয় রানাকে। আজ ওরা জানে কোথায় চলেছে রানা। পরিষ্কার জানে রানা, ওরা জানে আজ কোথায় পাওয়া যাবে রানাকে। মনে মনে কামনা করল, রানাও যে জানে যে ওরা জানে, সেটা ওরা না জানলেই ভাল হয়।

হাঁটবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। গাড়িটা রেখে এসেছে বিকেলে হাইলার দ্বীপ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ট্যাক্সির প্রতি কেমন একটা অবিশ্বাস জন্মে গেছে ওর, কাজেই ট্যাক্সিও নেবে না। অলিগলি বেয়ে এগোল সে লম্বা পা ফেলে। সাইড স্ট্রীটগুলোতে লোক চলাচল কমে এসেছে অনেক। প্রশান্ত একটা ভাব বিরাজ করছে শহরের এই অঞ্চলটায়।

ডক এরিয়ায় পৌঁছে প্রথমে নিজের অবস্থানটা ভালমত বুঝে নিল রানা। কোন্‌দিক দিয়ে কোন্‌দিকে গেলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে বুঝে নিয়ে দ্রুত পা ফেলে বার্জ-বন্দরের পাশে একটা ঢেউটিনের গুদামঘরের গাঢ় ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘড়ির উজ্জ্বল ডায়ালের দিকে চাইল। দুটো বাজতে বিশ। বিকেলের চেয়ে আর একটু বেড়েছে বাতাসের বেগ, আরও শীতল হয়েছে। বৃষ্টি যদিও পড়ছে না, বাতাসে আর্দ্র একটা ভাব টের পেল রানা। পৃথিবীর সমস্ত জেটির ধারে সমুদ্র, আলকাতরা, ডিজেল, রশি ইত্যাদি আরও অনেক

কিছুর গন্ধ মিশে যে অদ্ভুত একটা স্মৃতি জড়ানো তীব্র গন্ধ নাকে আসে, সেই পরিচিত গন্ধ ছাপিয়েও আবছাভাবে রানার নাকে এল বৃষ্টির ভেজা ভেজা আগাম-গন্ধ। চট করে চোখ গেল ওর আকাশের দিকে। প্রায় মাঝআকাশে উঠে পড়েছে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ। খণ্ড খণ্ড মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশময়, মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে চাঁদটা, খানিক বাদেই আবার হাসছে রোগাক্রান্ত ম্লান হাসি। চাঁদ ঢাকা পড়লেও পুরোপুরি অন্ধকার হচ্ছে না, কারণ খণ্ড মেঘের ফাঁকে সারা আকাশ জুড়েই রয়েছে উজ্জ্বল তারার ঝালর।

বন্দরের দিকে দৃষ্টি বোলাল রানা। কিছুদূর বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তারপর আবছা, তার ওপাশে অন্ধকার। কয়েকশো বার্জ দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। কোনটা ছোট্ট বিশ-ফুটি, কোনটা বিশাল জাহাজের সমান। আসলে ওগুলোর দাঁড়াবার ভঙ্গিটাই শুধু এলোমেলো, হ্যাভেঞ্জবো স্কাইস্ক্র্যাপারের অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে বিনকিউলার দিয়ে ভালমত পরীক্ষা করে দেখছে রানা, বেরোবার রাস্তা রাখা আছে—প্রত্যেকটা বার্জ ইচ্ছে করলেই অলিগলি বেয়ে খোলাসমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যেও একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়েছে। বার্জগুলো ভেড়ানো রয়েছে সারি সারি ফ্লোটিং গ্যাঙওয়ের গায়ে। তীর থেকে লম্বালম্বি সমান্তরালভাবে সাগরের দিকে চলে গেছে চওড়া গ্যাঙওয়ে, প্রত্যেকটা আবার বিশগজ অন্তর অন্তর সরু গ্যাঙওয়ে দিয়ে পরস্পরের সাথে জোড়া।

চাঁদটা মেঘে চাপা পড়তেই দ্রুতপায়ে এগোল রানা একটা চওড়া গ্যাঙওয়ের দিকে। নিঃশব্দে। অবশ্য রাবার সোলের জুতো না পরে যদি আর্মি বুট পায়ে দিত তবু এখানে ওর আগমন কেউ টের পেত কিনা সন্দেহ। যদিও প্রত্যেকটা বার্জেই অন্তত কয়েকজন করে লোক আছে, এতগুলো বার্জের মধ্যে শুধু দুটো কি তিনটে কেবিন থেকে দেখা যাচ্ছে আলোর রশ্মি। কোথাও টুঁ শব্দ নেই মানুষের। বাতাসের মৃদু গোঙানি, বোটগুলোর খোলে ঢেউয়ের মৃদু চাপড়, মাঝে মধ্যে কাঠে কাঠে ঘষা লেগে ক্যাঁচকুঁচ আওয়াজ—সব মিলে নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছে। ঘুমনগরী বলে মনে হচ্ছে এলাকাটাকে, মায়াবিনীর যাদু যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে এখানকার সবাইকে। শত্রুপক্ষের কথা আলাদা। রাবার সোল কেন, তুলোর সোল পায়ে দিয়ে এলেও টের পাবে ওরা…হয়তো পেয়ে গেছে এতক্ষণে। চারপাশে চেয়ে নিয়ে চলার গতি দ্রুততর করল রানা।

চওড়া গ্যাঙওয়ে বেয়ে তিনভাগের এক ভাগ যেতে না যেতেই ফিক করে হেসে উঠল চাঁদটা। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল রানা।

পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। পঞ্চাশ গজ দূরে। ছায়ামত সিলুয়েট দেখা যাচ্ছে ওদের, কিন্তু এতদূর থেকেও টের পেল রানা বাম হাতের চেয়ে ওদের দু'জনেরই ডানহাত বেশ খানিকটা বেশি লম্বা। কিছু একটা বয়ে আনছে ওরা ডানহাতে করে।

নড়াচড়ার আভাস পেয়ে চট করে ডানপাশে চোখ গেল রানার। ডানদিকের সমান্তরাল গ্যাঙওয়ে বেয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে আরও দু'জন

লোক। এদেরও ডান হাত বেশি লম্বা। এই গ্যাঙওয়েের লোক দু'জনের চেয়ে এরা কয়েক গজ এগিয়ে আসছে।

বামদিকে দৃষ্টি ফেরাল রানা। আরও দু'জন। বাম পাশের গ্যাঙওয়েতে আরও দুটো জ্বলন্ত ছায়ামূর্তি। মনে মনে এদের নিখুঁত সমন্বয়-জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারল না রানা। প্রফেশনাল। চট করে ঘুরে পা বাড়াল সে সামনের দিকে।

চলতে চলতেই পকেট থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে জিপার খুলে বের করল রানা পিস্তলটা। সাইলেন্সার সিলিন্ডার পেঁচিয়ে নিল পিস্তলের মুখে। ওরও ডান হাতটা লম্বা হয়ে গেল বাম হাতের চেয়ে। চাঁদটা ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। দৌড়াতে শুরু করল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অনুসরণকারীরাও দৌড়াচ্ছে। কয়েক গজ গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আবার চাইল রানা পেছন দিকে। রানার ঠিক পেছনের দু'জন থেমে দাঁড়িয়েছে। পিস্তল তাক করছে কিনা প্রথমটা বোঝা গেল না, পরমুহূর্তে ছোট্ট দুটো লাল স্ফুলিঙ্গ দেখে নিঃসন্দেহ হলো রানা ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। কোন আওয়াজ নেই। কয়েকশো বার্জে ঘুমন্ত বেপরোয়া সাহসী জার্মান, ডাচ, বেলজিয়ান নাবিকদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বিপদে পড়তে চায় না ওরা। কাজ সারতে চাইছে নীরবে। মেঘের আচ্ছাদন সরে যেতেই আবার রুগ্ন হাসি দেখা দিল চাঁদের মুখে। আবার দৌড় দিল রানা। এঁকেবেঁকে।

জ্যাকেটের হাতায় টান পড়ল, জ্বলে উঠল রানার ডান হাতটা, বাইসেপের কাছে। চামড়া খানিকটা চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। আর ঝুঁকি নেয়া উচিত হচ্ছে না বুঝতে পেরে সাঁই করে পাশ ফিরল রানা, একলাফে উঠে পড়ল সরু গ্যাঙওয়েের সাথে ভেড়ানো মাঝারি আকারের বার্জের ডেকে, ছুটে গিয়ে দাঁড়াল হুইলহাউজের আড়ালে। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল অনুসরণকারীদের দিকে।

রানার ঠিক পেছনের লোক দু'জন, অর্থাৎ মাঝের অনুসরণকারী দু'জন থেমে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ইশারা করছে দুপাশের লোকদের। আগে বেড়ে ঘিরে ধরতে পারলে সহজেই খতম করে দেয়া যাবে রানাকে। ঘিরে ফেলতে চাইছে রানাকে। সত্যিই যদি সফল হয়, কাবু করে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না ওদের।

লোকগুলোর মধ্যে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের অভাব দেখে অত্যন্ত দুঃখ হলো রানার। তার চেয়ে বেশি হলো ভয়। কারণ খেলোয়াড়সুলভ না হলেও পদ্ধতিটা যে অত্যন্ত কার্যকরী, তাতে রানার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যেমন করে হোক ওদের এই ঘিরে ফেলাটা বন্ধ করতে না পারলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্রের নিচে ডুবিয়ে দেয়া হবে ওর লাশটা পাথর বেঁধে।

মাঝের গ্যাঙওয়েের লোক দু'জন আপাতত বিপজ্জনক নয়, বুঝতে পারল রানা। ওরা সামনে এগোবার চেষ্টা না করে দু'পাশের লোকদের সামনে বেড়ে ঘিরে ধরবার অপেক্ষা করবে, তারপর পেছন থেকে গুলি করবার সুবিধের জন্যে রানার মনোযোগ সামনের দিকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবে।

বামদিকের লোকগুলোর অবস্থান বোঝার জন্যে ঘাড় ফেরাল রানা।

ঠিক পাঁচ সেকেন্ড পর দেখতে পেল রানা ওদের। অনেকটা কাছে চলে এসেছে। দৌড়াচ্ছে না এখন, হাঁটছে সন্তর্পণে, বার্জগুলোর হুইলহাউজ আর কেবিনের ছায়ায় খুঁজছে রানাকে। গুলি করল রানা। প্রায় নিঃশব্দে এলোপাতাড়ি কয়েক পা ফেলে ঢলে পড়ল, ছোট্ট একটা ছপাৎ শব্দ তুলে তলিয়ে গেল একজন সাগর গর্ভে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে ওর আগেই। আবার গুলি করবার আগেই একলাফে সরে গেল দ্বিতীয় লোকটা পিস্তলের সামনে থেকে, এতই দ্রুত···যেন সাক্ষাৎ ভূত দেখতে পেয়েছে সামনে।

আবার মাঝের লোক দু'জনের দিকে চাইল রানা। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। এদিকে কি ঘটে গেছে হয়তো টেরই পায়নি। বেশ অনেকটা দূরে পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে রয়েছে এরা দু'জন। বিশেষ করে আবছা আঁধারে লক্ষ্যভেদ করবার পক্ষে বহুদূর। তবু সময় থাকতে ওদের একটু দমিয়ে দেয়ার প্রয়োজনে একটু সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা। চমকে ওঠার ভঙ্গি করল ওদের একজন, অস্ফুট একটা আওয়াজ কানে এল রানার। খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সঙ্গীর পেছন পেছন লোকটাকে বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে গ্যাঙওয়ে ছেড়ে একটা বার্জের কেবিনের পেছনে আশ্রয় নিতে দেখে বুঝল গুরুতর কিছুই নয়, সামান্য জখম করতে পেরেছে সে বড়জোর। মেঘে ঢাকা পড়ল আবার চাঁদটা। ছোট্ট মেঘ। কিন্তু আগামী দু'তিন মিনিটের মধ্যে চাঁদকে আড়াল করবে, কাছেপিঠে সে রকম আর কোন মেঘ দেখতে পেল না রানা, কাজেই এটারই সদ্ব্যবহার করতে হবে যতটা পারা যায়। ওর অবস্থান জানা হয়ে গেছে শত্রুপক্ষের, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। তিন লাফে আবার গ্যাঙওয়েতে উঠে এল সে, খিচে দৌড় দিল সামনের দিকে।

দশগজ যেতে না যেতেই ঘোমটা সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, চিৎ হয়ে মাথাটা সামান্য একটু তুলে চেষ্টা করল ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে। বামদিকের গ্যাঙওয়ে ফাঁকা। বোঝা যাচ্ছে, জীবিত লোকটার আত্মা কেঁপে গেছে চোখের সামনে সঙ্গীকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে। মাঝের গ্যাঙওয়েতে যে দু'জন ছিল, হুঁশিয়ার হয়ে গেছে তারাও, দেখা যাচ্ছে না—হয়তো সাবধানে বার্জের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে সন্তর্পণে। ডানদিকে চেয়ে অগ্রসরমান দুই ছায়ামূর্তি দেখতে পেল রানা। বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে এখনও। হাঁটার দৃঢ় ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কি ঘটে গেছে কিছুই জানে না ওরা। দেখে মনে হচ্ছে, রানার কাছে পিস্তল থাকতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও জানায়নি কেউ ওদের। কিন্তু জেনে নিতে বেশি সময় লাগল না। পরপর দুটো গুলি করল রানা। লাগল না একটাও, কিন্তু মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল ওরা। এইবার শুরু হলো আসল লুকোচুরি খেলা। ওদের থমকে দিয়ে রানা চাইল যত শিগগির সম্ভব সামনে এগিয়ে যেতে। পরবর্তী পাঁচটা মিনিট ধরে খণ্ড-খণ্ড মেঘের ছায়ার সুযোগ নিয়ে ছুটল রানা, মেঘের আবরণ সরে যাওয়ার আগেই দাঁড়াল কোনকিছুর আড়ালে, একটা

দুটো গুলি ছুঁড়ল পেছন দিকে, ছায়া পেয়ে ছুটল আবার। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে এল ওর কাছে যে এভাবে আর বেশিক্ষণ চলতে পারে না। অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা, তিনদিক থেকেই কমিয়ে আনছে দূরত্ব। ঝুঁকি নিচ্ছে না, সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগাচ্ছে কৌশলে। একজন বা দু'জন ধরে রাখছে রানার মনোযোগ, সেই সুযোগে বাকি ক'জন এগিয়ে আসছে এক বার্জের আড়াল থেকে আরেক বার্জের আড়ালে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, এক্ষুণি অন্য ধরনের কোন কৌশল যদি বের করতে না পারে, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এই লুকোচুরি খেলা। বড়জোর আর পাঁচটা মিনিট ঠেকাতে পারবে সে ওদের।

মানসপটে সোহানা আর মারিয়ার মুখ ভেসে উঠল। সত্যিই কি বিশেষ কোন ক্ষমতা রয়েছে মেয়েদের মধ্যে? নইলে অমন উদ্ভট ব্যবহার করে বসল কেন আজ একসাথে দু'জন? সত্যিই কি রানার অমঙ্গল টের পেয়েই বারণ করছিল ওরা আজ রাতে বেরোতে? আজকের রাতের বিশেষ গুরুত্ব জানা নেই ওদের, সেজন্যই অত চাপাচাপি করছিল ওরা। আজ না এলে তিনমাসের জন্য পিছিয়ে যেত রানার কাজ। কি যেন উত্তর দিয়েছিল সে মারিয়াকে?—লাক ইজ ইনফ্যাচুয়েটেড উইথ দ্য এফিশিয়েন্ট। বাহ্! চমৎকার এফিশিয়েনসি দেখাচ্ছে সে। ও আশা করেছিল বিপদ আসবে, কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি, এই ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। ভেবেছিল, অন্ধকার ছায়ায় লুকিয়ে থাকবে একজন নীরব পিস্তলধারী, কিংবা কোন নাইফ এক্সপার্ট—তাকে কৌশলে বাগে আনতে বেশি অসুবিধে হবে না। ছয়জন মিলে যে ওকে কুকুর-তাড়ানো তাড়াবে, ভাবতেও পারেনি সে। সোহানাকে বলেছিল সে, যে লোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে সে আরেকবার যুদ্ধের সুযোগ পায়। কিন্তু পালাতে পারলে তো ফের যুদ্ধের প্রশ্ন! পালাবার রাস্তা চোখে পড়ল না রানার। বিশ গজ গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে মেইন গ্যাঙওয়ে। সত্যিই কি মারা যাচ্ছে ও আজ?

মাথা ঝাড়া দিয়ে বাজে চিন্তা দূর করে দিল রানা। ভাল করেই জানা আছে ওর, জীবন-মৃত্যু এখন ওর নিজের হাতে। শুধু সাইলেন্সারটা খুলে আকাশের দিকে দুটো গুলি ছুঁড়লেই মুহূর্তে জেগে উঠবে এই বার্জ-বন্দরের শত শত নাবিক, দপ করে জ্বলে উঠবে দশ বারোটা সার্চলাইট, ওকে আর কুকুরের মত গুলি করে মারতে পারবে না শিকারিরা, নিজেরাই পালাবে লেজ তুলে। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজটা করলে এতদিনের পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত কষ্ট, সব ভেস্তে যাবে। আজ রাতের পর আর কোনদিন কোন সুযোগ পাবে না রানা—ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যেতে হবে ওকে মাথা নিচু করে বাংলাদেশে। জীবনে কোনদিন চোখ তুলে চাইতে পারবে না সে মেজর জেনারেল রাহাত খানের চোখের দিকে। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে ওর। প্রাণের ভয়ে বানের জলে ভাসিয়ে দিতে পারে না ও সবকিছু।

প্ল্যান ঠিক করে ফেলল রানা। পাগলামি। কিন্তু তাড়া করলে ভাল

মানুষও পাগলা কুকুর হয়ে যায়। এর চেয়ে ভাল কিছু মাথায় খেলল না ওর। ঘড়ি দেখল। ছয় মিনিট বাকি দুটো বাজতে। সবদিক থেকেই ফুরিয়ে এসেছে সময়। আকাশের দিকে চাইল। ছোট একটা মেঘ ভেসে আসছে চাঁদের দিকে। বড়জোর এক মিনিট ঢাকা থাকবে চাঁদটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, এই একটি মিনিট ব্যবহার করবে ওরা রানাকে খতম করে দেয়ার জন্যে—এটাই শেষ আক্রমণ। কাজেই এই একটি মিনিটের মধ্যে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করতে হবে রানার। ডেকের চারপাশে চেয়ে দেখল রানা: এ বার্জের কারগো পুরানো লোহালক্কড়। দশ ইঞ্চি লম্বা একটুকরো জি.আই. পাইপ তুলে নিল সে হাতে। আবার চাইল ঘন কালো মেঘের টুকরোটার দিকে—যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও ছোট মনে হলো মেঘটাকে। কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে টের পেল ওটার পেটটা ঠিক চাঁদের নিচ দিয়ে যাবে না, বেশ কিছুটা ডাইনে সরে এগোচ্ছে ওটা—একপাশ দিয়ে ঢাকা পড়বে চাঁদ অল্পক্ষণের জন্যে। যাইহোক, যেটুকু সময় পাওয়া যায় তাই কাজে লাগাতে হবে ওর এখন।

দ্বিতীয় ম্যাগাজিনের পাঁচটা গুলি রয়ে গেছে, অনুসরণকারীদের মোটামুটি অবস্থান লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলি করল সে পরপর পাঁচবার। আশা করল, এর ফলে ওরা যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিরুৎসাহিত হয় সেটাও লাভ। পিস্তলটা চট করে প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে জিপ লাগিয়ে পকেটে ফেলল রানা। তিন লাফে চলে এল বার্জের কিনারায়। গ্যাঙওয়েব পাঁচফুট দূরে। লাফিয়ে পড়ল গ্যাঙওয়ের উপর, আছড়ে পাছড়ে উঠে দাঁড়াতেই টের পেল, মেঘের বাচ্চা পুরোপুরিই মিস্ করেছে চাঁদটাকে।

হঠাৎ মনের ভেতর থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেল রানার। মুহূর্তে শান্ত, স্থির হয়ে গেছে ওর বুদ্ধিটা। মানুষের যখন আর কোন উপায় না থাকে তখন বোধহয় এইরকম অবস্থা হয়, শেষ মুহূর্তে উড়ে যায় ভয়ডর। একটা মাত্র রাস্তা খোলা আছে ওর সামনে, এঁকেবেঁকে ঝেড়ে দৌড় দিল সে ওই রাস্তা ধরে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে সে এঁকেবেঁকে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করছে আততায়ীর গুলি। প্রাণপণে ছুটছে রানা। আর পনেরো গজ, দশ গজ, পাঁচ গজ। সাইলেন্সড় গানের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, মুহুর্মুহু—এতই কাছে এসে পড়েছে। বারদুয়েক হ্যাঁচকা টান লাগল ওর প্যান্টে, জ্যাকেটে। হঠাৎ পেছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রানার শরীরটা, আহত ভঙ্গিতে দুই হাত উঠল আকাশের দিকে, হাত থেকে পাইপের টুকরোটা ছুটে গিয়ে পড়ল পানিতে। সাথে সাথেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে সামনের দিকে। মাতালের মত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রানা। বুকের বাম দিকটা চেপে ধরে আছে দুইহাতে। দিশেহারার মত টালমাটাল দুই পা ফেলেই ঝপাৎ করে পড়ল সে পানিতে। পড়ার আগে লম্বা করে দম নিয়ে নিতে ভুলল না।

পানিটা ঠাণ্ডা, কিন্তু হাড় কাঁপানো নয়। ঘোলাটে। তিন সেকেন্ড পরই মাটি ঠেকল রানার পায়ে। বসে পড়ল রানা। ও জানে, এক্ষুণি গ্যাঙওয়ের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াবে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা, পানির দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা

করবে সত্যিই মারা গিয়েছে কিনা, পানির নিচটা দেখবার চেষ্টা করবে টর্চ জ্বেলে। উপর থেকেই যেন ওরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় সেই চেষ্টা করতে হবে ওর। ততক্ষণ দম আটকে রাখতে পারলে হয়। কিন্তু যদি স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কেউ পানিতে নামে, তাহলে ছুরি মেরে এখান থেকে ভেগে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না ওর। একহাজার এক, একহাজার দুই, একহাজার তিন—এইভাবে পনেরো পর্যন্ত গুনেই, অর্থাৎ ঠিক পনেরো সেকেন্ড পর মাথার উপর দেখতে পেল রানা আবছা আলো। ছোট দুটো ভুড়ভুড়ি ছাড়ল সে—অর্থাৎ, এই যে, এখানে আমি। আলোটা ঘুরছে মাথার উপর। বোধহয় রক্ত দেখা যায় কিনা খুঁজছে। আরও পনেরো সেকেন্ড পেরিয়ে গেল—রানার মনে হলো পনেরো মিনিট। এবার বড়সড় একটা বুদ্বুদ ছাড়ল রানা—অর্থাৎ দমটা বেরিয়ে গেল, বিশ্বাস করো—মরে গেছি।

কিন্তু সহজে বিশ্বাস করার পাত্র নয় ব্যাটারা। আরও প্রায় মিনিটখানেক আবছাভাবে দেখতে পেল রানা মাথার উপর চলন্ত আলো। মনে মনে প্রথমে ওদের, তারপর ওদের বাপ-মা, তারপর চোদ্দ গুষ্টি তুলে গাল দিল রানা, কিন্তু সেসব পাত্তা না দিয়ে ওরা বোধ হয় পানিতে নেমে দেখা উচিত কিনা তাই নিয়ে তর্ক করছে নিজেদের মধ্যে নিশ্চিন্তে। ফুসফুসটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে রানার। হার্টবিট অনুভব করতে তো পারছেই, মনে হচ্ছে যেন শুনতে পাচ্ছে। দুই কানে তীক্ষ্ণ ব্যথা শুরু হলো। এখন যদি কেউ নিচে নেমে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়, রবিউলের মত স্বাস্থ্য হলেও পারবে না রানা তার সাথে। সহ্যের যখন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে রানা, তখনই নিবে গেল মাথার উপরের আবছা আলোটা। সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। ডানদিকে। একটা বার্জের তলা হাতে ঠেকতেই বুঝতে পারল দিক ভুল হয়নি ওর। চট করে ওটার নিচ দিয়ে ওপাশে চলে গেল সে। তারপর অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল উপরে।

ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নেয়া থেকে বহু কষ্টে বিরত রাখল রানা নিজেকে। হাঁ করে অল্প অল্প করে শ্বাস নিল নিঃশব্দে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দম ফিরে পেয়ে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে চলে এল সে বার্জের পেছন দিকটায়। গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মানুষের। হালের আড়াল থেকে উঁকি দিল গ্যাঙওয়ের দিকে। তিনজন দাঁড়িয়ে আছে, রানা ঠিক যেখানটায় অদৃশ্য হয়েছে সেই জায়গায়। একজনের হাতে জ্বলন্ত টর্চ। ডানপাশের দুজনও আসছে এই দিকে সরু গ্যাঙওয়ে বেয়ে। এপাশে দাঁড়ানো তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বাজন মাথা নাড়ল বারকয়েক, তারপর দুই হাত মাথার উপর তুলে ক্রসচিহ্ন দেখাল। ইঙ্গিতটা কার প্রতি পরিষ্কার বোঝা না গেলেও আন্দাজ করতে পারল রানা ইঙ্গিতের সাথে সাথে কাছেই একটা ডিজেল এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনে। সিগন্যাল পেয়েছে বিশেষ একটা বার্জের ক্যাপ্টেন। গ্যাঙওয়ের তিনজন রওনা হয়ে গেল পেছন দিকে। কাজ সমাধা হয়ে যাওয়ায় ব্যথাটা চেগিয়ে উঠেছে একজনের, খোঁড়াচ্ছে।

ছায়ামূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ার

অপেক্ষায় তিন মিনিট ভেসে রইল রানা হাল ধরে, তারপর নিঃশব্দে ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে এগোল শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। ক্রমেই বাড়ছে এঞ্জিনের গর্জন।

রানা যখন কাছাকাছি পৌঁছুল, ততক্ষণে গ্যাঙওয়ের সাথে বাঁধা কাছি খুলে ফেলা হয়েছে। এক্ষুণি পিছোতে শুরু করবে বার্জটা। রানা যখন ওটার গায়ের কাছে পৌঁছুল, তখন ধীরে ধীরে পেছাতে শুরু করেছে ওটা। সমুদ্র থেকে বার্জের গা বেয়ে উপরে উঠে আসা শুনতে সহজ মনে হলেও আসলে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নাট-বল্টু আঁকড়ে ধরে দুবার চেষ্টা করল রানা আছড়ে-পাছড়ে উপরে উঠে পড়বার, দুবারই হাত ফসকে পড়ে গেল আবার পানিতে। সড়সড় করে সরে চলে যাচ্ছে বার্জ পেছনদিকে। কোনদিক দিয়েই উপরে ওঠার কোন কায়দা পাচ্ছে না রানা। আশঙ্কা হলো, তবে কি এত কষ্ট, এত ঝুঁকি, সব বিফলে যাবে ওর? এতকিছুর পর একেবারে গায়ের কাছে এসে ফসকে বেরিয়ে যাবে বার্জটা?

কিছুদূর পিছিয়েই রানাকে ঠেলে নিয়ে বাম দিকে সরতে শুরু করল বার্জটা। সোজা হয়ে নিয়েই রওনা হয়ে যাবে সামনের দিকে। ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। পাগলের মত দুহাত বাড়িয়ে খুঁজছে সে অন্তত ধরে ঝুলে থাকবার মত কিছু একটা। কিছুই বাধছে না হাতে। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ একটা টায়ারের সাথে ধাক্কা খেলো রানা। ট্রাকের টায়ার। বার্জ ভিড়বার সময় বোটের গায়ে যেন চোট না লাগে সেজন্যে বাঁধা রয়েছে পেটের কাছে। মুহূর্তে রানার হতাশা রূপান্তরিত হলো স্বস্তির হাসিতে। সামনের দিকে চলতে শুরু করল বার্জ। টায়ারের গায়ে পা বাধিয়ে উঁচু হয়ে ধরে ফেলল রানা বার্জের একটা ক্যাপস্টান, সাবধানে মাথা তুলে চাইল চারপাশে।

হুইলহাউজের জানালা দিয়ে মাথা বের করে নেভি-ক্যাপ পরা একজন লোক কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে একজন নাবিককে। লোকটা চলে গেল সামনের দিকে। উঠে পড়ল রানা উপরে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল হুইলহাউজের দিকে। হুইলহাউজের সাথেই লাগানো ক্রুদের কেবিন। লোহার মই বেয়ে কেবিনের ছাতে উঠে পড়ল রানা, তারপর অতি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে চলে এল হুইলহাউজের মাথায়। নেভিগেশন লাইট জ্বলে উঠল হুইলহাউজের ছাতের দুইধারে। কিন্তু তাতে বিচলিত হলো না রানা। ওই আলো দুটো জ্বলে ওঠায় ও যেখানে শুয়ে আছে সে জায়গাটা আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে।

আরও কিছুটা গভীর হলো এঞ্জিনের শব্দ। খোলা সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে এখন বার্জটা।

পিস্তলটা বের করে তৃতীয় ম্যাগাজিন পুরল রানা। মাথার পাশে ওটা রেখে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। স্মৃতি রোমন্থনে মন দেয়ার চেষ্টা করল সে ভাঙা চাঁদের দিকে চেয়ে। আসলে সময় কাটাতে চায়। কিন্তু কিসের কি! খোলা সমুদ্রে পড়তেই প্রচণ্ড শীতের ঠেলায় উড়ে গেল সব স্মৃতি। নিদারুণ কঠোর বাস্তব ছাড়া আর কিছুই ছাপ ফেলতে পারছে না ওর বর্তমান চেতনায়।

অতীত-ভবিষ্যৎ সব এখন ওর কাছে অর্থহীন।

পাঁচ

শীত কাকে বলে টের পেল রানা আজ হাড়ে হাড়ে।

আজ রাতে সমুদ্র যাত্রায় যাবে সেটা জানা ছিল ওর, কিন্তু যাত্রার শুরুতেই যে এইভাবে ভিজতে হবে কল্পনাও করতে পারেনি। ওর মনে হলো শীতে জমেই মারা যাবে সে আজ রাত ফুরোবার আগে। যাইডার যীর নিশিরাতের হাওয়া আগাগোড়া লেপমুড়ি দেয়া লাশেরও সারা শরীরে কাঁপন তুলে দিতে পারে—রানা রয়েছে ভেজা কাপড়ে। হিমশীতল বাতাসে খানিক বাদেই মনে হলো জমাট বরফে পরিণত হয়েছে ওর শরীরটা। শুধু বরফ নয়, কম্পমান বরফ। প্রাণপণ শক্তিতে দাঁতে দাঁত চেপে না রাখলে এতক্ষণে ওর চারপাশে জমায়েত হয়ে যেত বার্জের সব লোক খটাখট ক্যাপীরের শব্দে।

অ্যামস্টার্ডামের বাতিগুলো নিষ্প্রভ হতে হতে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল বহুদূরে। রানা লক্ষ করল, বেলজিয়ান কোস্টার মেরিনোর মতই এই বার্জটাও একেবারে বয়াগুলোর গা ঘেঁষে এগোচ্ছে। দুটো বয়ার গা ঘেঁষে পার হয়ে তৃতীয় একটার দিকে প্রায় সোজাসুজি রওনা হলো বার্জটা। মনে হচ্ছে সোজা গিয়ে চারশো গজ দূরের ভাসমান বয়ার সাথে ধাক্কা খাবে।

হঠাৎ এঞ্জিনের শব্দ কমে গেল। মাথাটা সামান্য উঁচু করে চারপাশে চাইল রানা। দুজন লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ডেকের উপর। চট করে মাথা নিচু করে হুইলহাউজের ছাতের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু এদিকে এল না লোক দু'জন। দ্রুতপায়ে চলে গেল ওরা সামনের গলুইয়ের দিকে। কি করছে দেখবার জন্যে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল রানা পাশ ফিরে।

একজন লোকের হাতে ছয়ফুট লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা দেখতে পেল রানা, দু'মাথায় রশি বাঁধা। গলুইয়ের কাছে গিয়ে দুজন ধরল রডের দুপাশের রশি, দুজনেই একটু একটু করে ছেড়ে পানির লেভেল পর্যন্ত নামাল রডটাকে, তারপর হুইলহাউজের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। চোখ তুলে বয়াটার দিকে চাইল রানা, বিশগজ আছে আর। বার্জটাকে এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে ঠিক বয়াটার পাঁচফুট দূর দিয়ে চলে যাবে। গতি অনেক কমে গেছে। হুইলহাউজ থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আদেশ শুনতে পেল রানা। সাথে সাথেই রশি ছাড়তে শুরু করল লোক দুজন। সড়সড় করে চলে যাচ্ছে রশি ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে দিয়ে। একজন গুনছে এক, দুই, তিন করে। রানা বুঝল, দুটো রশিতেই সমান দূরে দূরে একটা করে গিঁঠ দেয়া আছে। গোণা হচ্ছে এই জন্যে যে দুইজনকেই সমান ঢিল দিতে হবে রশিতে, আগে পরে হলে চলবে না—সমান্তরাল রাখতে হবে লোহার রডটা।

বার্জটা ঠিক যখন বয়ার পাশাপাশি এল, নিচু গলায় কি যেন বলে উঠল দুজনের মধ্যে একজন। সাথে সাথেই রশি ছাড়া বন্ধ করে ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল ওরা। কি উঠে আসবে মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে রানা, বুঝে গেছে কায়দাটা, কিন্তু তাই বলে চোখ ফেরাতে পারল না। গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে সে ওদের কার্যকলাপ।

প্রথমে পানির উপর ভেসে উঠল একটা দু'ফুট লম্বা সিলিন্ডার আকৃতির বয়া, তারপর উঠল বয়ার সাথে বাঁধা ছোট্ট একটা চার-আংটার নোঙর। এই নোঙরের সাথেই আটকে আছে লোহার রডটা। নোঙরের পর উঠে এল রশি বাঁধা একটা বাক্স। দেখে মনে হচ্ছে টিনের তোরঙ্গ। তিনফুট লম্বা, দুইফুট চওড়া, দেড়ফুট উঁচু। বাক্সটা চট করে কাঁধে তুলে নিল একজন, প্রায় দৌড়ে চলে গেল কেবিনের ভেতর। দ্বিতীয়জন বয়া আর নোঙরটা নামিয়ে দিল আবার পানিতে। সাথে সাথেই আবার বেড়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন, পূর্ণবেগে ছুটছে বার্জ যাইডার যী ধরে হাইলার দ্বীপের দিকে। পুরো ব্যাপারটা এতই দক্ষতার সাথে এতই নিপুণভাবে ঘটে গেল যে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না বহুদিনের অভ্যাসে একেবারে রপ্ত হয়ে গেছে প্রক্রিয়াটি ওদের। একেবারে সামনে থেকে না দেখলে কারও বোঝার উপায় নেই কি ঘটে গেল। কাল দুপুরে মেরিনোকে বয়াগুলোর কাছ ঘেঁষে এগোতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু রানাও বুঝতে পারেনি, জায়গামত বাক্সটা নামিয়ে দেয়াই ছিল ওটার আসল উদ্দেশ্য।

সময় বয়ে চলল। ঘটনাবিহীন। ঠকঠক করে কাঁপছে রানার সর্বশরীর, মাঝে মাঝে কুকুরের গা ঝাড়া দেয়ার মত করে শিউরে শিউরে উঠছে। এত কষ্ট জীবনে পায়নি সে কোনদিন। মনে মনে স্থির করল, যদি প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারে, তাহলে অন্তত দুমাসের বেতন এক সাথে করে পুরানো গরম কাপড় কিনবে সে সদরঘাটের পাইকারদের কাছ থেকে—দান করবে স্টেডিয়ামের অর্ধ উলঙ্গ লোকগুলোকে। কথাটা মাথায় আসতেই আরও কিছু সংশ্লিষ্ট চিন্তা এসে ভিড় করতে চাইল ওর মনের মধ্যে। একজন মাসুদ রানা তার দু'মাসের কেন, সারা বছরের বেতন দিয়ে গরম জামা কিনে বিলিয়েও প্রয়োজন মেটাতে পারবে না স্টেডিয়ামবাসীদের। কয়জনকে দেবে সে? যারা পেল, তাদের শীতটা না হয় কিছুটা প্রশমিত হলো—খিদেটা? গরম পেলেই কি খিদেটা মিটবে? কয়জনকে খাওয়াতে পারবে সে? কতদিন? খাওয়ার পর চাই শিক্ষা, তারপর চাই কাজের সুযোগ। ধুত্তোর বলে ক্ষ্যান্ত দিল রানা। ঠিক করল কাউকে কিচ্ছু দেবে না। এটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা—রাজনৈতিক সমাধান বের করতে হবে এর। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। যাদের উপর নেতৃত্বের ভার রয়েছে তারা করুক একটা কিছু, বের করুক সমাধান। এই নিদারুণ দারিদ্রের পীড়ন থেকে ওরা যদি দেশবাসীকে মুক্তি দিতে না পারে গদি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে না কেউ, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যেই ওদের উচিত মানুষের মঙ্গলচিন্তায় মন দেয়া, একটা কিছু পথ বের করে সেই পথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়া। তা তারা করবেও। বাধ্য হবে

করতে। আজ না হোক, কাল।

এই পর্যন্ত এসে আবার হোঁচট খেলো রানা। সত্যিই কি তাই? তাহলে দিনের পর দিন এক পা দুই পা নয়, দশ পা বিশ পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন দেশটা? নিজেকে রাজনীতির বাইরে ভাবলেই কি ওর দায়িত্ব শেষ? ওর নিজের করবার কিছুই নেই?

আপাতত শীতে ঠকঠক করে কাঁপা ছাড়া আর কি করবার আছে বুঝতে পারল না রানা। ভেবেছিল, এই কষ্টের বাড়া আর কোন কষ্ট হতেই পারে না, কিন্তু ভোর চারটের দিকে ভুল ভাঙল ওর। ঠিকই বলেছিল মারিয়া: আজ রাতে লাক ফেভার করবে না ওকে। বরফকে হার মানায় এমনি বৃষ্টি নামল মুষলধারে। শরীরের তাপে ভেজা গেঞ্জি যাও বা একটু শুকিয়ে এসেছিল, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল আবার। শুধু ঠাণ্ডা নয়, একেকটা ফোঁটা তীরের মত এসে বিধছে চোখে মুখে। দশমিনিট ভেজার পর হঠাৎ ভয় পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা। অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর সারা শরীর। গায়ের চামড়ায় চিমটি কেটে দেখল—মনে হলো চামড়ার গ্লাভসের উপর চিমটি কাটছে। আর কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকলে নড়াচড়ার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে সে।

এদিকে ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে পুব আকাশে। আর বেশিক্ষণ হুইলহাউজের ছাদের উপর থাকাও নিরাপদ নয়। হাইলার দ্বীপের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এই বার্জের অপেক্ষায় আছে, নিশ্চয়ই আর খানিকটা আলো হলেই খুঁজবে এটাকে বিনকিউলার চোখে দিয়ে। হুইলহাউজের উপর একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখলে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে তার মন।

বুকে হেঁটে লোহার মইয়ের কাছে চলে এল রানা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এল নিচে। কেবিনের ভেতর লেপের নিচে আরামে ঘুমিয়ে থাকা লোকগুলোর কথা ভেবে তীব্র ঈর্ষা বোধ করল নিজের ভেতর। দ্রুতপায়ে চলে এল সে বার্জের গায়ে বাঁধা টায়ারের কাছে। নেমে পড়ল পানিতে। পানিতে নেমেই নিজেকে যা-তা ভাষায় গাল দিল রানা এতক্ষণ খামোকা কষ্ট করার জন্যে। চমৎকার গরম পানি। গরম মানে, আসলে ঠাণ্ডা, কিন্তু বৃষ্টির পানির তুলনায় রানার মনে হলো সাগরের পানি তো না, যেন চায়ের কাপে নেমেছে সে।

হাইলার দ্বীপের উত্তর তীর দেখা গেল। আবছাভাবে। বার্জটা দক্ষিণ পশ্চিম দিয়ে ঘুরে গিয়ে পৌঁছুবে সেই ছোট বন্দরে। এত ধীরে চলেছে যে রানার মনে হলো দুপুর হয়ে যাবে এটার বন্দরে গিয়ে ভিড়তে। তীরের দিকে চাইলে মনে হচ্ছে থেমে রয়েছে এক জায়গায়। বেলা উঠে গেলে যে ওর পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা খুবই অসুবিধেজনক হয়ে পড়বে সেদিকে লক্ষ নেই কারও।

সূর্য উঠল ভোর পাঁচটার দিকে। কিন্তু মিনিট দশেক পরেই আবার ওটাকে মেঘের নিচে ঢাকা পড়তে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। মেঘেরই জয় হলো। আরও চেপে, আরও বড় বড় ফোঁটায় চারদিক আঁধার করে যেন সারাদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে নামল আবার বৃষ্টি। টায়ার আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত

চেপে ঝুলে রইল সে গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবে।

ছ'য়টার দিকে নেভিগেশন মার্ক দেখতে পেল রানা। ঘুরতে শুরু করেছে বার্জটা ওই দিকে। এসে গেছে বন্দর। হাতটা ছেড়ে বার্জের পেটে জোড়া পায়ের একটা লাথি মেরে দূরে সরে গেল রানা। দুপাশে ঢেউ তুলে চলে গেল বার্জ সামনের দিকে, তারপর বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে গেছে রানার হাত-পা। মিনিট পাঁচেক সাঁতার কাটবার পর একটু একটু করে সাড়া ফিরে এল ওগুলোতে। নেভিগেশন মার্ক ডাইনে রেখে বন্দরের কাছাকাছি তীরে উঠে পড়ল সে। ঠিক এমনি সময়ে থেমে গেল বৃষ্টি। বুকে হেঁটে উঠে পড়ল সে ডাইকের উপর। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বন্দরের দুটো জেটি। শহরেরও অনেকখানি দেখতে পেল রানা। বেশির ভাগ বাড়িই সবুজ আর সাদা দিয়ে পেইন্ট করা। প্রত্যেকটা বাড়িই তৈরি করা হয়েছে মোটা থামের উপর। সামুদ্রিক বন্যার ভয়ে। বাড়িতে উঠতে হলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। তবে নিচটা একেবারে বেকার যেতে দেয়নি হাইলারবাসীরা, ঘিরে নিয়ে বাথরুম, কিচেন আর স্টোর করেছে। শহরের একটা রাস্তা (খুব সম্ভব এটাই অ্যামস্টার্ডাম যাওয়ার রাস্তা) ছাড়া বাকি সবগুলোই অজগর সাপের মত আঁকাবাঁকা।

জেটির দিকে চেয়ে দেখল রানা মাল খালাস শুরু হয়ে গেছে বার্জ থেকে। একটা ক্রেন আংটায় বাঁধিয়ে নানান আকৃতির কাঠের বাক্স, বস্তা তুলে আনছে বার্জের হোল্ড থেকে। কি মাল খালাস হচ্ছে সে নিয়ে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করল না রানা। ওসবের মধ্যে যে বেআইনী কিছু নেই সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। আসলে নজর রাখতে হবে ওর কেবিনের উপর। বিশেষ একটা বাক্স কোথায় যায় দেখতে হবে।

আধঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকার পর দেখা গেল দুজন লোক বেরিয়ে এল বার্জের কেবিন থেকে। একজনের মাথায় মস্ত এক বস্তা। মুচকি হাসল রানা ঠোঁট বাঁকা করে। যদিও প্রচুর খড়কুটো ভরে গোল করা হয়েছে বস্তাটাকে, দুটো দিকে পরিষ্কার চৌকোণ বাক্সের আভাস দেখতে পাচ্ছে সে। গ্যাঙওয়ে বেয়ে নেমে এল ওরা বার্জ থেকে, জেটি পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। মোটামুটি কোনদিকে যাচ্ছে ওরা বুঝে নিয়ে সড়সড় করে নেমে এল রানা ডাইক থেকে, বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলল ওদের পিছুপিছু।

ওদের অনুসরণ করায় কোন মুশকিল দেখা দিল না। ওদের চলার ভঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা গেল, ওদেরকে যে কেউ কখনও অনুসরণ করতে পারে সেই সন্দেহই জাগেনি ওদের মনে কোনদিন। আঁকাবাঁকা রাস্তায় নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চলল রানা ওদের পেছনে, একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলও না কেউ। আসলে এই কাজটা এতবার নির্বিবাদে সেরেছে যে সাবধানতার ধারটা নষ্ট হয়ে গেছে ঘষায় ঘষায়, বেআইনী কিছু করছে সে কথাই হয়তো ভুলে গেছে, এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ-রাস্তা ও-রাস্তা বেয়ে ছোট্ট শহরের উত্তর প্রান্তে চলে এল ওরা। বড়সড় একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াল। চল্লিশ গজ দূর থেকে রানা দেখল, এ বাড়িটাও অন্যগুলোর মত থামের উপর উঁচু করে তৈরি বটে, কিন্তু

এর থামগুলো রিইনফোর্সড কংক্রিটের, নিচতলার দেয়ালগুলোও টিনের নয়, পাকা। একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল লোক দুজন। দোতলার বন্ধ জানালাগুলোর শিকগুলো এত ঘন এবং মোটা যে বড় সাইজে একটা ছুঁচোও ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ। দরজায় তিনটে তালা—গুণ চিহ্নের মত করে লাগানো দুটো লোহার বারের দু'মাথায় দুটো, দরজার ভারী কড়ায় লাগানো একটা। একজন পকেট থেকে চাবি বের করে একে একে খুলে ফেলল তিনটে তালা, ভিতরে গিয়ে ঢুকল দুজন, ঠিক এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল দুজনই। বস্তাটা রেখে এসেছে ভেতরে। দরজায় তালা লাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফিরে চলল যে পথে এসেছিল সেই পথে।

স্কেলিটন চাবির গোছাটা সাথে করে না আনায় মুহূর্তের জন্যে অনুশোচনার খোঁচা লাগল রানার বুকে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল ওটা সাথে না এনে ভালই করেছে সে। একে তো ওই ঘরের দিকে মুখ করে রাস্তার এপাশে দশ-পনেরোটা বাড়ির বিশ-তিরিশটা জানালা রয়েছে, তালা খোলার চেষ্টা করতে গেলে যেকোন লোকের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ওকে দেখে যেকোন হাইলারবাসী বলে দিতে পারবে যে ও বিদেশী; তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সময় আসেনি এখনও। এখন নাড়াচাড়া করলে ধরা পড়বে চুনোপুঁটি। চুনোপুঁটির জন্যে বাংলাদেশ থেকে এতদূরে আসেনি রানা—ও ধরতে এসেছে তিমি, মারতে এসেছে হাঙর। ওই বাক্সের মধ্যে টোপ রয়েছে হাঙরের। অধৈর্য হয়ে কিছু করে বসলে একেবারে পগার পার হয়ে যাবে হাঙর-কুমির-তিমি, সব।

বন্দরটা পশ্চিমে, কাজেই গাইডবুক বা ম্যাপ ছাড়াই বুঝে নিল রানা, অ্যামস্টার্ডাম ফেরার বাস টারমিনাল পাওয়া যাবে শহরের পুবদিকে। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে গেল রানা। সরু একটা খালের ওপর দিয়ে একটা পিঠ কুঁজো ব্রিজ পেরোতে গিয়ে প্রথম সাক্ষাৎ হলো ওর সভ্য মানুষের সাথে। তিনজন মাঝবয়সী মহিলা পড়ল সামনাসামনি, প্রত্যেকেই হাইলারের বিশেষ কস্টিউম পরা। তিনজনই সহজ ভঙ্গিতে চাইল রানার দিকে, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। যেন হাইলারের রাস্তায় সাতসকালে চুপচুপে ভেজা বিদেশী দেখে দেখে চোখে ছানি পড়ে গেছে ওদের, কৌতূহলী হওয়ার কিছুই নেই।

মহিলা তিনজনকে নিরুৎসুক ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে দেখে ভেতর ভেতর ভয়ানকভাবে চমকে উঠল রানা। ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে গিয়ে নিজের কাজের মধ্যে গোটাকয়েক মারাত্মক ত্রুটি টের পেল সে। কমপক্ষে তিনটে ভুল করেছে সে গতকাল।

কয়েকগজ এগিয়েই একটা বড়সড় কার-পার্ক দেখতে পেল রানা। দুটো গাড়ি আর গোটা ছয়েক বাইসাইকেল দেখতে পেল সে পার্কে। গাড়িগুলো লক করা, কিন্তু একটা সাইকেলেও তালা বা চেইন দেখতে পেল না সে। বোঝা গেল এখানকার লোক করলে বড় ধরনের কিছুই করে, ছ্যাঁচড়া চুরি-চামারির মধ্যে নেই। আশপাশে জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখতে পেল না রানা।

গেটটা তালা মারা। তালা মেরে দিয়ে অ্যাটেনড্যান্ট নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ওপাশের ছোট্ট ঘরটায়। দেয়াল টপকে ভেতরে চলে এল রানা। এক সেকেন্ডের জন্যে অপরাধবোধ দ্বিধান্বিত করল ওকে, তারপর সবচেয়ে ভাল সাইকেলটা বেছে নিয়ে ওটাকে শূন্যে তুলে পার করল গেটের ওপাশে, গেটের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বেরিয়ে এল দেয়াল টপকে। 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করল না কেউ। উঠে পড়ল রানা সাইকেলে।

অভ্যেস নেই অনেকদিন। প্রথম কিছুক্ষণ হাত কাঁপল, তারপর পক্ষীরাজের মত ছুটল সে টারম্যাকের হাইওয়ে ধরে মূলভূমির দিকে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল সে—এটা হাঁটার চেয়ে অনেকগুণে ভাল হলো। এই চেহারা নিয়ে বাসে ওঠা ঠিক হত না কিছুতেই। বাতাস কেটে এগোনোর ফলে শীত করছে খুবই, বিশেষ করে শরীরের উপরের অংশটা আবার বরফ হয়ে যাবার উপক্রম করছে, তবু এ কষ্ট রাতের তুলনায় কিছুই না, মনে মনে নিজেকে এই সান্ত্বনা দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে প্যাডেল করে চলল রানা দ্রুতবেগে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা গ্রামের পোস্ট অফিসের সামনে। সাইকেলটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে টেলিফোনের দিকে চাইল রানা একবার, তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মত পরিবর্তন করে উঠে বসল পুলিস-কারে। এত ভোরে ওদের কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না।

বড় রাস্তা ধরে মাইলখানেক গিয়ে গাড়ি থামাল রানা, বুট থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা বের করে পেছনের সীটে বসে ভেজা কাপড় ছেড়ে পরে নিল শুকনো কাপড়, গাড়ির এঞ্জিন চালু রেখেই। হিটারটা চালু করে দিয়েছিল গাড়িতে উঠেই, এতক্ষণে গরম বাতাস ঢুকতে শুরু করেছে নানান ফোকর দিয়ে। আবার ছুটল রানা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, গাড়ির ভেতরটা গরম হয়ে ওঠায় আরাম পেয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে ওর শরীরটা, মনে হচ্ছে গাড়ি চালাতে চালাতেই ঢলে পড়বে ঘুমে। চট করে হিটার অফ করে দিয়ে গতি আর একটু বাড়িয়ে দিল সে। মাইলদুয়েক গিয়ে রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট বাংলো পাওয়া গেল, একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে— মোটেল। মোটেল হোক আর যাই হোক, খোলা দেখে ব্রেক চাপল রানা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

মোটেলের কর্ত্রী জিজ্ঞেস করল ব্রেকফাস্ট লাগবে কিনা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জঞ্জ জেনেভারের বোতলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা। কথা বলবার সাহস হলো না ওর, পাছে গলা দিয়ে আওয়াজ না বেরোয়। এই ভোরে নাশতার আগেই বোতলের দিকে রানাকে ইঙ্গিত করতে দেখে অবাক হয়ে গেল মোটা মহিলা, হয়তো বা ওর এলোমেলো ভেজা চুল দেখে ভয়ও পেল একটু, কিন্তু কিছু না বলে বোতলটা এগিয়ে দিল সে রানার দিকে, তার পাশে ঠক করে নামিয়ে রাখল একটা গ্লাস। ইঙ্গিতে মহিলাকে বোতল থেকে তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দেয়ার অনুরোধ করে রানা শুধু বলল, 'প্লীজ!' শব্দটা শোনাল পি-প্লীজের মত।

মদ ঢালা হতেই কাঁপাহাতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে গলায় ঢালতে গিয়ে অর্ধেকই পড়ে গেল রানার চিবুক বেয়ে। দ্বিতীয় গ্লাসের সিকি ভাগ পড়ল। তৃতীয় গ্লাসের থেকে এক ফোঁটাও পড়ল না বাইরে। চতুর্থ গ্লাসটা রানা যখন হাতে তুলে নিল, তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মহিলা রানার হাতের দিকে—একবিন্দু কাঁপছে না হাতটা এখন, মনে হচ্ছে পাথর দিয়ে তৈরি।

'মাই গড!' মহিলার কণ্ঠস্বরে শুধু বিস্ময় নয়, মমতারও আভাস পাওয়া গেল। 'তুমি তো দেখছি, বাছা, ভয়ানক কাহিল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলে! ভাগ্যিস এই পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পেরেছিলে, আগেই মূর্ছা যাওনি!' ব্যস্ত হয়ে পড়ল মহিলা মোটা শরীর নিয়ে। 'বসে পড়ো, বসে পড়ো। তোমার জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলছি আমি তিন মিনিটে।'

অপেক্ষাকৃত ধীরে চতুর্থ গ্লাস শেষ করে শরীরে অনেকখানি বল ফিরে পেল রানা। শরীরের ভেতর প্রবলবেগে ছোটাছুটি শুরু করেছে এখন লোহিত কণিকাগুলো। একটু সুস্থির হয়ে বাথরুম সেরে এল সে তিনমিনিটে, মোটেলের বাথরুমে একটা ইলেকট্রিক রেজর পেয়ে দাড়িগুলোও কামিয়ে নিয়েছে ঝটপট। তারপর তৃপ্তির সাথে ডিম, মাংস, পনির, চার পদের রুটি, আর গ্যালনখানেক কফি খেয়ে একটা টেলিফোন করবার অনুমতি চাইল।

ডায়াল করবার সাথে সাথেই শোনা গেল নরম পুরুষকণ্ঠ: 'হোটেল প্লাযা।'

'আমি মাসুদ রানা। সোহানা চৌধুরীকে চাই, ওদের কামরায় কানেকশন দিন।'

প্রায় এক মিনিট পর মারিয়ার ঘুমঘুম কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'হ্যালো? কে বলছেন?'

মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা মারিয়াকে, আড়মোড়া ভাঙছে রিসিভার কানে ধরে, হাই তুলছে।

'বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমোবার পারমিশন কে দিয়েছে তোমাদের?' কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা।

'কে? কি বলছেন?' রানার গলা চিনতে পারেনি মারিয়া।

'গতকাল বাকি দিনটা ছুটি দেয়া হয়েছিল, তাই বলে আজকেও বেলা দুপুর পর্যন্ত কে ঘুমোতে বলেছে তোমাদের?' রিস্টওয়াচের দিকে চাইল রানা। সকাল পৌনে আটটা। 'কয়টা বাজে সে খেয়াল আছে?'

'কে···তুমি? তুমি বলছ, রানা?'

'তাছাড়া আবার কে? মাসুদ রানা দি গ্রেট। তোমাদের প্রিয়তম প্রভু।' জঞ্জ জেনেভারের ঠেলায় তুঙ্গে উঠে আছে রানার মুড।

'সোহানা!' চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া। 'ফিরে এসেছে! আমাদের প্রিয়তম প্রভু বলছে নিজেকে!' মারিয়ার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আভাস পেল রানা।

'শোকর আলহামদুলিল্লাহ্!' দূর থেকে সোহানার গলাও শুনতে পেল রানা। 'আমাদের দোয়া কাজে লেগেছে, মারিয়া!'

ওদের দুজনকে এত খুশি হয়ে উঠতে দেখে আশ্চর্য একটা কৃতজ্ঞতাবোধ

স্পর্শ করল রানার অন্তর। গতরাতে মারা যাচ্ছিল সে আর একটু হলে, কঠোর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে ওর—এই সংগ্রাম যে কেবল নিজের জন্যে নয়, আরও মানুষ খুশি হয় ও বেঁচে থাকলে, সেটা বুঝতে পেরে হঠাৎ ভিজে এল ওর চোখের পাতা। সামলে নিয়ে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। এত বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোতে হবে না। এবার কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। কাজ আছে।'

'ঘুমোলাম কোথায়! সারারাতই তো জেগে আছি। আমাদের ক্রাইস্ট আর তোমাদের মুহামেড—দুই প্রফেটকে অস্থির করে রেখেছি দুজন মিলে সারারাত। এই তো আধঘণ্টাও হয়নি বিছানায়...'

'ভুলে যাও। সোহানা ঘরে থাকুক, তুমি ঝটপট কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ো এক্ষুণি। নো ফোমবাথ, নো ব্রেকফাস্ট। একটা ট্যাক্সি নিয়ে...'

'নো ব্রেকফাস্ট মানে? নিজে নিশ্চয়ই ভরপেট নাশতা খেয়ে উঠেছ এইমাত্র?'

'অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—ইয়েস।' মুচকি হাসল রানা। 'একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাইলার দ্বীপের দিকে রওনা হয়ে যাও।'

'হাইলার দ্বীপ মানে, যেখানে পাপেট তৈরি হয়?'

'হ্যাঁ। আমার সাথে দেখা হবে রাস্তায়। লাল-হলুদ স্ট্রাইপের একটা ট্যাক্সিতে থাকব আমি। আমাকে দেখলেই গাড়ি থামাতে বলবে ড্রাইভারকে। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিল চুকিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। মনের ভেতর কেমন যেন ফুর্তি বোধ করছে ও। বেঁচে থাকার আনন্দ। জীবনে আবার ভোর দেখতে পাবে কল্পনাও করা যায়নি গতরাতে, অথচ ভোর হলো, বেঁচে আছে সে এখনও। নিছক বেঁচে থাকবার আনন্দে এতটা উদ্বেলিত হয়নি রানা আর কোনদিন। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেরিয়ে এসে এত আনন্দ হয়নি ওর আর কখনও।

সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বের করল সে দিনের প্রথম সিগারেট।

ছয়

শহরতলির কাছাকাছি পৌঁছে একটা হলুদ ট্যাক্সির জানালা দিয়ে ড্রাইভারকে হাত নাড়তে দেখে থেমে দাঁড়াল রানা। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই প্রায় উড়ে এসে হাজির হলো মারিয়া। নেভি ব্লু স্কার্ট আর জ্যাকেট পরেছে মারিয়া, সাদা ব্লাউজ। সারারাত জেগে থাকার কোন চিহ্ন নেই চোখে-মুখে। সদ্য ফোটা ফুলের মত লাগছে ওকে।

'অপূর্ব!' বলল মারিয়া রানার মুখের দিকে চেয়েই। 'চেহারার যা ছিরি হয়েছে না! আস্ত একটা মামদো ভূত। একটা চুমো খেতে পারি?'

'না।' আত্মসম্মান বজায় রাখবার চেষ্টা করল রানা। 'বসের সাথে তার অধীনস্থ কর্মচারী...'

'হয়েছে, হয়েছে। চুপ করো।' বিনা অনুমতিতেই টুক করে একটা চুমো খেলো মারিয়া রানার গালে। 'এবার শোনা যাক, কী করতে হবে আমাকে।'

'সোজা চলে যাও হাইলারে। বন্দরের কাছাকাছি অনেক রেস্তোরাঁ পাবে, যে কোন একটায় ঢুকে সেরে নাও ব্রেকফাস্ট। তারপর একটা বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে তোমার। যতটা সম্ভব কাছে থেকে জাস্ট ওটার ওপর চোখ রাখলেই চলবে।' পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল রানা ওকে বাড়িটার অবস্থান। 'বেশি কাছে যাবে না, আর সর্বক্ষণ তৎপরতারও দরকার নেই। শুধু খেয়াল রাখবে কি ধরনের লোক ওই বাড়িতে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। মনে রাখবে, তুমি একজন ট্যুরিস্ট। লোকজনের মধ্যে, অথবা যতটা পারা যায় লোকজনের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করবে সবসময়। সোহানা কি ঘরেই?'

'হ্যাঁ।' মুচকি হাসল মারিয়া। 'পাগলের মত ভালবাসে ও তোমাকে। ভাল কথা, একটা ফোন এসেছিল আমি যখন কাপড় ছাড়ছি সেই সময়। সোহানা ধরেছিল। ভাল খবর আছে।'

'এখানে সোহানা চেনে কাকে যে কেউ ফোন করে কোন সুখবর দেবে ওকে?' একপর্দা চড়ে গেল রানার গলা নিজের অজান্তেই। 'কে ফোন করেছিল?'

'বিট্রিক্স শেরম্যান।'

'বিট্রিক্স শেরম্যান! কী যা-তা বলছ! এথেন্সে চলে গেছে ও কাল সকালে। ও আসবে কোত্থেকে?'

'ফিরে এসেছে আবার,' পরম সহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল মারিয়া। 'ও পালিয়েছিল, তার কারণ তুমি যে দায়িত্ব দিয়েছিলে ওর ওপর সেটা এখানে থেকে পালন করতে পারছিল না ও। সবসময় নাকি লোক লেগে ছিল ওর পেছনে। কাজেই এথেন্স চলে যাওয়ার ভান করে প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে আবার। হেনরীকে নিয়ে শহরের বাইরে এক বন্ধুর বাড়িতে আছে।' বিট্রিক্সের এই কৌশলে যে ওর উপর খুবই খুশি হয়েছে মারিয়া, বোঝা গেল ওর সন্তুষ্ট হাসি দেখে। 'তোমার জন্যে সুখবর: বিট্রিক্স জানিয়েছে, ক্যাসটিল লিন্ডেন সম্পর্কে তোমার সন্দেহ অমূলক নয়। তোমার নির্দেশমত ভলেনহোভেন কোম্পানীতেও গিয়েছিল ও। সেখানে যদি যাও আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার...' রানার মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেল মারিয়া। 'কি হলো!'

'হায় আল্লা!' দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে গেল রানার চেহারা। 'কি করলাম! কি করলাম এটা!'

গাড়িতে উঠে পড়েছিল রানা, কোটের আস্তিন ধরে ফেলল মারিয়া। 'কি হয়েছে? কি করেছ!'

'এক্ষুণি যাওয়া দরকার আমার, মারিয়া। এক্ষুণি রওনা হতে হবে!'

'কিন্তু হঠাৎ কি হলো? কিছুই যে বুঝতে পারছি না আমি!' আরও ভয় পেয়ে গেল মারিয়া।

'মস্ত ভুল হয়ে গেছে, মারিয়া। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়তো হয়ে গেছে এতক্ষণে। বুঝতে পারছ না—বিট্রিক্স শেরম্যান কি করে জানল তোমাদের হোটেলের নাম্বার?'

'তাই তো!' ভয়ানকভাবে চমকে উঠল মারিয়া এবার। 'হায় খোদা, সত্যিই তো! ও কি করে জানবে কোন্ হোটেলে উঠেছি আমরা?'

একলাফে গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা লাগাল রানা। পরমুহূর্তে বাঘের মত লাফ দিল গাড়িটা সামনের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রিয়ার ভিউ মিররে বিন্দুতে পরিণত হলো মারিয়া ডুক্রুজ, তারপর নাই হয়ে গেল। তুমুল বেগে ছুটে চলেছে বিশেষ এঞ্জিন ফিট করা ওপেল। শহরের যত কাছে আসছে ততই রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ছে দেখে একটা বোতাম টিপে দিল রানা। নীল ফ্ল্যাশিং লাইট চালু হয়ে গেল গাড়ির মাথায়। আরেকটা বোতাম টিপতেই শুরু হয়ে গেল সাইরেন। এবার এয়ারফোন জোড়া দুইকানে পরে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল ও রেডিও কন্ট্রোল নব। খটর-মটর আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই লাইন পাচ্ছে না রানা। এযন্ত্র কিভাবে অপারেট করতে হয় দেখে নেয়নি সে কারও কাছে, এখন দরকারের সময় এটাকে ব্যবহার করতে পারছে না দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর নিজের উপরই। একে তুমুল গতিবেগ—নজর রাখতে হচ্ছে রাস্তার উপর, একটু এদিক ওদিক হলেই যা তা কাণ্ড ঘটে যাবে, তার উপর এঞ্জিনের বিকট গর্জন, সেইসাথে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ; এই সময় কানে যদি স্ট্যাটিকের খটর-মটর কাঁ আওয়াজ আসে, মেজাজ ঠিক রাখা কারও পক্ষেই বোধহয় সম্ভব না। হঠাৎ বাজে শব্দ থেমে গিয়ে শান্ত, দৃঢ় এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানার কানে।

'পুলিস হেডকোয়ার্টার।'

'অপারেটর, এক্ষুণি আমাকে কর্নেল ডি গোল্ডের কানেকশন দিন। জলদি! আমি কে সে প্রশ্ন অবান্তর। আর্জেন্ট! এই মুহূর্তে কথা বলতে চাই আমি কর্নেলের সাথে।' দু'মিনিটের অস্বস্তিকর নীরবতা। গাড়িঘোড়া বাঁচিয়ে তুফান বেগে ছুটছে রানা। ভিড় বাড়ছে ক্রমে। তারপর ভেসে এল অপারেটরের কণ্ঠস্বর।

'কর্নেল ডি গোল্ড এখনও অফিসে আসেননি।'

'তাহলে তার বাসায় যোগাযোগ করুন।' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ইমিডিয়েট! আর্জেন্ট।' ঠিক তিন মিনিটের মধ্যে ভেসে এল কর্নেলের গম্ভীর গলা। 'কর্নেল, রানা বলছি।...হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিট্রিক্স শেরম্যানের ব্যাপারে। আমার মনে হয় মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছে মেয়েটা।... সেসব পরে শুনবেন। এক্ষুণি আপনার অ্যাকশন নেয়া দরকার।...ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে। আমার বিশ্বাস ওখানেই পাওয়া যাবে ওকে। জলদি! ফর গড্স্ সেক, জলদি করুন। ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছে মেয়েটা।'

কান থেকে এয়ারফোন খসিয়ে রেডিওর সুইচ অফ করে দিল রানা। মন দিল গাড়ি চালনায়। বারবার ধিক্কার আসছে ওর নিজের উপর, বুঝেও বুঝতে চাইছে না রানা দুর্দান্ত এক ক্রিমিনাল জিনিয়াসের বিরুদ্ধে কাজ করছে সে,

বুদ্ধির চালে হেরে গিয়ে ক্ষোভ করবার কিছুই নেই, ও নিজে যে বেঁচে আছে তাই যথেষ্ট। লোকটার চিন্তা-ভাবনা বা তৎপরতার ব্যাপারে আগে থেকে কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ওর পক্ষে—কারণ কেবল জিনিয়াস হলে এক কথা ছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভয়ানক এক সাইকোপ্যাথ। ইসমাইল আহমেদকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছিল বিট্রিক্স, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, কিন্তু সেটা ছিল হয় ইসমাইল নয় হেনরী—যে-কোন একজনকে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত! ভাইয়ের প্রাণের বিনিময়ে এই কাজটা করতে হয়েছিল বিট্রিক্সকে। তাও বাধ্য হয়ে। রানার পেছনেও ওকে লাগাবার ইচ্ছে ছিল ওদের, শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হয়েছিল ওকে হোটেল কার্লটনে। কিন্তু যখন দেখা গেল, উল্টে রানাই লেগে গেছে ওর পেছনে, অন্ধকার থেকে টান দিয়ে ওকে দিবালোকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনি অ্যাসেট না হয়ে লাইয়াবিলিটি হয়ে পড়ল বিট্রিক্স ওদের কাছে।

কিন্তু ঝট করে ওকে খুন করে ফেলবার সাহস হলো না ওদের। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন ব্যাপারটা রানার কাছে। সরাসরি বিট্রিক্সকে খতম করে দেয়ার সাহস হয়নি ওদের, তার কারণ ওদের জানা আছে যে মুহূর্তে ওরা বিট্রিক্সকে খুন করবে, রানা বুঝে নেবে যে ওর আসল উদ্দেশ্য সফল হবার নয়, এবং যেটা মনপ্রাণ থেকে চায়নি সেই কাজটা করতে হবে তখন তাকে—অর্থাৎ সোজা পুলিসের কাছে গিয়ে যা জানে খুলে বলবে সব। সেটা ওরা চায়নি। কারণ যদিও পুলিসের কাছে গেলে রানার আসল উদ্দেশ্যটা বিফল হয়ে যাচ্ছে, রানার কাছে যতটুকু তথ্য আছে সেটুকুই ওদের আগামী কয়েক মাস, এমন কি কয়েক বছরের জন্যে পঙ্গু করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে চুরমার করে দিতে পারে রানা ওদের সংগঠন। এজন্যেই ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবে অভিনয় করানো হয়েছিল গুডবডি আর স্যামুয়েলকে দিয়ে। এতই নিখুঁত অভিনয় করেছে ওরা, যে সত্যি বিট্রিক্স আর হেনরী পালিয়ে গেছে, নাকি ওদের নামে আর দুজনকে পাঠানো হয়েছে এথেন্সে, ভালমত তলিয়ে দেখবার কথা মনেই আসেনি রানার। আজ সকালে সোহানার সাথে যখন কথা বলেছে, মেয়েটার কানের উপর যে পিস্তল ধরা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিট্রিক্সকে বাঁচিয়ে রাখবার আর কোন মানেই নেই এখন। শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছে মেয়েটা। এখন যখন রানার তরফ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই, ওদের ধারণা, রাত দুটোর সময়ে বার্জ-বন্দরের সাগরতলে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে মাসুদ রানা, তখন বিট্রিক্সকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে বাধবে না ওদের। সূত্র ধরে ধরে এগিয়ে সবই বুঝতে পারল রানা—তবে দেরিতে। অনেক দেরি হয়ে গেছে ওর, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, মেয়েটাকে রক্ষা করবার আর কোন পথ নেই।

শহরের মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল রানা পাগলের মত গাড়ি হাঁকিয়ে। অবশ্য একজন লোকও চাপা পড়ল না ওর গাড়ির নিচে, তবে এজন্যে রানার যতটা কৃতিত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব এখানকার

জনসাধারণের। রানার গাড়িটা দেখামাত্র পূর্বপুরুষদের অনুকরণে প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে সবাই রাস্তা থেকে। পুরানো শহরে চলে এল সে, ওয়ানওয়ে সরু রাস্তা ধরে ছুটল ওয়েরহাউজ অঞ্চলের দিকে। কাছাকাছি গিয়েই থামতে হলো রানাকে। সামনে পুলিস ব্যারিকেড। রাস্তা বন্ধ। একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার একপাশে, জনাকয়েক অটোমেটিক রাইফেলধারী টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। জোরে ব্রেক চেপে স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি, লাফিয়ে বেরোল রানা। একজন পুলিস এগিয়ে এল কয়েক পা।

'রাস্তা বন্ধ, স্যার। পুলিস ব্যারিকেড।'

'হারি মুরা! নিজেদের গাড়িটাও চিনতে পারছ না, হাঁদারাম!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'রাস্তা ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে!'

'কাউকেই যেতে দেয়া হচ্ছে না এই রাস্তায়। রাস্তা বন্ধ।' অটল গাম্ভীর্যের সাথে বলল কনস্টেবল।

'ঠিক আছে, ছেড়ে দাও ওকে। আমাদের লোক।' কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে যাওয়ার গলিমুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ডি গোল্ড। কর্নেলের চেহারা দেখেই ছোট্ট একটা লাফ দিল রানার কলজেটা দুঃসংবাদ আশঙ্কায়। কাছে এসে বলল ডি গোল্ড, 'দৃশ্যটার দিকে চাওয়া যায় না, মেজর মাসুদ রানা। বীভৎস!'

কয়েক পা এগিয়ে গলিমুখে এসেই পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রানা। ভলেনহোভেন কোম্পানীর হয়েস্টিং বীম থেকে ঝুলছে দেহটা। গলায় রশি বাঁধা। বাতাসে দুলছে অল্প অল্প। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। সত্যিই তাকিয়ে থাকা যায় না। পাশে এসে দাঁড়াল ডি গোল্ড, আর একবার ঝুলন্ত লাশটার দিকে চেয়ে কাঁধ ছোট করে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল।

'লাশটা নামানোর ব্যবস্থা করছেন না কেন?' নিজের গলার স্বর কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকল রানার নিজের কানেই। মনে হলো, সে নয়, দূর থেকে আর কেউ বলল কথাটা। হাঁটতে শুরু করল সে সামনের দিকে।

'ডাক্তারের কাজ। গেছে একজন ওপরে।' রানার সাথে সাথে এগোল কর্নেল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। অনেকটা আপনমনে বলল, 'খুব বেশিক্ষণ ধরে ঝুলছে বলে মনে হয় না। ঘণ্টাখানেক আগেও বেঁচে ছিল মেয়েটা। ওয়েরহাউজ খোলা হয় অনেক সকালে। এত লোকজনের কেউ দেখল না...'

'আজ তো শনিবার,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল। 'শনিবার বন্ধ রাখে এরা কাজকর্ম।'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা। চরকার বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথার ভেতর। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই থেমে গেল চরকা। মনে মনে আস্ত এক ডিগবাজি খেয়ে উঠল রানা। অনুভব করল দ্রুততর হয়ে গেছে ওর হার্টবিট। ভয়ের ধাক্কায় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে যেন সে। থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল একটা।

বিট্রিক্সকে দিয়ে সোহানার কাছে টেলিফোন করাবার কি অর্থ? সোহানার

মাধ্যমে কিছু একটা জানাতে চায় ওরা রানাকে। বিট্রিক্সের মেসেজের কোন অর্থ নেই—ক্যাসটিল লিন্ডেন বা ভলেনহোভেন কোম্পানী কোথাও আসলে যেতে বলেনি ওকে রানা। সোহানা আর মারিয়ার কাছে লিন্ডেনের কথা বলেছিল সে অন্য উদ্দেশ্যে। গতরাতে সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়ে যদি কোন কারণে ওর মৃত্যু ঘটে, তাহলে যেন ক্যাসটিল নামটা কর্নেল ডি গোল্ডের কানে ওঠে তারই নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। কিন্তু বিট্রিক্সের মেসেজ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও ওই মেসেজের ভিত্তিতেই সোজা ভলেনহোভেন কোম্পানীতে এসেছে সে ওর খোঁজে। ওকে দিয়ে এই মেসেজ দেয়া প্রয়োজনই মনে করত না ওরা, যদি ওরা মনে করত মারা গেছে রানা। তার মানে, ওরা জানে বেঁচে আছে রানা। কি করে জানল? হাইলারের ওই তিন প্রৌঢ়া মহিলা ছাড়া আর কারও সাথেই তো দেখা হয়নি রানার। হয় ওরা জানিয়েছে, নয়তো অন্য আরও কোন উপায় রয়েছে ওদের রানার গতিবিধি টের পাওয়ার।

আচ্ছা, ধরা যাক, ওরা জানে বেঁচে আছে রানা। তাহলে বিট্রিক্সকে খুন করবার কি মানে দাঁড়ায়? অনেক কষ্ট স্বীকার করে রানাকে বুঝিয়েছে ওরা যে বেঁচে আছে বিট্রিক্স, পালিয়ে গেছে এখেন্সে, তারপর আবার ওকে হয়েস্টিং বীমের সাথে ঝুলিয়ে দেয়ার কি অর্থ? প্রশ্নটা মনে জাগবার সাথে সাথেই উত্তর পেয়ে গেল রানা। বিট্রিক্সকে খুন করা হয়েছে অনেক আগেই। খুব সম্ভব রাত দুটোয় রানার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে হয়েস্টিং বীমের সাথে। রানার বেঁচে থাকার সংবাদ যখন পেয়েছে ওরা, ততক্ষণে বেলা উঠে গেছে, লাশটা তখন আর নামিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। কাজেই পানিটা ঘোলা করে তোলবার জন্যেই ফোন করানো হয়েছে সোহানার কাছে আর কাউকে দিয়ে। তাড়াহুড়োয় ছোট দুটো ভুল করেছে ওরা: খেয়ালই করেনি যে বিট্রিক্সের পক্ষে সোহানা এবং মারিয়া কোন্ হোটেলে উঠেছে সেটা জানা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ওদের জানা আছে যে সোহানা বা মারিয়া কারও সাথে কখনও কোন কথা হয়নি বিট্রিক্সের, ফলে বিট্রিক্সের পরিচয়ে যে কেউ একজন ফোন করলেই চলে—কিন্তু কথাটা যে রানারও জানা আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিল ওরা প্ল্যান তৈরি করবার সময়।

যাই হোক, আসল কথা, সম্মুখ সমরে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে ওরা এবার রানাকে। জানিয়ে দিয়েছে, আর গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই, মরিয়া হয়ে শেষ ছোবলের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে গোক্ষুর। অর্থাৎ, ভীমরুলের চাকে সত্যিই ঢিল লেগেছে এবার, বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা—এবার মাসুদ রানা, ঠ্যালা সামলাও! দেখা যাক কার পাঞ্জায় কত জোর।

রশিটা ঝুলছে কেবল, লাশটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভলেনহোভেন কোম্পানীর সামনে এসে মুখ খুলল কর্নেল ডি গোল্ড। 'আপনার চেহারার এই হাল হলো কি করে, মেজর রানা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'ডাক্তারকে একটু ডেকে পাঠানো যাবে?'

'কেন যাবে না, একশোবার যাবে।' একজন সেন্ট্রিকে হুকুম দিতেই সে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল ডাক্তারকে।

অল্পবয়সী ছোকরা ডাক্তার। ফ্যাকাসে চেহারা। রানার সন্দেহ হলো, এর স্বাভাবিক চেহারা হয়তো এতটা ফ্যাকাসে না, হত্যার নির্মমতা উপলব্ধি করেই হয়তো এই হাল হয়েছে।

'বেশ অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে মেয়েটা, তাই না?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। 'শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না…ঘণ্টা পাঁচেক তো হবেই।'

'ধন্যবাদ।' বলেই ঘুরে গলিমুখের দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। সাথে সাথে আসছে ডি গোল্ড। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে রয়েছে কর্নেলের মনে, কিন্তু ঠিক কিভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বারবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইছে রানার মুখের দিকে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রানার, নিচু গলায় বলল, 'আমার জন্যেই মারা পড়ল মেয়েটা।' একটু থেমে বলল, 'হয়তো আরেকজনও মারা পড়তে যাচ্ছে আমারই ভুলের জন্যে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না,' আরেকটু বিশদ বিশ্লেষণের অনুরোধ কর্নেলের কণ্ঠে।

'মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছি হয়তো মারিয়াকে।'

'মারিয়া?'

'আপনাকে বলা হয়নি, আমার সাথে আরও দুজন মেয়ে এসেছে ইন্টারপোল থেকে। ওদের একজনের নাম মারিয়া। আরেকজন সোহানা চৌধুরী। হোটেল—' পেছন থেকে মাগেনথেলারের ডাক শুনে থেমে দাঁড়াল দুজনই। সাদা একটা ভ্যানিটিব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে সামনে এসে দাঁড়াল, ইন্সপেক্টর। রানা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগটা বিট্রিক্স শেরম্যানের?' মাগেনথেলারকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'ওটা আমাকে দিন, প্লীজ।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল মাগেনথেলার। 'এটা দেয়া যাবে না। খুনের কেসে…'

'দিয়ে দাও, মাগেনথেলার,' বলল কর্নেল। 'চাইছে যখন, নিশ্চয়ই দরকার আছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাগটা রানার হাতে তুলে দিল মাগেনথেলার। ওটা হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। বলল, 'যা বলছিলাম। হোটেল প্লাযার তিনশো চৌত্রিশ নম্বর কামরায় রয়েছে সোহানা। দয়া করে আমার হয়ে একটা টেলিফোন করবেন ওকে, কর্নেল। মস্ত বিপদে আছে ও। ওকে বলবেন, যেন দরজায় চাবি লাগিয়ে ঘরের মধ্যেই বসে থাকে যতক্ষণ না আমার তরফ থেকে কোন মেসেজ পায়। বলবেন, আমি ছাড়া আর কেউ যদি টেলিফোন করে, কিংবা চিঠি দেয়, বক্তব্যের মধ্যে যদি মাদাগাস্কার শব্দটা না

থাকে তাহলে সেসবের যেন বিন্দুমাত্র মূল্য না দেয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী—ব্যক্তিগতভাবে আপনি নিজে যদি খবরটা ওকে জানান, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'অলরাইট,' মাথা দোলাল কর্নেল। 'আমি নিজেই ফোন করব।'

কর্নেলের গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'আপনার রেডিও-টেলিফোনে হাইলারের পুলিসের সাথে কথা বলা যাবে না?'

'যাবে।' মার্সিডিজের দিকে এগোল ডি গোল্ড। 'এক্ষুণি দরকার?'

'এই মুহূর্তে।'

ড্রাইভারকে হাইলার-পুলিসের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল কর্নেল। রানা বলল, 'মারিয়াকে খুঁজে বের করতে হবে। মারিয়া ডুক্রুজ, পাঁচ ফুট দুই, লম্বা সোনালি চুল, নীল চোখ, দেখতে খুবই ভাল, স্কার্ট আর নেভি ব্লু রঙের জ্যাকেট, সাদা ব্লাউজ। হ্যান্ডব্যাগটাও সাদা। ওকে পাওয়া যাবে…'

'এক সেকেন্ড।' হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল কর্নেল ডি গোল্ড। ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে দুই সেকেন্ড পর সোজা হয়ে চাইল রানার চোখের দিকে। 'দুঃখিত। হাইলারের লাইনটা ডেড হয়ে আছে, মেজর রানা। আপনি যেদিকে পা বাড়াচ্ছেন সেদিকেই ডেথ। লক্ষণটা খুব ভাল ঠেকছে না আমার কাছে, মেজর।'

'ঠিক আছে, দুপুরের দিকে টেলিফোন করব আমি আপনাকে,' বলেই ট্যাক্সির দিকে এগোল রানা।

'আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে,' বলল মাগেনথেলার।

'নানান কাজে হাত জোড় আছে আপনার এখানেই। তাছাড়া আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে পুলিসের লোকের কোন সাহায্য দরকার পড়বে না আমার।'

'তার মানে আইনের বেড়া ডিঙোতে যাচ্ছেন আপনি,' অনুযোগের সুরে বলল মাগেনথেলার।

'এখনই আমি আইনের বাইরে রয়েছি, মাগেনথেলার। ইসমাইল আহমেদ মৃত। বিট্রিক্স শেরম্যান মৃত। এতক্ষণে হয়তো মারিয়া ডুক্রুজও মারা গেছে। আইন কি রক্ষা করতে পেরেছে ওদের? যারা আইনের বাইরে চলে তাদের সাথে মোলাকাত করতে হলে এপারে বসে থাকলে চলবে না, বেড়া ডিঙিয়ে আমাকেও যেতে হবে ওপারে।'

'সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনার পিস্তলটা আমাদের কেড়ে নেয়া উচিত,' নরম গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'এই মুহূর্তে।'

'ঠিক বলেছেন,' টিটকারির সুরে বলল রানা। 'ওটা কেড়ে নিয়ে বরং একটা বাইবেল তুলে দিন আমার হাতে। বাইবেলের বাণী শুনিয়ে ঠিক সুপথে নিয়ে আসব আমি ওদেরকে।' তেতো হাসি হাসল রানা। 'আগে আমাকে খুন করুন, ইন্সপেক্টর, তারপর পিস্তলটা দখলে পাবেন।'

কর্নেল বলল, 'আপনার কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, মেজর মাসুদ

রানা, যেগুলো আপনি গোপন রাখছেন আমাদের কাছ থেকে।'

'আমার উত্তর হচ্ছে: আছে এবং রাখছি।'

'কাজটা কিন্তু ভদ্রতা এবং আইনের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঠিক উচিত হচ্ছে কি?'

গাড়িতে উঠে বসল রানা। 'উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না তার বিচার করতে পারবেন পরে—এখন না। কিন্তু ভদ্রতা বা আইন সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি—আপাতত কেয়ার না করাই উচিত বলে মনে করছি।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই আড়চোখে লক্ষ করল রানা, দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার, একটা হাত তুলে বারণ করল ওকে কর্নেল ড্যান ডি গোল্ড। কানে এল, কর্নেল বলছে, 'যেতে দাও ওকে, ইন্সপেক্টর, যেতে দাও।'

সাত

পাগলের মত ছুটল রানা। যে স্পীডে গাড়ি চালাল, তাতে অ্যামস্টার্ডাম থেকে হাইলার পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে অন্তত আধডজন অ্যাকসিডেন্ট করবার কথা, প্রত্যেকটাই সিরিয়াস, কিন্তু ফ্ল্যাশিং লাইট আর তীক্ষ্ণ সাইরেন যাদুমন্ত্রের মত পরিষ্কার করে দিল ওর সামনের রাস্তা। সামনের প্রত্যেকটা গাড়িই গতিবেগ কমিয়ে একপাশে সরে পথ ছেড়ে দিল রানার।

অন্য কোন গাড়ি পেলে খুশি হত রানা, কিংবা বাস যদি একশো মাইল বেগে চলত তাহলে তাতে করে যেতে পারলে আরও খুশি হত। কারণ আরও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সাধারণ এক ট্যুরিস্ট হিসেবে যেতে চায় সে হাইলারে, লাল-হলুদ ডোরাকাটা ট্যাক্সি চালিয়ে ওখানে পৌঁছুলে চোখে পড়ে যাবে হয়তো অনেকের। কিন্তু দ্রুততার খাতিরে অন্যান্য সুবিধে বিসর্জন দিতে হলো ওকে।

শহরতলি ছাড়িয়ে প্রথম যে গ্রামটা পেল, সোজা গিয়ে তার পোস্ট অফিসের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। টেলিফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল সোহানার হোটেলে। জানা গেল, কিছুক্ষণ আগেই রানার মেসেজ পেয়েছে সোহানা কর্নেল ডি গোল্ডের মাধ্যমে, দরজায় তালা মেরে বসে আছে এখন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

'আমি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছি সোহানা। তোমাকে কতকগুলো কথা বলে যাব আমি এখন গড়গড় করে। এসব কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ধীরেসুস্থে যে এসবের মানে ব্যাখ্যা করব, তার সময় নেই। তোমার তো বাংলা শর্ট হ্যান্ড জানা আছে, লিখে নাও আমার বাণী—আমার বিশ্বাস, আগাগোড়া বারুদশেক পড়লেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। গেট রেডি।'

'এক সেকেন্ড,' খুব সম্ভব কাগজ পেন্সিল নিয়ে তৈরি হওয়ার সময় চাইল সোহানা, ঠিক তিন সেকেন্ড পর বলল, 'বলো, আমি রেডি।'

গড়গড় করে একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট কথা বলে থামল রানা। কোনরকম সম্ভাষণ বিনিময় না করেই ঝটাং করে রিসিভার নামিয়ে রেখে একলাফে গিয়ে উঠল গাড়ির ড্রাইভিং সীটে। ছুটল আবার। হাইলারের বাঁধের কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে স্বাভাবিকে নিয়ে এল রানা, কয়েক মিনিট পর যেখান থেকে সাইকেল চুরি করেছিল সেই কারপার্কে এসে থামাল সে ট্যাক্সিটা। ইতিমধ্যেই অনেক গাড়ির ভিড় জমে গেছে। ভালই—ভাবল রানা মনে মনে, ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

অ্যামস্টার্ডাম থেকে রওনা হওয়ার সময়ই লক্ষ করেছিল রানা, পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশটা, হাইলারে পৌঁছে দেখা গেল গত রাতে এত যে বৃষ্টি হয়েছে সেটা আর বিশ্বাস হতে চায় না আকাশের দিকে চাইলে। ডাচ ওয়েদারকে এইজন্যেই বোধ হয় আনপ্রেডিকটেবল বলে সাদা রঙের ছোটখাট এক-আধ টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে, বাকি সব ফরসা। কড়া রোদ বাষ্প টেনে তুলছে মাঠের বুক থেকে।

কোট খুলে হাতের উপর ভাঁজ করে রাখল রানা, সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা কোটের পকেটে, পকেটটা এমনভাবে রানার দিকে ফেরানো যে প্রয়োজনের সময় আধসেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না ওটা বের করে আনতে। সহজ ভঙ্গিতে সেই বাড়িটার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। বাড়িটার কাছে এসে দেখল রানা, দরজা দুপাট খোলা, ভেতরে ট্র্যাডিশনাল হাইলার কস্টিউম পরা মহিলা দেখতে পেল। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে এটা ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছুক্ষণ, তারপর একটা সানগ্লাস কিনল। ওই বাড়ির দরজা দিয়ে লোকজনকে ঢুকতে বেরোতে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস কিনবার ছলে মিনিট দশেক পার করল রানা এ-দোকান ও-দোকানে। আসলে খুঁজছে মারিয়াকে। ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে সে। দুজন লোককে দুটো বাক্স মাথায় করে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা বাড়িটা থেকে, এক চাকার ঠেলাগাড়িতে ওগুলো তুলে ঠেলে নিয়ে চলে গেল ওরা বন্দরের দিকে। বোঝা যাচ্ছে, ওটা একটা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান। কি ধরনের শিল্প চলছে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু যে নয় সেটা বোঝা যায় ওদের খোলামেলা ভাব দেখে। দুজন ট্যুরিস্টকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাতে দেখল রানা দরজার একপাশে দাঁড়ানো একজন লোককে। ভেতরে ঢুকে ওদের কাজ দেখবার অনুরোধ করল, ট্যুরিস্ট দুজন গেল ভেতরে, খানিক পরে আবার বেরিয়েও এল, চোখমুখে মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব। রাস্তার দুপাশের দোকানগুলোয় মারিয়াকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক কাছে চলে এল রানা ওই বাড়িটার। ভয় হলো, আমন্ত্রণ পেয়ে মারিয়াও ঢোকেনি তো ওই বাড়ির ভেতর? জোর করে আশঙ্কাটা দূর করে দিল রানা মন থেকে। ও যে রকম মেয়ে, ঠিক যা বলা হয়েছে সেটা অমান্য করে বাড়াবাড়ি করবে না কিছুতেই। তবু ওকে খুঁজে পেতে যত দেরি হচ্ছে, ততই অস্থির হয়ে উঠছে রানা ভেতর

ভেতর।

বাড়িটার উত্তরে বিস্তীর্ণ এক খড়ের মাঠ। বহু দূরে ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরা কয়েকজন মহিলাকে দেখা গেল, বিশাল কাঁটাচামচের মত দেখতে হে-ফর্ক দিয়ে খড় আলগা করছে শুকোবার জন্যে। সংক্ষিপ্তভাবে চিন্তা করল রানা, এখানকার পুরুষ লোকগুলো করে কি? বেশির ভাগ কাজই দেখা যাচ্ছে করছে মহিলারা। সুখেই আছে মনে হয় ব্যাটারা।

আর কিছুদূর এগিয়েই মারিয়ার পিঠ আর মাথা দেখতে পেল রানা। মুহূর্তে দুর্ভাবনার মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করে উঠল রানার মনটা খুশিতে। মস্ত একটা ভার নেমে গেল যেন ওর বুকের উপর থেকে। ঠিক যেমন নির্দেশ দিয়েছিল তেমনি একটা সুবিধেজনক জায়গা বেছে নিয়েছে মারিয়া। মস্তবড় একটা সুভ্যেনির-স্টোরে লোকজনের ভিড়ে মিশে এটা ওটা দেখছে নেড়েচেড়ে, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে ওর সেই কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠানের দরজার দিকে। রানাকে দেখতে পেল না। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, মুহূর্তে সজাগ, সতর্ক হয়ে গেল ওর পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এখানে কি করছে মেয়েটা? চট করে দরজার আড়ালে সরে গিয়ে চোখ রাখল রানা রাস্তার দিকে।

ইরিন আর মারগ্রিয়েট এগিয়ে আসছে এইদিকে। স্লীভলেস গোলাপী একটা ফ্রক পরেছে ইরিন, হাতে লম্বা গ্লাভস, বাচ্চা মেয়ের মত স্কিপিঙের ভঙ্গিতে হাঁটছে, কালো চুল লাফাচ্ছে ঘাড়ের উপর, মুখে শিশুর পবিত্র হাসি। তার ঠিক পেছনেই মারগ্রিয়েট, পুতুলের পোশাক পরা হিমালয় পর্বত, হাতে ঝুলছে বড়সড় একটা চামড়ার ব্যাগ।

দেখতে পেলেই যদি ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে, সেই ভয়ে একটা রিভলভিং পিকচার-পোস্টকার্ড স্ট্যান্ডের আড়ালে দাঁড়াল রানা, অপেক্ষা করছে ওদের পার হয়ে যাওয়ার।

কিন্তু পার হলো না ওরা। দরজা ছাড়িয়ে কয়েক কদম গিয়েই কাচের ওপাশ থেকে মারিয়াকে দেখতে পেল ইরিন, দেখেই থমকে দাঁড়াল, মারগ্রিয়েটকে কি যেন বলল, মারগ্রিয়েট মাথা নাড়তেই ওর বিপুলায়তন হাত ধরে টানাটানি শুরু করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দোকানে ঢুকতে হলো মারগ্রিয়েটকে, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গাম্ভীর্য নিয়ে, একছুটে মারিয়ার কাছে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরল ইরিন।

'আমি তোমাকে চিনি,' খুশি উপচে পড়ছে ইরিনের কণ্ঠস্বরে। 'আমি চিনি তোমাকে!'

ইরিনের দিকে ফিরে মৃদু হাসল মারিয়া। 'আমিও তোমাকে চিনি। কেমন আছ, ইরিন?'

'আর এ হচ্ছে মারগ্রিয়েট।' বিপুল চেহারার মারগ্রিয়েটকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এসব পছন্দ হচ্ছে না ওর মোটেও। ওর দিকে ফিরে ইরিন বলল, 'মারগ্রিয়েট, এ আমার বন্ধু, মারিয়া।'

ভ্যাংচানোর মত একটা মুখভঙ্গি করল মারগ্রিয়েট মারিয়ার প্রতি, আঙুল দিয়ে ইশারা করল ইরিনকে বেরিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা

করল না ইরিন। মুগ্ধদৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মেজর মাসুদ রানা আমার বন্ধু।'

'আমি জানি সেটা,' মৃদু হেসে বলল মারিয়া।

'তুমি খুব সুন্দর। তুমি আমার বন্ধু হবে না, মারিয়া?'

'নিশ্চয়ই। কেন হব না?'

খুশিতে হাততালি দিল ইরিন। বলল, 'আমার আরও অনেক বন্ধু আছে হাইলারে। দেখবে? এদিকে এসো, দেখাচ্ছি।' হাত ধরে প্রায় টেনে দরজার কাছে নিয়ে এল ইরিন মারিয়াকে, আঙুল তুলে দূরের গোলাবাড়ির পাশে কর্মরত মহিলাদের দিকে দেখাল, 'ওই...ই যে, দেখতে পাচ্ছ? উ...ই যে।'

'ওরা তোমার বন্ধু বুঝি? খুব ভাল।'

'সত্যিই খুব ভাল,' মারগ্রিয়েটের হাতের ব্যাগের দিকে চাইল ইরিন। 'আমরা যখন আসি, ওদের জন্যে খাবার নিয়ে আসি, কফি নিয়ে আসি। তুমিও চলো, মারিয়া। খুব মজা হবে!' মারিয়াকে ইতস্তত করতে দেখে অবাক হয়ে চাইল ওর মুখের দিকে। বলল, 'এই না বললে, তুমি আমার বন্ধু?'

'তা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নয়। চলো না,' আবদারের সুরে বলল ইরিন। 'খুব ভাল ওরা। সত্যিই খুব ভাল। সবসময় খুশি হয় আমাদের দেখলে। গান শোনায়। কোন কোনদিন হে ডান্স দেখায়। দারুণ! খুব ভাল লাগবে তোমার।' মারিয়ার হাত ধরে বাচ্চা মেয়ের মত টানতে শুরু করল ইরিন।

'হে ডান্স কি?'

'খড়ের নাচ। দেখোনি কোনদিন? অপূর্ব! প্লীজ, চলো আমাদের সাথে। আমার কথা রাখবে না তুমি, মারিয়া? এত করে বলছি...' কাঁদোকাঁদো হয়ে এল ইরিনের গলা। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ফুঁপিয়ে উঠবে এখুনি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, বাবা,' হাসতে হাসতে বলল মারিয়া। 'এত করে বলছ, তাই যাচ্ছি, ইরিন। কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারব না।'

'সত্যিই, খুব ভাল তুমি, মারিয়া।' মারিয়ার হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে খুশি প্রকাশ করল ইরিন। 'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল তিনজন। দু'মিনিট পিকচার পোস্টকার্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে আলগোছে বেরিয়ে পড়ল রানাও। প্রায় চল্লিশ গজ সামনে একটা সাইড লেন ধরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল সে ওদের। পা বাড়াল সামনে। সাইড লেনের মাথায় এসে দেখল, মাঠের মধ্যে দিয়ে রওনা হয়েছে তিনজন গোলাবাড়ির দিকে। ছয়-সাতশো গজ দূরে ছোট ছোট দেখাচ্ছে কর্মরত মহিলাদের। দূর থেকে গোলাবাড়িটাকে খুবই প্রাচীন আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। মন খুলে উঁচু গলায় কথা বলছে ইরিন, খুশির চোটে মাঝে মাঝে লাফাচ্ছে ঠিক ছাগলের বাচ্চার মত, স্থির থাকতে পারছে না।

ওরা একটা ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই পেছন পেছন চলল রানা। ঢিবির পরেই ময়দানের সীমা চিহ্নিত করবার জন্যে ফুটপাঁচেক উঁচু ঝোপের

বেড়া, লম্বালম্বি চলে গেছে সামনের দিকে। ঝোপের ওপাশ দিয়ে কোমর থেকে উপরের অংশ সামনের দিকে বাঁকিয়ে চলল রানা ওদের তিনজনের গজ তিরিশেক পেছনে। এইভাবে বাঁকা হয়ে ছয়শো গজ যেতেই কোমর ব্যথা হয়ে গেল ওর। উঁকি দিয়ে দেখল, গোলাবাড়ির পশ্চিম দিকে সূর্যের থেকে আড়াল হয়ে বসল ওরা তিনজন। রঙবেরঙের পোশাক পরা মহিলারা কাজ করছে বাড়িটার উত্তর-পশ্চিম কোণে। আরও কিছুদূর এগিয়ে গোলাবাড়িটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে এক দৌড়ে চলে এল রানা একটা সাইড ডোরের পাশে, আস্তে করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন মনে হলো রানার কাছে গোলাবাড়িটা। এটার বয়স অন্তত একশো বছর তো হবেই। মেরামতের অভাবে একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। এবড়োখেবড়ো কাঠের তৈরি দেয়ালের কোন কোন জায়গায় দু'ইঞ্চির বেশি ফাঁক।

মাচায় ওঠার সিঁড়িটার দিকে চেয়ে পুরো আধমিনিট লেগে গেল রানার উপরে উঠবে কি উঠবে না সেই সিদ্ধান্ত নিতে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় পচে গেছে মাচার কাঠ, ঘুণ ধরেছে কয়েকটা কাঠে। ওর উপর পা দিলেই মড়াৎ করে ভেঙে পড়বে নিচে। সিঁড়িটার অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু তবু উপরে ওঠাই স্থির করল সে। কারণ ওখান থেকেই সবার উপর নজর রাখা সহজ। নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোকের ভেতরে ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা তো থাকছেই, তার উপর কাঠের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিতে গিয়ে দুই ইঞ্চি দূরে ভেতর দিকে উঁকিদানরত একজোড়া চোখ দেখতে পাবে না তার কি নিশ্চয়তা? কাজেই অতি সন্তর্পণে, সামান্যতম আওয়াজও না করে পা টিপে উঠে গেল সে মাচার উপর।

মাচাটার পূর্বদিকের অর্ধেকটা ভর্তি হয়ে রয়েছে গত বছরের খড়ে। ওদিকে না গিয়ে সাবধানে, প্রথমে হালকাভাবে পা ফেলে তক্তার অবস্থা বুঝে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে শরীরের ওজন চাপিয়ে, এক পা দু'পা করে পশ্চিম দিকে এগোল সে। পশ্চিম দেয়ালের কাছে পৌঁছে সবার উপর নজর রাখবার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠিক নিচেই দেখা যাচ্ছে বসে আছে ইরিন, মারিয়া আর মারগ্রিয়েট। একটু দূরে বারো-চোদ্দজন মাঝবয়সী মহিলা নিপুণ হাতে খড়ের গাদা তৈরি করছে, ছয়ফুট লম্বা কাঠের হাতলের মাথায় কাঁটাচামচের মত ছুঁচল লোহার পাতগুলো ঝকঝক করছে রোদ লেগে। ওদের মাথার উপর দিয়ে বহুদূরে কার-পার্কের একটা অংশ দেখতে পেল রানা।

আশ্চর্য একটা অস্বস্তি শিরশির করছে রানার সারা শরীরে। ঠিক কি কারণে যে শরীরের মধ্যে জাগছে এই বোধটা, অনেক ভেবেও কিছুতেই বুঝতে পারল না রানা। খড় গাদা করার দৃশ্য মনের মধ্যে একটা শান্তির ভাব, একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব সৃষ্টি করবার কথা। গোটা পরিবেশটাই শান্ত, মঙ্গলময়। তবু কেন আবছা অস্বস্তিটা দূর হতে চাইছে না ওর মন থেকে? কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব, বিপদের আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা আর অবাস্তবতা

অনুভব করতে পারছে রানা, কিন্তু ঠিক কিসের থেকে যে এর উৎপত্তি বুঝে উঠতে পারছে না। 'অবাস্তব' শব্দটা পছন্দ হলো রানার। এই লাইনেই এগোবার চেষ্টা করল চিন্তার কয়েক ধাপ, কিন্তু আবছা ঠেকায় বাদ দিল চিন্তা। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর, কর্মরতা গ্রাম্য মহিলাদের দিকেই যখন বারবার দৃষ্টি যাচ্ছে ওর, গোলমালটা ওখানেই। নিজেদের অভ্যস্ত পরিবেশে কাজ করছে ওরা একমনে। অভ্যস্ত কাজ, অভ্যস্ত সাজ—কিন্তু তবু যেন ঠিক মানাচ্ছে না। ঝলমলে পোশাক, এমব্রয়ডারি, দুধ-সাদা উইমপল্ হ্যাট এই পরিবেশের সাথে খাঁজে খাঁজে মিলে যাওয়ার কথা; ওদের চেহারা, বয়স, কাজ, পরিবেশ, সবকিছুর সাথে মিলে যাওয়ার কথা—কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করতে পারছে রানা। একটা নাটক-নাটক অবাস্তব ভাব সবকিছুতে। কেন যেন আবছাভাবে ওর মনে হলো, বিশেষ করে ওরই জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এই নাটকের।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, কোথাও কোন শান্তিভঙ্গ হলো না। তেমনি নিরলস কাজ করে চলেছে মহিলারা, ছায়ায় বসে এদের তিনজনের মধ্যে দু'একটা টুকরো কথা হচ্ছে, বেশির ভাগ সময়ই চুপ। পরিবেশটা এমনই শান্তিময় যে কথা বলে শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে না যেন কেউ। ফর্কের মাথায় খড় তুলে গাদার উপর ছুঁড়ে দেয়ার মৃদু খসখস শব্দ, কড়া রোদ, আলস্য, মাঝে মাঝে এক-আধটা বেপথু ভ্রমনের গুঞ্জন, দূর থেকে ভেসে আসা কোন পাখির মিষ্টি সুরেলা ডাক—পরিবেশটা অন্তর দিয়ে অনুভব করবার, কথা বলে সৌন্দর্যহানি ঘটাবার নয়। কোটটা ভাঁজ করে মেঝের উপর রেখে তার উপর রাখল পিস্তলটা, তারপর সাবধানে একটা সিগারেট ধরাল রানা। ঘন ধোঁয়াগুলোকে কখনও হাত নেড়ে, কখনও ফুঁ দিয়ে হালকা করে মিশিয়ে দিচ্ছে বাতাসে।

আরও কয়েক মিনিট গেল। হাতঘড়িতে সময় দেখল মারিয়া, মারগ্রিয়েটও কব্জি উল্টে পকেট ওয়াচের সমান একটা হাতঘড়িতে সময় দেখল, নিচু গলায় কিছু বলল ইরিনকে। উঠে দাঁড়াল ইরিন, মারিয়ার হাত ধরে টেনে তুলল, দুজন মিলে চলল কর্মরতা মহিলাদের দিকে। খুব সম্ভব ওদের কফি খাওয়ার কথা বলতে। এদিকে ঘাসের উপর একটা চাদর বিছিয়ে চামড়ার ব্যাগ থেকে খাবার বের করছে মারগ্রিয়েট, ডজন দেড়েক কাগজের তৈরি কাপ আর একটা মস্তবড় ফ্লাস্কও বেরোল ব্যাগ থেকে।

রানার পেছন থেকে মৃদু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবেন না, মেজর মাসুদ রানা। ওটা ছোঁয়ার আগেই মারা পড়বেন।'

লোকটা যে-ই হোক, তার কথা বিশ্বাস করল রানা বিনা দ্বিধায়। পিস্তল তুলে নেয়ার চেষ্টা করল না সে।

'ঘুরে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে।'

খুব ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। লোকটার আদেশে এমন একটা কিছু আছে যে পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষরে অক্ষরে পালিত না হলে ঘটে যাবে ভয়ঙ্কর কিছু।

'তিন পা সরে যান বামদিকে।'

এতক্ষণে গলার স্বরটা চিনে ফেলেছে রানা। সামনে দেখতে পেল না কাউকে। তিন পা সরে গেল সে। বামদিকে।

মাচার ওপাশে জমা করে রাখা খড়ের কাছে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। দুজন লোক বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। প্রথম জন রেভারেন্ড ডক্টর নিকোলাস রজার, দ্বিতীয়জন ব্যালিনোভা নাইট-ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার স্যামুয়েল, যার চেহারাটা দেখেই বিষাক্ত সাপের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল রানার। ডক্টর রজারের হাত খালি, কিন্তু স্যামুয়েলের হাতের বিশাল মাউযার তিনটে পিস্তলের পিলে চমকে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পলকহীন সাপের চোখ স্থির হয়ে রয়েছে রানার চোখের উপর। ওর চোখের উজ্জ্বলতা সাবধান করে দিল রানাকে, সামান্যতম কোন ছুতো পেলেই গুলি করবে স্যামুয়েল, ছটফট করছে সে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে। বিশাল মাউযারের মুখে লাগানো লম্বা নলটা জানিয়ে দিচ্ছে: যত খুশি গুলি করতে পারে স্যামুয়েল, কেউ টের পাবে না কিছু।

'বিচ্ছিরি, পচা গরম ওখানটায়,' বলল নিকোলাস রজার। 'দম আটকে আসছিল একেবারে! তার ওপর চুলকানি···পোকার ডিপো হয়েছে ওই খড়ের গাদা।' রানার দিকে চেয়ে নিষ্পাপ মধুর হাসি হাসল। 'অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে আপনাকে আজকাল, মেজর মাসুদ রানা।'

'অপ্রত্যাশিত মানে?' সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। 'আমার আগমন আশা করেননি বুঝি?'

'আশা করিনি বললে মিথ্যে বলা হবে।' মাথা নাড়ল রেভারেন্ড। 'একজন ধর্মযাজক হিসেবে সেটা উচিত হবে না আমার। সত্যি কথা বলতে কি, গির্জার সামনে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আপনাকে সেদিন আশা করিনি ঠিকই, কিন্তু আজ আপনার আশাতেই ধৈর্যের সাথে প্রতীক্ষা করছিলাম আমরা।' এগিয়ে এসে রানার ভাঁজ করা কোটের উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল, যেন লেজ ধরে তুলছে সাতদিনের পচা, পোকা খিতখিতে বোয়াল মাছ, এমনি মুখভঙ্গি করে ছুঁড়ে ফেলল ওটা খড়ের গাদার উপর। 'অমার্জিত, কদাকার যন্ত্র এসব, রুচির কোন বালাই নেই।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'এসব স্তর অনেক আগেই পেরিয়ে গেছেন আপনি। হত্যার মধ্যে শিল্পীসুলভ সৃষ্টিশীলতা ছাড়া আপনার মন ভরে না আজকাল।'

'হ্যাঁ। আমার রিফাইনমেন্টের ডেমনস্ট্রেশন দেখতে পাবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।' গলার স্বর খুব একটা নিচু করবার প্রয়োজন বোধ করল না নিকোলাস রজার। কারণ নিচে মারগ্রিয়েটের খাবার ঘিরে রীতিমত হাট বসে গেছে—সবাই কথা বলছে একসাথে। গাদা করা খড়ের ওপাশ থেকে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ নিয়ে এল রজার, লম্বা একটুকরো রশি বের করল তার মধ্য থেকে। 'মাই ডিয়ার স্যামুয়েল, একটু সজাগ থেকো। মেজর মাসুদ রানা যদি একটু নড়ে ওঠেন, সেটা সন্দেহজনক বা আক্রমণাত্মক হোক বা না

হোক, গুলি করবে নিশ্চিন্তে। একেবারে মেরে ফেলো না আবার, হাঁটু কিংবা উরুতে···বুঝতে পেরেছ?'

ঠোঁট চাটল স্যামুয়েল। রানা ভয় পেল, ওর হৃৎপিণ্ডের প্রবল ধুকপুকানির ফলে শার্টের অস্বাভাবিক কম্পনকে না আবার লোকটা সন্দেহজনক কিছু ভেবে বসে। পেছন দিক থেকে সাবধানে এগিয়ে এল রজার, রানার ডান হাতের কব্জিটা শক্ত করে বেঁধে মাথার উপরের মোটা একটা কাঠের বরগার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল রশির আরেক মাথা, তারপর এমনভাবে বাম হাতের কব্জিতে গিঠ দিল, যেন হ্যান্ডস-আপের ভঙ্গিতে রানার হাতদুটো মাথার উপর উঁচু হয়ে থাকে। রশির শেষ মাথাদুটো এমনভাবে উঁচু করে গিঠ দিল যেন কিছুতেই রানা হাতের নাগালে না পায়। এবার আর এক টুকরো অপেক্ষাকৃত ছোট রশি বের করল সে ব্যাগ থেকে।

যেন আন্তরিকতার সাথে গল্প করছে, এমনি গলায় বলল সে, 'স্যামুয়েলের কাছে জানতে পারলাম, আপনার হাতদুটোই কেবল নয়, পা-ও নাকি অস্বাভাবিক দ্রুত চলে। কাজেই ও দুটোকেও একটু শাসনের মধ্যে আনা দরকার।' দুই পা জোড়া করে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল সে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'এবার মুখেরও একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার—কি বলো, স্যামুয়েল? মেজর রানা এখন যে দৃশ্য অবলোকন করতে যাচ্ছেন, নাটক চলাকালে সে ব্যাপারে ওঁর কাছ থেকে আমরা কোন মন্তব্য চাই না। ঠিক? অতএব তোমার রুমালটা বের করো।' পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বের করে দিল স্যামুয়েল, রানার মুখের ভেতর সেটা পুরে দিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে মুখটা বেঁধে ঘাড়ের পেছনে গিঠ দিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল নিকোলাস রজার। 'কেমন বাঁধা হয়েছে, স্যামুয়েল? পছন্দ হয়েছে তোমার?'

জ্বলজ্বল করছে স্যামুয়েলের চোখ।

'মিস্টার গুডবডির তরফ থেকে এর জন্যে কিছু শুভেচ্ছাবাণী রয়েছে আমার কাছে, রেভারেন্ড। দিয়ে দেব?'

'আরে, না। অত অধৈর্য হলে কি চলে? পরে, পরে। আপাতত মেজর রানাকে আমরা পূর্ণ সচেতন, সজ্ঞান অবস্থায় চাই। দৃষ্টি বা শ্রবণ বা চিন্তাশক্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত হলে চলবে না। নইলে আমাদের শিল্পমাধুর্য পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করবেন কি করে?'

'ঠিক আছে, রেভারেন্ড,' বিনয়ের সাথে মেনে নিল স্যামুয়েল। ঠোঁট চাটল নিষ্পলক দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে। 'আপনি যখন বলেছেন, পরেই···'

'হ্যাঁ, পরে।' উদারতার অবতার যেন রজার। 'আমাদের শো-টা ভাঙলেই যত খুশি শুভেচ্ছা জানিয়ে দিতে পারো তুমি ওকে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, রাতে যতক্ষণ না গোলাবাড়িতে আগুন ধরানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন জীবিত থাকে। দুঃখের বিষয়, কাছেপিঠে কোথাও থেকে শেষ দৃশ্যটা আমি নিজে উপভোগ করতে পারব না।' মুখ দেখে সত্যিই দুঃখিত মনে হলো রজারকে। 'আপনার এবং আপনার ওই সুন্দরী সহকর্মিনীর পুড়ে কয়লা

হয়ে যাওয়া লাশ যখন ছাই ঘেঁটে বের করা হবে, সবাই অনায়াসে বুঝে নেবে ব্যাপারটা—গোপন প্রেমের জ্বালা মেটাতে এসে জ্বলে মরেছেন। অসাবধানে ফেলা সিগারেটের একটি টুকরোই নিবিয়ে দিয়েছে আপনাদের সব জ্বালা। যাই হোক, চলি এখন, গুডবাই। আবার দেখা হবে—পরপারে। আমি এখন হে ডান্স দেখতে যাচ্ছি। কাছে থেকে না দেখলে ওটার মজা নেই। আপনিও দেখতে পাবেন ওই ফাঁক দিয়ে। এমন সুন্দর নাচ জীবনে দেখেননি আপনি কোনদিন, আর দেখবেনও না।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিকোলাস রজার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সাপের মত পলকহীন চোখে চেয়ে রয়েছে স্যামুয়েল রানার চোখের দিকে, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর হাসির ভাঁজ। বাগে পেয়েছে সে এবার, পাওনা শোধ করে আরও কিছু অগ্রিম দিয়ে দেবে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে চাইল রানা।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে মহিলারা। মারিয়াও উঠে দাঁড়াল।

'কফিটা খুব ভাল না, মারিয়া? আর কেকগুলো?' খুশিখুশি গলায় জিজ্ঞেস করল ইরিন।

'সত্যিই খুব ভাল। কিন্তু আমার এখন যেতে হবে, ইরিন। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে···কেনাকাটা করতে হবে। অনেক কিছু। আমি এখন চলি, কেমন?'

দুটো পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বেজে উঠল হঠাৎ। বাদকদের দেখতে পেল না রানা, মনে হলো সদ্যনির্মিত খড়ের গাদার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। টানা, মিষ্টি সুরেলা।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে তিড়িংতিড়িং লাফাতে শুরু করল ইরিন। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখমুখ, বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল: 'কী মজা! হে ডান্স! হে ডান্স দেখাবে আজ ওরা! তোমার জন্যে, মারিয়া তোমার সম্মানে! এখন তুমিও ওদের বন্ধু হয়ে গেলে!'

খড়ের গাদার দিকে গজ দশেক সরে গিয়ে এদিকে মুখ করে সার বেঁধে দাঁড়াল মহিলা কর্মীরা। গম্ভীর। কারও মুখে কোন ভাবের লেশমাত্র নেই। হে-ফর্কগুলো রাইফেলের মত কাঁধের উপর রেখে বাজনার তালে তালে এক পা সামনে আসছে আবার এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে, এক পা ডাইনে সরছে, আবার ফিরে আসছে নিজের জায়গায়। তারপর আবার বাঁয়ে। লাল রিবন বাঁধা পিগটেল দুলছে তালে তালে। বাজনার আওয়াজ বাড়ছে ক্রমে। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে স্টেপ ফেলছে, আর মাঝে মাঝে পাঁই করে একপাক ঘুরছে সবাই গম্ভীর মুখে। রানা লক্ষ করল, ধীরে ধীরে অর্ধবৃত্তাকারে গোল হয়ে আসছে লাইনটা।

'অদ্ভুত!' মারিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'এই ধরনের ফোক-ডান্স জীবনে দেখিনি আমি।'

'আর কোনদিন দেখবেও না,' বলল ইরিন। সত্য কথাটা সহজ সরল ভাষায় ইরিনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসায় ভেতর ভেতর শিউরে উঠল রানা। ক্যাঁচ করে যেন চেপে ধরল কেউ ওর কলেজাটা আগুনে-লাল এক সাঁড়াশি

দিয়ে। কি ঘটতে চলেছে, আঁচ করতে পারছে রানা, কিন্তু সাবধান করবার কোন উপায় নেই। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ইরিন, 'আরে! দেখো মারিয়া, তোমাকে ডাকছে। তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওদের!'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে ডাকছে। মাঝে মাঝে আমাকে ডাকে, কোনদিন মারগ্রিয়েটকে। আজ ডাকছে তোমাকে।'

'যেতে হবে আমাকে। আর একদিন...'

'প্লীজ, মারিয়া, প্লীজ! বেশি না, পাঁচমিনিট। তোমার কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধু ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্লী-ই-জ! না গেলে ওরা খুব দুঃখ পাবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হলো মারিয়াকে। হেসে বলল, 'আচ্ছা পাগল! ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করল রানা, মাথা নাড়ল। যেন বারণ করতে চায় মারিয়াকে: যেয়ো না, মারিয়া! পালাও! সামনে বিপদ!

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ডের বেশি থাকতে পারল না রানা। চোখ মেলে দেখল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে অর্ধবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়াল মারিয়া, মুখে সলজ্জ হাসি। চেহারা দেখে বোঝা গেল অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছে। হে-ফর্ক কাঁধে নিয়ে বাজনার তালে তালে একবার সামনে আসছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে মহিলারা। ক্রমে বাড়ছে নাচের ছন্দ। গোল করে ঘিরে ফেলল ওরা মারিয়াকে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তিন পা এগিয়ে আসছে ওরা মারিয়ার দিকে, বৃত্তটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, আবার মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সরে যাচ্ছে তিন পা। বাজনার তালে তালে বৃত্তটা ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে।

নিকোলাস রজারকে দেখতে পেল রানা। মুখে প্রফুল্ল হাসি। বাতাসে উড়ছে শুভ্রকেশ। ইরিনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। ঘাড় বাঁকিয়ে চকচকে চোখে চাইল ইরিন বৃদ্ধের মুখের দিকে।

রানার মনে হলো, এক্ষুণি বমি হবে ওর। শীতল ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারছে না সে মারিয়ার দিক থেকে। পাগলের মত টানাটানি করল সে হাতের রশি—কব্জির উপর আরও চেপে বসল রশির ফাঁস, লাভ হলো না কিছুই। মারিয়ার মুখের অপ্রস্তুত ভাবের সাথে বিস্ময় যুক্ত হয়েছে এখন, সেইসাথে প্রকাশ পাচ্ছে আবছা অস্বস্তি। গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখে নেচেই চলেছে মহিলারা। দুজনের ফাঁক দিয়ে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে ইরিনের দিকে চাইল মারিয়া। আনন্দে স্থির থাকতে পারছে না ইরিন, হাত নেড়ে উৎসাহ দিল মারিয়াকে।

হঠাৎ ছন্দ এবং সুর পরিবর্তন করল অ্যাকর্ডিয়ানগুলো। ছন্দ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। সেই সাথে আওয়াজ। আশ্চর্য এক কর্কশ, আদিম সুরে গরম হয়ে উঠল পরিবেশটা মুহূর্তে। শ্রোতার রক্তে যেন নাচন ধরিয়ে দিতে চাইছে বাদকরা। ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে মহিলারা। মারিয়ার দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত। ভয়

পেয়েছে। একপাশে সরে ইরিনের দিকে চাইল সে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু সেখানে ভরসার কোন ছাপ দেখতে পেল না। হাসি মুছে গেছে ইরিনের মুখ থেকে, গ্লাভস পরা হাতদুটো জড়ো করে মুঠি পাকিয়ে দমন করবার চেষ্টা করছে সে তার মানসিক উত্তেজনা, কুৎসিত ভঙ্গিতে চাটছে নিচের ঠোঁট। রাগে, দুঃখে, অনুশোচনায় পানি বেরিয়ে এল রানার চোখ দিয়ে। স্যামুয়েলের দিকে চাইল। চার পাঁচ হাত দূরে আর একটা ফাঁকে এক চোখ আর রানার উপর আরেক চোখ রেখে দুদিকের দৃশ্যই উপভোগ করছে স্যামুয়েল। পিস্তলটা স্থির হয়ে রয়েছে রানার দিকে। অবধারিত অদৃষ্টকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেল না রানা।

মারিয়াকে গোল করে ঘিরে মহিলারা অনেক ছোট করে এনেছে বৃত্তটাকে। ওদের নির্বিকার, ভাবলেশহীন মুখে ফুটে উঠেছে এখন নির্মম ঘৃণা। মারিয়ার বিস্ফারিত চোখের ভীতি দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হলো তীব্র আতঙ্কে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে মারিয়া। আরও তীব্র, আরও আদিম হয়ে উঠছে বাজনা। এমনি সময়ে, অকস্মাৎ, রাইফেলের মত করে কাঁধের উপর রাখা হে-ফর্কগুলো সাঁই করে নামিয়ে বেয়োনেটের মত করে ধরল সবাই মারিয়ার দিকে। প্রাণপণে চিৎকার করল মারিয়া, একবার দু'বার নয়, বহুবার; কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ানের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল না কিছুই। চারপাশে চেয়ে কোনদিকে মুক্তির পথ দেখতে পেল না মারিয়া। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ওকে হে-ফর্কের কাঁটা। পাগলের মত সামনে পেছনে পা ফেলছে সবাই উদ্দাম ছন্দে। মারিয়ার অন্তিম চিৎকারের সামান্য একটু রেশ পৌঁছুল রানার কানে। দুইহাতে নিজের কান চেপে ধরবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। আর দেখা যাচ্ছে না, মাটিতে পড়ে গেছে মারিয়া! এখন শুধু পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে সে, শাবল চালানোর ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে হে-ফর্কগুলো উঠছে আর নামছে, উঠছে, নামছে। লাল হয়ে গেছে ফর্কগুলোর চকচকে কাঁটা।

আর চেয়ে থাকতে না পেরে মাথাটা একপাশে ফেরাল রানা। চোখ পড়ল ইরিনের উপর। হাতদুটো খুলছে আর মুঠি পাকাচ্ছে ইরিন, মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে, মুখে বন্যজন্তুর হিংস্রতা। ওর কাঁধের উপর হাত রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে রেভারেন্ড রজার, মুখে সরল হাসি, কিন্তু ধক্‌ধক করে জ্বলছে চোখদুটো। আদিম, জংলী বাজনা অমানুষ করে দিয়েছে সবাইকে।

বাজনাটা কমে এল। ঢিল হয়ে গেল ছন্দ। ফর্কহাতে খানিকটা দূরে সরে গেল সবাই, নাচের ছন্দে খানিকটা করে খড় তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওরা বৃত্তের মাঝখানে। এক মুহূর্তের জন্য ঘাসের উপর কুকুরের মত কুঁকড়ে পড়ে থাকা লাশটা দেখতে পেল রানা, রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে সাদা ব্লাউজ। পরমুহূর্তে ঢাকা পড়ে গেল শরীরটা খড়ের নিচে। অ্যাকর্ডিয়ানের ধীর ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উঁচু একটা খড়ের গাদা তৈরি করে ফেলল ভাবলেশহীন মহিলারা। থেমে গেল বাজনা। শেষ।

রেভারেন্ড ডক্টর রজারের হাত ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গল্প করতে করতে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল ইরিন, পেছন পেছন প্রশান্তবদনে চলল মারগ্রিয়েট। হাতে সেই মস্ত চামড়ার ব্যাগ।

আট

মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঠের ফাঁক থেকে চোখ সরাল স্যামুয়েল।

'দারুণ। তাই না?' মাথা কাত করে একটা ভুরু উঁচু করে প্রশংসার ভঙ্গি করল সে। 'এসব ব্যাপারে ডক্টর রজারের তুলনা হয় না। হত্যা তো নয়, যেন শিল্পকর্ম। একেক সময় ধিক্কার এসে যায় নিজের ওপর। শালার জীবনভর কি শিখলাম! এইরকম একটা সর্বাঙ্গসুন্দর মৃত্যু দেখলে মনে হয় সার্থক হলো জন্মটা। গ্র্যান্ডমাস্টার!' মুগ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ! তারপর ভাবের ঘোর কাটিয়ে উঠে ফিরল রানার দিকে। ওর চোখের দিকে চাইলে মনে হয় এক্ষুণি বুঝি সাপের মত লকলকে জিভ দেখা যাবে ঠোঁটের ফাঁকে। 'আমার কিন্তু আবার চিৎকার না শুনলে মজা লাগে না। গলা ফাটিয়ে চ্যাচাবে, তবে না খেলা!'

রানার পেছনে এসে দাঁড়াল লোকটা। ঘাড়ের পেছনে রুমালের গিঁঠ খুলে মুখ থেকে বের করে মেঝের উপর ফেলল দ্বিতীয় রুমাল, ভালটা ভাঁজ করে রেখে দিল নিজের পকেটে। সামনে এসে দাঁড়াল। 'ঢোক-ঢোক গিলে তৈরি হয়ে নাও বাছা! খুব জোরে চ্যাচাতে হবে এখন।'

'কিন্তু আর শ্রোতা কই?' নিজের গলা নিজেই চিনতে পারল না রানা। অত্যন্ত কর্কশ আর মোটা হয়ে গেছে গলাটা। বলল, 'এমন আনন্দ থেকে ডক্টর রজারকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে?'

বাঁকা হাসি হাসল স্যামুয়েল। 'উনি কল্পনা করে নিতে পারবেন। আর্টিস্ট মানুষ! এখানে কি ঘটছে সেটা কল্পনা করে নিতে মোটেই কষ্ট হবে না ওঁর। জরুরী কাজে এক্ষুণি অ্যামস্টার্ডামে ফিরে যেতে হচ্ছে ওঁকে, নইলে হাতেপায়ে ধরে রেখে দিতাম যেমন করে হোক। আমার কাজে আর্ট কম, কিন্তু কাজ বড় সলিড। নিজ চোখে দেখলে উনি খুশিই হতেন। কিন্তু কি আর করা, অ্যামস্টার্ডামে ফিরে যাওয়াটা এতই জরুরী…'

'শুধু ফিরে যাওয়া নয়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়াও।'

'সে তো বটেই,' মৃদু হাসল স্যামুয়েল। 'দেখো, মাসুদ রানা, তুমি বোধহয় কিছু একটা জেনে ফেলেছ, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে কথা বাড়াবার তালে আছ। গল্পের বইয়ে যেমন দেখা যায়—কথা বলে দেরি করিয়ে দিতে পারলেই কেউ এসে উদ্ধার করে ফেলে নায়ককে; হয়তো সহকারী, নয়তো পুলিস। আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, চাই কি কসম খেয়েও বলতে পারি, এখানে কারও সাহায্য পাবে না তুমি। এই গোলাবাড়ির

আধমাইলের মধ্যে কাউকে দেখা গেলে সাথে সাথেই জানানো হবে আমাকে, এবং সাথে সাথেই কাজ শেষ করে আগুন ধরিয়ে দেব আমি গোটা বাড়িতে। গল্পের বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী আমার এখন উচিত নির্যাতনের আগে লম্বা-চওড়া কিছু বক্তৃতা দিয়ে নিজের ভিলেন রোলটা আরও একটু ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু আমাদের এ গল্প লেখা হবে না কোনদিন। কাজেই ওসব ডিঙিয়ে সরাসরি কাজে নেমে যাওয়া যাক। কি বলো? শুরু করি?' এক পা এগিয়ে এল স্যামুয়েল।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে প্রলয়কাণ্ড। কথা ফুরিয়ে এসেছে। কথা দিয়ে আর দেরি করানো যাবে না ওকে। হঠাৎ যে কিছু একটা ঘটে গিয়ে উদ্ধার পেয়ে যাবে সে আশাও নেই। তবু, নিছক দেরি করাবার জন্যেই বলল, 'কি শুরু করবে?'

'মিস্টার গুডবডির শুভেচ্ছাবাণী।' বলেই ধাঁই করে পিস্তলের নল দিয়ে মারল স্যামুয়েল রানার বাম চোয়ালে। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। মনে হলো, এক আঘাতেই গুঁড়ো হয়ে গেছে চোয়ালের হাড়, কিন্তু জিভটা নেড়েই বুঝতে পারল হাড় ভাঙেনি, দাঁত খসে গেছে একটা। আসল নয়, বাঁধানো দাঁতটা।

'মিস্টার গুডবডি তোমাকে জানাতে বলেছেন যে পিস্তলের ফোরসাইট দিয়ে গাল চিরে দেয়া মোটেই পছন্দ করেন না উনি,' বাঁকা হাসি হেসে বামহাতে নিল স্যামুয়েল পিস্তলটা, সাঁই করে চালাল ডান গাল লক্ষ্য করে। মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তাতে আঘাত এড়ানো গেল না। দড়াম করে ডান চোয়ালের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। বাঁধানো দাঁতটা ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। সেই সাথে আত্মহত্যার সুযোগও। ওই দাঁতের মধ্যেই লুকানো ছিল ওর সায়ানাইড ক্যাপসুল। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চোখে কিছুই দেখতে পেল না রানা, মাথাটা ঘুরে উঠেছে, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এক্ষুণি। কিন্তু বুদ্ধিটা ঘোলা হলো না মোটেই। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, স্যামুয়েলকে ঠাণ্ডা মাথায় অত্যাচার করতে দিলে কপালে অনেক দুঃখ আছে ওর, যেমন করে হোক রাগিয়ে দিতে হবে ওকে।

ফ্লোর-ওয়েটারের কাছে শেখা গোটাকয়েক বাছা বাছা ডাচ গালি ঝেড়ে দিল রানা।

কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্যামুয়েল রানার মুখের দিকে, তারপর খোলস ছেড়ে বিষধর সাপ হয়ে গেল মুহূর্তে। চারপাশ থেকে বৃষ্টির মত শুরু হয়ে গেল ঘুসিবর্ষণ। পিস্তল এবং হাতের মুঠি, দুটোই ব্যবহার করছে সে। নাক, মুখ, চোখ, কান, ঘাড়, পিঠ—বাদ দিচ্ছে না কিছুই। নাকমুখের আঘাতগুলো যতটা সম্ভব দুই বাহুর আড়ালে ঠেকাবার চেষ্টা করল রানা, ফলে শেষের দিকে বুক, পিঠ আর পেটের উপরই পড়ল বেশির ভাগ আঘাত। স্যামুয়েলের দুই চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ফোঁস ফোঁস হাঁপাচ্ছে, বক্সারের মত লাফাচ্ছে রানার চারপাশে, প্রয়োজন নেই, তবু অভ্যাসবশে

একটা হাত বারবার উঠে আসছে ওর নাকের কাছে নাকটা গার্ড দেয়ার জন্যে। প্রতিটা আঘাতে ককিয়ে উঠল রানা, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওর মাথাটা, পা দুটো সামান্য ভাঁজ হয়ে ঝুলে রইল হাতবাঁধা অবস্থায়।

আরও কয়েকটা ঘুসি মারবার পর বুঝতে পারল স্যামুয়েল, অনর্থক সময় ও শক্তি নষ্ট করছে সে। থেমে গেল। কেউ যন্ত্রণা বোধ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাকে নির্যাতন করবার কোন অর্থই হয় না। নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। কয়েকহাত দূরে সরে গিয়ে দম নিচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে। এরপর লোকটা ঠিক কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পারল না রানা, চোখ খুলতেও সাহস পেল না।

স্যামুয়েলের পায়ের শব্দ শুনে আবার মার শুরু হতে যাচ্ছে কিনা বুঝবার জন্যে আড়চোখে চাইল সে এক চোখের পাপড়ি সামান্য একটু ফাঁক করে। খ্যাপামি দূর হয়ে গেছে লোকটার। রানার কোটটা তুলে নিল মেঝে থেকে। উপরি যা পাওয়া যায় তাই লাভ। একের পর এক পরীক্ষা করছে পকেটগুলো। কিছুই পাওয়া যাবে না ওখানে। হাতে ঝোলানো কোটের পকেট থেকে মানিবাগ পড়ে যাবে বলে প্যান্টের হিপ-পকেটে রেখেছে সেটা রানা কোট খোলার আগেই। ব্যাপারটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না স্যামুয়েলের। পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রানার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, বের করে নিল মানিব্যাগ হিপ-পকেট থেকে।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্যামুয়েল। দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু অনুভব করতে পারছে রানা। অস্ফুট একটা গোঙানির মত শব্দ করে বরগার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাশ ফিরল রানা। অসহায় ভঙ্গিতে মেঝে স্পর্শ করে রয়েছে, ওর জুতোর ডগা। বাম চোখটা এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের এক ভাগ খুলল।

প্রথমেই চোখ পড়ল স্যামুয়েলের জুতোর দিকে। তিন ফুট দূরে এইদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। চট করে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল রানা। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে রানার মানিব্যাগ থেকে ছোটবড় হরেক মানের, হরেক দেশের নোটগুলো বের করে নিজের পকেটে পুরছে স্যামুয়েল! এত টাকা পেয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি হয়তো সে। বামহাতে মানিব্যাগটা ধরে ডানহাতে আরও নোট বের করছে আরেক খোপ থেকে। ট্রিগারগার্ডের মধ্যে দিয়ে বামহাতের মাঝের আঙুল বাঁকিয়ে পিস্তলটা ধরে রেখেছে আলগাভাবে। এতই ব্যস্ত রয়েছে টাকা বের করবার কাজে যে লক্ষই করল না রানার হাতদুটো একটু উপরে উঠে আঁকড়ে ধরল রশির দু'মাথা।

ঝট করে দু'ভাঁজ হয়ে গেল রানার শরীর। শরীরের সমস্ত শক্তি, রাগ আর ঘৃণা একত্রিত করে উপর দিকে চালাল সে জোড়া পা। এতই দ্রুত, যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল টেরই পেল না স্যামুয়েল—বাঁকা হয়ে হুমড়ি খেয়ে রানার গায়ের উপর পড়ল ওর শরীরটা, নিঃশব্দে, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। চিত হয়ে শুয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে স্যামুয়েল, তীব্র যন্ত্রণায় এতই বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা যে

চেনাই যাচ্ছে না। খিঁচুনি শুরু হয়ে গেছে ওর হাতপায়ে। জানোয়ার হয়ে গেল রানাও। নির্মমভাবে লাথির পর লাথি মেরে চলল ওর নাকে, মুখে, কানের পাশে, মাথার তালুতে; যতক্ষণ না স্থির হয়ে গেল দেহটা, থামল না। তখন আর চাওয়া যায় না থ্যাঁতলানো রক্তাক্ত দেহটার দিকে।

বাম হাতের মাঝের আঙুলটা বাঁকা করে তেমনি ধরে আছে স্যামুয়েল পিস্তলের ট্রিগারগার্ড। পা বাড়িয়ে নিঃসাড় আঙুলের ফাঁক থেকে টেনে আনল রানা পিস্তলটা নিজের কাছে। বারকয়েক দুই পায়ের জুতো দিয়ে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে উপরে তুলবার চেষ্টা করে বিফল হলো। বারবারই পিছলে পড়ে যায় নিচে। বহুকষ্টে, প্রায় বিশ মিনিটের চেষ্টায় দুই পায়েরই জুতো এবং মোজা খুলে ফেলল সে মেঝের উপর পায়ের গোড়ালি ঘষে।

খালিপায়ে পিস্তলটা চেপে ধরতেই সুন্দর উঠে এল। দুইহাত জড়ো করে রশিদুটো একত্র করল সে, তারপর ওটা বেয়ে উঠে গেল বরগা পর্যন্ত। বামহাতে বরগাটা ধরে ফেলতেই চারফুট আন্দাজ ঢিল পেল সে ডান হাতের রশিতে। এবার শরীর বাঁকা করে পা দুটো যতদূর সম্ভব উপরে তুলতেই পিস্তলটা চলে এল ওর হাতে।

নিচে নেমে এল রানা, বাম হাতের কব্জির কাছে রশির গায়ে সাইলেন্সারের মুখটা ঠেকিয়ে টিপে দিল ট্রিগার। যেন ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, এমনি নিখুঁত ভাবে রশি কেটে বেরিয়ে গেল গুলিটা। তিন মিনিটের মধ্যে সব দড়ি খসিয়ে জুতো মোজা পরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। স্যামুয়েলের পকেট থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করে আবার ভরে নিল মানিব্যাগে। খড়ের গাদা থেকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। স্যামুয়েলের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে মনে হলো মরেই গেছে লোকটা, কিন্তু সত্যিই মরেছে কি মরেনি পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না সে।

অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওর সামনে।

বিকেলের দিকে ফিরল রানা অ্যামস্টার্ডম। মার খেয়ে ফুলে গেছে চোখমুখ, হঠাৎ দেখলে চিনবার উপায় নেই, বামচোখ বুজে গেছে অর্ধেকটা। চোয়ালে, কপালে প্লাস্টার।

শহরে পৌঁছেই একটা হায়ার-গ্যারেজের কাছে পুলিস-ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটা কালো অস্টিন ভাড়া নিল সে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। রওনা হওয়ার সময় ট্যাক্সিটার কাছে থেমে বিট্রিক্সের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিল এ গাড়িতে। সোজা এসে থামল অস্টিন একটা পরিচিত সাইড রোডে। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক গজ এগিয়ে একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে চট করে সরে এল সে, তারপর সাবধানে উঁকি দিল আবার।

আমেরিকান হিউগানট সোসাইটির ফার্স্ট রিফর্মড চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মার্সিডিজ টু টোয়েন্টি। সাদা। হাঁ করা রয়েছে পেছনের বুট, তার মধ্যে ভারী একটা বাক্স তুলছে দুজন লোক। প্রশস্ত বুটে আগেই তোলা হয়েছে একই চেহারার আরও তিনটে বাক্স। চুলপাকা, হাসিখুশি লোকটাকে

তিন মাইল দূর থেকেও চেনা যাবে অতি সহজে—রেভারেন্ড ডক্টর নিকোলাস রজার। দ্বিতীয়জনের মাথায় ঘন কালো চুল, মুখে বয়সের ভাঁজ, দুই চোখের নিচে ফুলে রয়েছে দুটো থলে, উচ্চতা মাঝারি, হালকা-পাতলা গড়ন, চেহারা দেখলেই মনে হয় ভয়ানক নিষ্ঠুর। হাতে আজ এয়ারব্যাগ নেই, কিন্তু এক নজরেই চিনতে পারল রানা—ইসমাইল আহমেদের হত্যাকারী। ঠাণ্ডামাথায় খুন করেছিল লোকটা ইসমাইলকে শিফল এয়ারপোর্টে, ওর চোখের সামনে। মুহূর্তে মাথার যন্ত্রণা আর অস্বাভাবিক শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার। গত কয়েকদিন শয়নে স্বপনে বারবার এই লোকটার চেহারাটা ভেসে উঠেছে রানার মানসপটে, যেখানেই গিয়েছে—হোটেল, রেস্তোরাঁ, নাইট-ক্লাব—সব জায়গায় নিজের অজান্তেই খুঁজেছে সে এই লোকটাকে।

আরও একটা বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা গির্জা থেকে, এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে এসে তুলল বুটে। বুট বন্ধ করে দুজনকে গাড়ির দুই দরজা খুলতে দেখেই একছুটে ফিরে এল রানা অস্টিনটার কাছে। গলির ভেতর ঢুকে মোড় নিয়েই দেখতে পেল সে প্রায় একশো গজ সামনে গদাই লশকরী চালে চলেছে মার্সিডিজ। বেশ অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল রানা।

শহরের ভিড় এড়িয়ে মার্সিডিজকে মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে দেখেই বুঝে নিল রানা ওটার গন্তব্যস্থল। নিশ্চয়ই চলেছে ক্যাসটিল লিন্ডেনের দিকে। শহরতলি ছাড়িয়ে একটা মাইলপোস্টে দেখতে পেল রানা, আর তিন কিলোমিটার আছে ক্যাসটিল লিন্ডেনে পৌঁছুতে। বারকয়েক হর্ন বাজিয়ে একটা ট্রাক মার্সির্ডিজকে ওভারটেক করছে দেখে অ্যাকসিলারেটর টিপে ধরল রানা। সামনে বেড়ে থাকাই ভাল। ট্রাককে সাইড দিল ডক্টর রজার, ট্রাকের পেছন পেছন রানাও বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। মুখটা ঘুরিয়ে রাখল সে, কিন্তু পরিষ্কার টের পেল, মার্সিডিজের আরোহীদের কেউই চাইল না ওর দিকে। চাইবার কথাও না। চাইলেও চিনতে যে পারবে না, সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিল রানা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্যামুয়েলের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে রজার রানাকে, কল্পনাও করতে পারবে না যে সেই রানাই ভিন্ন গাড়ি চালিয়ে ওভারটেক করছে ওকে।

মাইলখানেক গিয়ে ট্রাক চলে গেল বাঁয়ে, রানা ধরল ডাইনের রাস্তা। আরও কিছুদূর গিয়ে তীরচিহ্ন আঁকা নির্দেশিকা দেখতে পেল সে, সেই রাস্তা ধরে এক কিলোমিটার এগোতেই দেখতে পেল প্রকাণ্ড এক খিলান। খিলানের উপর সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে 'ক্যাসটিল লিন্ডেন'। শ'দুয়েক গজ এগিয়ে গেল রানা, তারপর একটা ঘন ঝোপের আড়ালে গাড়িটা লুকিয়ে রেখে চাইল চারপাশে। বামদিকে পাইনের জঙ্গল, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দুর্গের এক-আধটা অংশ দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা সোজা দুর্গের দিকে। জঙ্গলের শেষে বুক সমান উঁচু ঘাসের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে চাইল সে সামনের দিকে।

সামনেই কাঁকর বিছানো রাস্তা দেখা যাচ্ছে—খিলানের নিচ দিয়ে এসে

সামান্য বাঁকা হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে দুর্গের সামনে। চারতলা দুর্গ, দুর্গের মাথায় গম্বুজ, গায়ে মধ্যযুগীয় কারুকাজ, চারপাশে বিশ ফুট চওড়া পরিখা। কাঁকর বিছানো রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে পরিখার সামনে। ওখান থেকে দুর্গে প্রবেশ করবার জন্যে এককালে যে ড্র-ব্রিজের ব্যবস্থা ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে দেয়ালের গায়ে বসানো প্রকাণ্ড দুটো কপিকল রয়েছে এখনও। কিন্তু এখন আর ড্র-ব্রিজের ব্যবস্থা নেই, পরিখার উপর একটা স্থায়ী ব্রিজ তৈরি করে নেয়া হয়েছে। ব্রিজের ওপরে প্রকাণ্ড এক ওক কাঠের দরজা। বন্ধ। রানার বামদিকে, দুর্গ থেকে গজ তিরিশেক দূরে একটা চৌকোণ একতলা দালান, ইটের—দেখে বোঝা যায় বড়জোর বছর তিনেক আগের তৈরি।

খিলানের নিচ দিয়ে এপাশে চলে এল সাদা মার্সিডিজ। কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে খৈ ভাজার আওয়াজ তুলে একতলা দালানের সামনে গিয়ে থামাল গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসে রইল ডক্টর রজার, পাশের লোকটা গাড়ি থেকে নেমে গোটা দুর্গটা ঘুরে এল একপাক। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে একতলা বাড়ির একটা দরজায় চাবি লাগাল নিকোলাস রজার, দরজা দু'পাট হাঁ করে খুলে রেখে দুজন মিলে নামাতে শুরু করল বাক্সগুলো। একটা করে বের করে, ভেতরে কোথাও রেখে আসে সেটা, আবার নামায় একটা। শেষ বাক্সটা ভেতরে নেয়া হতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বুক সমান উঁচু ঘাসের আড়ালে আড়ালে অতি সন্তর্পণে একতলা দালানের একপাশে সরে এল রানা, তিন লাফে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সেঁটে দাঁড়াল দেয়ালের গায়ে। দুই মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কোনদিক থেকে কারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পা টিপে এসে দাঁড়াল একটা জানালার সামনে। সাবধানে মাথা তুলে উঁকি দিল পর্দার ফাঁক দিয়ে।

ভেতরে শুধু ঘড়ি আর ঘড়ি। প্রকাণ্ড ঘরটা একযোগে ঘড়ির কারখানা এবং স্টোর। তিন পাশের দেয়াল জুড়ে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত টাঙানো রয়েছে ছোটবড় নানান ডিজাইন ও আকৃতির দেয়ালঘড়ি। বড়সড় চারটে ওয়ার্ক-টেবিলের উপরও অনেকগুলো করে ঘড়ি আর তার ভেতরের যন্ত্রপাতি কলকব্জা। একপাশে মেঝের উপর গোটা দশেক বাক্স দেখা গেল, খোলা। মার্সিডিজে করে ঠিক যে রকম বাক্স আনা হয়েছে, সেই রকম। সব দেয়াল ভর্তি হয়ে যাওয়ায় ঘরের একপাশে আড়াআড়ি করে গোটাকয়েক শেলফ রাখতে হয়েছে। প্রত্যেকটা তাক ভর্তি হয়ে যাওয়ায় কয়েকশো ঘড়ি রাখতে হয়েছে মেঝের উপর।

রজার এবং সেই শুকনো-পাতলা লোকটা ব্যস্ত রয়েছে একটা শেলফের কাছে। রজারের হাতে এক টুকরো কাগজ, লোকটার হাতে গোটা দশেক পেন্ডুলাম—নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে একেকটা ঘড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সেগুলো। নিচু হয়ে ঝুঁকে আবার গোটাকয়েক পেন্ডুলাম তুলে নিল লোকটা একটা বাক্স থেকে। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বলে মনে হলো রানার। মাথা নাড়ছে রজার, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কাগজের একটা জায়গায় খোঁচা

দিল, নিচু গলায় কিছু বলল পাশের লোকটাকে। ঘাড় বাঁকিয়ে কাগজের দিকে চাইল লোকটা, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। কাগজের উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই একটা সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল ডক্টর রজার, অদৃশ্য হয়ে গেল রানার দৃষ্টিপথ থেকে। ইসমাইলের হত্যাকারী পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করে একই আকারের দুটো করে পেণ্ডুলাম সাজাতে শুরু করল একটা টেবিলের উপর।

রজার ব্যাটা গেল কই?—ভাবল রানা। সাথে সাথেই উত্তর পেয়ে গেল সে। ঠিক পেছন থেকে।

'আমাকে নিরাশ করেননি দেখে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।'

ধীরে ধীরে পেছন ফিরল রানা। সাধুপুরুষের নিষ্পাপ হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেভারেন্ড রজার, হাতে একটা বড় আকাবের বেমানান পিস্তল, পিস্তলের মুখটা সোজা রানার হৃৎপিণ্ডের দিকে ধরা।

'বিড়ালকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন আপনি, মিস্টার রানা!' আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলল রজার। 'আপনাকে বোধ হয় একটু আন্ডারএস্টিমেটই করে ফেলেছিলাম আমি। গত তেরো ঘণ্টার মধ্যে দুই দুইবার আপনার মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছি। আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি আপনার অবধারিত মৃত্যু সম্পর্কে, কিন্তু বড় শক্ত জান আপনার, ঠিক কোন না কোন ফাঁক গলে বেরিয়ে পড়েছেন আমার জাল থেকে। আমার জন্যে এটা অত্যন্ত অবমাননার কথা। জীবনে এমন ঘোল কেউ খাওয়াতে পারেনি আমাকে। যাই হোক, দান দান তিন দান। যদিও অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছি আমি, তবু তৃতীয়বার যেন আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করব এবার। স্যামুয়েলকে খুন করে আসা উচিত ছিল আপনার।'

'মরেনি ও?' দুঃখিত মুখভঙ্গি করল রানা।

'অত দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। এখনও মরেনি ঠিকই, তবে মরবার আর বেশি বাকিও নেই। সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল ও, আমাদের সৌভাগ্য যে ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মাঠের মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল বেচারী। হাসপাতালে দেয়া হয়েছে, কিন্তু স্কাল ফ্র্যাকচার আর ব্রেন হেমারেজ কাটিয়ে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছে না ডাক্তাররা। এইটুকু বলেছে, যদি বাঁচেও, কোনদিন আর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে না স্যামুয়েল।'

'খুব একটা দুঃখ বোধ করতে পারছি না খবরটা শুনে।' সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'তা তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল রেভারেন্ড রজার অমায়িক ভঙ্গিতে। 'কিন্তু কেউ কেউ আবার করছে। এই যেমন স্পিনোযা…মানে, চার্চ থেকে গাড়িতে করে যে ছেলেটা এল আমার সাথে…ওর কলজেটা ফেটে যেতে চাইছে দুঃখে—হাজার হোক, আপন ভাই।' হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠার ভঙ্গি করল রজার, 'কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ গল্প করবেন? চলুন,

ভেতরে চলুন!' হাসল লজ্জিত হাসি। 'আমি কিন্তু পিস্তলের ব্যাপারে খুবই আনাড়ি লোক। প্রয়োজনের বেশি সামান্য একটু নড়াচড়া দেখলেই টিপে দিই ট্রিগার।'

পেছনের একটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল রানা। সোজা এসে থামল সেই ঘড়ি ঘরে। রানাকে দেখে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না স্পিনোযা। বোঝা গেল, অনেক আগেই সাবধানবাণী পেয়ে গেছে ওরা হাইলার থেকে।

'এই যে, স্পিনোযা,' পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে রজার, 'ইনিই হচ্ছেন সেই স্বনামধন্য মেজর মাসুদ রানা। বাংলাদেশের স্পাই। অ্যামস্টার্ডামে এসেছেন ইন্টারপোলের সহযোগিতায় আমাদের অর্গানাইজেশনটা ধ্বংস করে দিতে।'

'পরিচয় আগেই হয়েছে আমাদের,' গম্ভীর গলায় বলল স্পিনোযা।

'ওহ্-হো, কি ভুলো মন আমার! ভুলেই গিয়েছিলাম।' রানার দিকে পিস্তল ধরে রাখল রজার, একপাশ থেকে কাছে এগিয়ে রানার পিস্তল বের করে নিল স্পিনোযা।

'এগুলো নিশ্চয়ই স্যামুয়েলের হাতের ছাপ?' পিস্তলের মাথা দিয়ে মৃদু দুটো টোকা দিল স্পিনোযা রানার চোয়ালে আঁটা প্লাস্টারের উপর, তারপর ফোর-সাইটটা চেপে ধরে চড়চড় করে তুলে ফেলল একটা প্লাস্টার। ভয়ঙ্কর একটুকরো হাসি ওর ঠোঁটে। সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি? ব্যথা লাগছে খুব?'

'আহা, স্পিনোযা, আবেগপ্রবণ হয়ো না। আগেই বলেছি তোমাকে, সামলে রাখতে হবে নিজেকে। মনের মধ্যে আক্রোশ এসে গেলেই বুঝবে ঘোলা হয়ে গেছে বুদ্ধিটা।' কয়েক পা পিছিয়ে গেল রজার। 'এবার পিস্তলটা ওর বুকের দিকে তাক করে ধরো দেখি।' স্পিনোযা রানার পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে তাক করে ধরল, নিজেরটা পকেটে ফেলে মুখ বাঁকা করল রজার। 'এসব জিনিস আমার মোটেই পছন্দ হয় না, মিস্টার মাসুদ রানা। স্থূল, অমার্জিত, গোলমেলে জিনিস—সৌন্দর্য বা শিল্পমাধুর্যের কিছু…'

'গলায় রশি বেঁধে হয়েস্টিং বীমের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া, বা হে-ফর্কের খোঁচায় খোঁচায় হত্যা করার মধ্যে আছে?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'এই দেখুন, আপনি আবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন,' একগাল হাসল রেভারেন্ড রজার। 'যে-কোন শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে হয়। এজন্যে প্রস্তুতি দরকার, নিজেকে শিক্ষিত করে নেয়া দরকার। চট করে একদিনে কেউ ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ভক্ত হয়ে যায় না। আপনার যদি ভাল না লাগে, দোষটা আপনার, ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা পিকাসোর পেইন্টিঙের না!' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ডক্টর রজার দুঃখিত ভঙ্গিতে। 'আপনি নিরাশ করেছেন আমাকে। সত্যি বলতে কি, আপনার এত নাম শুনেছি যে চমৎকার খেলা জমবে মনে করে রীতিমত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম আমি আপনার আগমন সংবাদে। অনেক আশা করেছিলাম আমি আপনার কাছে। কিন্তু কি দেখলাম? ভুলের পর ভুল করলেন আপনি এখানে, ওখানে, সেখানে—নির্বোধের মত পা দিলেন একের

পর এক পেতে রাখা ফাঁদে। যখন আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধির কোন প্যাঁচ আশা করছি, প্রমাণ পাচ্ছি আকাট নির্বুদ্ধিতার! কি জন্যে যে আপনাকে পৃথিবীর সেরা স্পাই বলা হয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি আজ পর্যন্ত। প্রতিটা পদক্ষেপেই ভুল করছেন আপনি। মূর্খের মত কিছু কাজ করে মনে মনে ভাবছেন, ঢিল লাগিয়ে দিয়েছেন ভীমরুলের চাকে, রাগে অন্ধ হয়ে কিছু ভুল করে বসব আমরা।' আবার মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'নাহ্! বড়ই নিরাশ হয়েছি। আপনারই দোষে প্রাণ দিতে হয়েছে বিট্রিক্স শেরম্যানকে। কোনরকম সতর্কতা অবলম্বন না করেই আপনি দুই দুইবার গিয়েছেন ওর ঘরে, আপনাদের কথাবার্তা রেকর্ড হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই জাগেনি আপনার সরল অন্তরে। আপনার সবকিছুতেই ভুল। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি? ফ্লোর ওয়েটারের পকেট হাতড়ে যে কাগজটা পাবেন বলে আশা করেছিলাম, সেটাই পেলেন আপনি—যদিও ওটা আদায় করতে গিয়ে বেচারীকে খুন করবার কোন যৌক্তিকতা দেখি না আমি। পরিষ্কার দিনের আলোয় হেঁটে বেড়াচ্ছেন আপনি হাইলারে, ভাবতেও পারছেন না, ওখানকার অর্ধেকের বেশি লোক আমার অনুগত, আপনার জীবিত থাকার খবর আমি পেয়ে যাব সাথে সাথেই। চার্চের বেজমেন্টে আপনার ভিজিটিং কার্ড রেখে আসছেন আপনি, তাজা রক্ত পাওয়া যাচ্ছে মেঝের উপর, অথচ ভাবছেন, কাকপক্ষীও টের পাচ্ছে না কিছু। ওই লোকটাকে খুন করায় অবশ্য কোন রাগ নেই আমার আপনার ওপর। আপনি ওর ব্যবস্থা না করলে আমার নিজেরই করতে হত—মাথার বোঝা হয়ে উঠেছিল লোকটা ক্রমে। যাই হোক, এ কয়দিন দেখে-শুনে আমাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হলো শোনা যাক। কি মনে করেন, ফাঁক পেয়েছেন কোথাও?'

'আপনাদের তিনটে ব্যবসাতেই ফাঁক রয়েছে। বাইবেল, হাইলারের পুতুল আর দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলাম—প্রত্যেকটাতেই ফাঁক দেখতে পেয়েছি। চার্চের নিচতলায় যে বিশেষ আকৃতির দোলক তৈরি করা হয় সেটা বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি আমার।'

'কিন্তু এত বুঝেও ঠেকাতে পারলেন না আমাদের,' পবিত্র হাসি রেভারেন্ডের মুখে। 'ঠিকই ধরেছেন, ফাঁপা দোলকের মধ্যে পুরে দিচ্ছি আমরা এক বিশেষ ধরনের পাউডার। বাক্সে পোরা হচ্ছে দেয়াল ঘড়িগুলো, কাস্টম ইন্সপেকশন হচ্ছে, তারপর সীল করে সরকারী দফতরের অনুমোদনপত্রসহ পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিশেষভাবে নির্বাচিত ডিলারদের কাছে। এতই নিখুঁত, এতই···'

খুক খুক করে গলা পরিষ্কার করল স্পিনোযা। 'মিস্টার রজার আপনি বলছিলেন বিশেষ জরুরী এক কাজে···'

'ঠিক বলেছ। অযথা বাজে কথায় দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। মিস্টার স্পাইয়ের একটা ব্যবস্থা করেই ছুটতে হবে আমাকে আবার,···চট করে একপাক ঘুরে দেখে এসো তো অল ক্লিয়ার কিনা।'

বিতৃষ্ণার সাথে আবার পিস্তলটা বের করল রজার, নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে

চারপাশের কয়েকটা জানালায় চোখ রেখে ফিরে এল স্পিনোযা, মাথাটা কাত করল ডানপাশে। পিস্তলের মুখে একতলা দালান থেকে বের করে দুর্গের সদর দরজার কাছে নিয়ে আসা হলো রানাকে। বড়সড় একটা চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই ওক কাঠের বিশাল দরজা খুলে হাঁ হয়ে গেল। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে প্যাসেজ ধরে কিছুদূর এগিয়ে আর একটা মস্ত ঘড়ি ঘরে ঢোকানো হলো রানাকে।

একনজরেই বোঝা যাচ্ছে, এটা প্রদর্শনী ঘর। ঘরের চার দেয়ালেই টাঙানো রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর কয়েকশো দামী ঘড়ি। প্রত্যেকটা দেয়াল মেঝে থেকে কোমর-সমান উঁচু পর্যন্ত সবুজ-সাদা মোজাইক করা, সেখান থেকে ছয়ফুট চওড়া পালিশ করা কাঠ, তার উপর থেকে সিলিং পর্যন্ত আবার মোজাইক। চার দেয়াল জুড়ে ছয়ফুট চওড়া কাঠের প্যানেলের উপর অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের, বিভিন্ন আকৃতির দেয়ালঘড়ি—কোনটা পাঁচফুট বাই তিন ফুট, কোনটা পাঁচইঞ্চি বাই তিনইঞ্চি। ঘড়ির কারুকাজের বাহার হাঁ করে চেয়ে থাকবার মত।

সবগুলো ঘড়ি মিলে কত দাম হবে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল রানা, পারল না। লক্ষ করল প্রত্যেকটাই পেন্ডুলাম ক্লক। মাত্র কয়েকটা ঘড়ি চলছে। সবকটা ঘড়ি যদি একসাথে চলতে শুরু করে তাহলে কি বিকট আর ভয়ঙ্কর শব্দ হবে ভেবে গালদুটো একটু কুঁচকে উঠল রানার। আট-দশটা চলছে, তাতেই বিরক্ত হয়ে উঠল সে দশ সেকেন্ডের মধ্যে। এই ঘরে বসে দশ মিনিটও কোন মনোযোগের কাজ করতে পারবে না সে—ছুটে পালাতে হবে।

'অপূর্ব কালেকশন···কি বলেন?' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ডক্টর রজার। 'সারা দুনিয়ায় এর জুড়ি পাবেন কিনা সন্দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবেন—বরং বলা উচিত, শুনতে পাবেন—এগুলো প্রত্যেকটাই চলে। অচল ঘড়ি এখানে একটাও নেই।'

কথাগুলো শুনল রানা, কিন্তু বক্তব্যটা ঠিক অনুধাবন করতে পারল না। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেছে ওর। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে ঘরের এককোণে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, পিঠের হাড় দেখা যাচ্ছে কোটের উপর দিয়েও। দু'পা এগিয়ে চমকে উঠল রানা লোকটার মুখের দিকে চেয়ে। বীভৎস! ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল মুখটা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—সেই রকমই রয়ে গেছে। হেনরী শেরম্যান। একনজরেই বোঝা গেল—মৃত! পাশেই পড়ে আছে কয়েক টুকরো সিঙ্গেল-কোর রাবার-ইনসুলেটেড বৈদ্যুতিক তার। মাথার পাশে মেঝের উপর পড়ে আছে একটা রাবার মোড়া এয়ারফোন।

'অ্যাকসিডেন্ট,' দুঃখিত কণ্ঠে বলল রজার। 'ভাবতেও পারিনি এত অল্পেই পটল তুলবে ছোঁড়া। এতটা যে কাহিল হয়ে পড়েছিল, কল্পনাও করতে পারিনি।'

'ওকে খুন করেছেন কেন?' রজারের দিকে ফিরল রানা। 'খুন? তা অবশ্য এক হিসেবে খুনই বলা যায় একে।'

'কেন?'

'ওর বোনটা যখন আমার ওপর আর ভরসা রাখতে পারল না, ভিড়ে গেল আপনার দলে, তখন এছাড়া আর কি উপায় ছিল ওকে শাস্তি দেয়ার? গত তিনটে বছর ধরে ওকে দিয়ে যা খুশি করিয়েছি আমরা। ওকে ধারণা দেয়া হয়েছিল যে ওর ভাইকে খুনের দায়ে খুঁজছে পুলিস, আমাদের হাতে তথ্য-প্রমাণ রয়েছে, যে কোন সময়ে তুলে দিতে পারি পুলিসের হাতে। এই ভাইয়ের মায়া কাটাতে পারেনি বলেই মনের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে হয়েছে মেয়েটাকে। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই, ওকে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন যখন দেখা দিল, ওর দুর্বলতম জায়গায় অর্থাৎ, এই ভাইটির ওপরই নির্যাতন চালাতে হলো আমাদের। ওর সামনে। তবে একটা কথা আপনার জানা থাকা ভাল, হেনরী বা তার বোনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি যতটা না দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী আপনি নিজে। শুধু এরাই নয়, আপনার সহকারিণী মারিয়া ডুক্রুজের মৃত্যুর জন্যেও আমি দায়ী করব আপনাকেই।' কথাটা বলতে বলতে ঝট করে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে পিস্তলটা রানার চোখের দিকে লক্ষ্য করে ধরল রজার। 'ঝাঁপ দিলেই মারা পড়বেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি বুঝতে পারছি, খড়-নৃত্য আপনি একটুও উপভোগ করতে পারেননি। মারিয়ার কাছেও নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি আমার ফাইন আর্ট। এবং আমার বিশ্বাস, আজ সন্ধ্যায় সোহানা চৌধুরীর কাছেও খুব একটা ভাল লাগবে না। তাকেও ওপারের টিকেট কাটতে হচ্ছে আজই সন্ধ্যায়। বাহ্! বেশ গভীরে গিয়ে লাগছে মনে হচ্ছে কথাগুলো! গুম! আমাকে হত্যা করার ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মধ্যে, মিস্টার মাসুদ রানা।' হাসি লেগে রয়েছে রজারের ঠোঁটের কোণে, কিন্তু নিষ্পলক ভাবলেশহীন চোখদুটোর দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে উন্মাদের চোখ।

'হ্যাঁ। খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। সুযোগ পাওয়ামাত্র করব।' সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'আমি দুঃখিত। এ জন্মে আর সুযোগ পাচ্ছেন না। নেক্সট টাইম, কি বলেন? যাই হোক, যা বলছিলাম, একটা ছোট্ট চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েছি আমরা সোহানা চৌধুরীর কাছে।' চোখ টিপল রজার। 'কি যেন ছিল কোর্ড ওয়ার্ডটা? ও হ্যাঁ, মাদাগাস্কার। ওকে লেখা হয়েছে, ভলেনহোভেন কোম্পানীতে দেখা করতে হবে আপনার সাথে, আজই সন্ধ্যায়।' বিচিত্র কর্কশ আওয়াজ করে হাসল রজার। 'ভলেনহোভেনকে আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। একই ওয়েরহাউজে পরপর দুটো খুন হতে দেখলে কে ভাবতে পারবে ওয়েরহাউজের মালিকের হাত রয়েছে এতে? নিজের বাড়িতে কেউ করে এই কাজ? একটা ফাইন টাচেই সন্দেহের উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে ভলেনহোভেন। আবার একটা লাশ ঝুলতে দেখা যাবে কাল সকালে হয়েস্টিং বীমের সাথে, দুলবে বাতাসে।'

'আপনি জানেন যে আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাঁধো ওকে,' রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করল সে স্পিনোযাকে। মুহূর্তের জন্যে ভদ্রতার মুখোশ খসে যেতে দেখে বুঝতে পারল

রানা, কথাটা ওর কোন দুর্বল জায়গায় গিয়ে লেগেছে।

মৃতদেহটার কাছে রানাকে ঠেলে নিয়ে গেল স্পিনোযা। হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো মোটা ইলেকট্রিক তার দিয়ে, পা দুটোও বাঁধা হলো জোড়া করে, তারপর দেয়ালের একটা আংটার সাথে শক্ত বাঁধা চারফুট লম্বা একটা তারের মাথার সাথে এঁটে দেয়া হলো রানার হাতের কব্জি।

'চালু করো ঘড়িগুলো।' হুকুম দিল ডক্টর রজার।

দ্রুতহাতে একের পর এক ঢাকনি খুলে পেন্ডুলামগুলো দুলিয়ে দিতে শুরু করল স্পিনোযা। ছোটবড় নানান রকম।

'আপনাকে আগেই বলেছি, অচল ঘড়ি একটাও নেই এখানে—সব সচল। সবটাতেই ঘণ্টা বাজে।' পিস্তলটা পকেটে রেখে কাছে এগিয়ে এল ডক্টর রজার। সামলে নিয়ে আবার হাসি-খুশি ভাবটা ফিরিয়ে এনেছে সে নিজের মধ্যে। 'এয়ারফোনের মাধ্যমে দশগুণ বেড়ে যাবে ঘড়ির আওয়াজ। ঠিক দশগুণ—বেশিও না, কমও না—একেবারে হিসেব করা। ওই যে দেখুন অ্যামপ্লিফায়ার, আর ওই যে মাইক্রোফোন। দুটোই আপনার নাগালের বাইরে। এয়ারফোনটা আনব্রেকেবল। হাজার চেষ্টা করলেও খসাতে পারবেন না ওটা কান থেকে। ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে পাগল হয়ে যাবেন আপনি, বিশ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারাবেন। জ্ঞান ফিরে আসবে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর—বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়। কিন্তু সে নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার, জ্ঞান আর ফিরে আসবে না আপনার কোনদিনই।' চারপাশে চাইল রজার। 'অর্ধেক বাকি আছে চালু হতে…এরই মধ্যে কেমন হাট-বাজার বসে গেছে দেখেছেন?'

'এইভাবেই নিশ্চয় খুন করা হয়েছে হেনরীকে? বাইরে থেকে দেখবেন আপনারা, ওই দরজার কাচের ওপাশ থেকে। মানুষের যন্ত্রণা দেখতে ভাল লাগে আপনার?'

'খুব ভাল লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার কষ্ট সবটা দেখবার সুযোগ হবে না আমাদের। কিছু জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে আমাদের। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি পারি সেগুলো সেরে ফিরে আসবার চেষ্টা করব আমরা। বিশেষ করে প্রথম আর শেষটুকু সত্যিই দেখবার মত হয়।'

একের পর এক দোলক দুলিয়ে চলেছে স্পিনোযা। মুহুর্মুহু ঘণ্টা পড়ছে, একটা থামে তো শুরু করে আর একটা—কোনটায় পড়ছে দুটো ঘণ্টা, কোনটায় নয়টা, কোনটায় একটা, কোনটায় বারোটা। কোনটা হালকা সুরে, কোনটা গম্ভীর, কোনটা উঁচু পর্দায়, কোনটা আবার খুবই খাদে।

'আমার লাশ গায়েব করে ফেলে আপনি মনে করেছেন…'

'আহা, গায়েব করতে যাব কেন?' বাধা দিয়ে পাকা মাথাটা দোলাল ডক্টর রজার। 'কাল রাতে বার্জ-বন্দরে চেয়েছিলাম সেটা। কিন্তু সেটা ছিল তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত। এখন অনেক ভাল প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়। গায়েব করব তো না-ই, ডুবে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উদ্ধার করা হবে আপনার লাশ।'

'ডুবে যাওয়ার···মানে?'

'মানে, জ্ঞান হারাবার পর আপনার হাতের ওপর কিছু কারুকাজ করা হবে যাতে মনে হয় হাত পাকিয়ে ফেলেছেন আপনি ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়ে। একডোজ হেরোইনও ঢুকিয়ে দেয়া হবে আপনার শরীরে। তারপর গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে গাড়িসুদ্ধ আপনাকে ঠেলে ফেলে দেয়া হবে শহরের কোন খালে। এবং সাথে সাথেই ফোন করা হবে পুলিসে।' ঘড়ির গোলমালে প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে এখন ওকে। 'অটপসি হবেই। আপনার হাতে হাইপোডার্মিকের পাংচার দেখে চমকে যাবে সবাই। আরও ইনভেস্টিগেশন করে দেখা যাবে হেরোইন পাওয়া যাচ্ছে। স্বভাবতঃই পুলিস বিশ্বাস করতে চাইবে না ব্যাপারটা। মাসুদ রানা, ইন্টারপোলের ইনভেস্টিগেটর···সে কি পুশার হতে পারে? অসম্ভব! আপনার মাল পত্র সার্চ করে দেখা হবে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে তখন। এমন কিছু কাগজপত্র পাওয়া যাবে আপনার সুটকেসের গোপন কম্পার্টমেন্টে, যাতে কারও কোন সন্দেহ থাকবে না যে আসলে ড্রাগ রিঙ ধ্বংস করতে আসেননি আপনি অ্যামস্টার্ডামে, এসেছেন তাদের সাথে একটা গোপন চুক্তিতে পৌঁছুতে। বেশ কিছু হেরোইন পাওয়া যাবে আপনার সুটকেসে, আপনার পকেটে পাওয়া যাবে ক্যানাবিসের গুখা। আহা! বড়ই দুঃখজনক! কে ভাবতে পেরেছিল এমন একজন লোক আসলে এই? গাছেরটাও খাচ্ছে, তলেরটাও কুড়োচ্ছে!'

গোটাকয়েক গালি দিল রানা। কিন্তু ঘড়িগুলোর প্রচণ্ড গোলমালে বোধহয় শুনতে পেল না ডক্টর রজার। একগাল হেসে রানার মাথার উপর দিয়ে এয়ারফোনটা পরিয়ে দিল সে ওর দুই কানে, তারপর একটা অ্যাডহেসিভ টেপের প্রায় অর্ধেক রীল খরচ করে এমনভাবে আটকে দিল ওটাকে, যেন কিছুতেই না খোলে। এয়ারফোনটা কানে পরিয়ে দিতেই ঘড়ির গোলমাল অনেকটা কমে গেল, মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে হৈ-হল্লার শব্দ। অ্যামপ্লিফায়ারের কাছে চলে গেল এবার ডক্টর রজার, রানার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে টিপে দিল সুইচ।

ঠিক যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে, এমনি প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠল রানা। শব্দ দিয়ে মানুষকে এত ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা যায় কল্পনাও করতে পারেনি সে। মুহূর্তে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীরটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝের উপর, পড়েই কাটা মুরগীর মত লাফাতে শুরু করল। প্রচণ্ড শব্দ! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করবার চেষ্টা করছে সে। মনে হচ্ছে গরম শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ ওর কানের ভেতর, খোঁচাচ্ছে মগজের মধ্যে। কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে না কেন বুঝতে পারল না রানা, পর্দা ফেটে গেলে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে। কিন্তু ফাটছে না। রানা বুঝতে পারল, এমনভাবে মাপ বেঁধে দেয়া হয়েছে যেন কানের পর্দা ফেটে গিয়ে কেউ রেহাই না পায়।

পাগলের মত গড়াগড়ি খাচ্ছে রানা মেঝের উপর। কিন্তু টান করে বাঁধা

রয়েছে হাতদুটো কড়ার সাথে, বেশিদূর গড়াতেও পারছে না। বড়শিতে গাঁথা চিতল মাছের মত যন্ত্রণায় এঁকেবেঁকে ছটফট করছে সে. নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠছে শরীরটা আধহাত, কখনও খটাশ করে বাড়ি খাচ্ছে মাথাটা দেয়ালের সাথে—কোন্দিক থেকে কোন্দিকে গড়াচ্ছে কোন হুঁশ নেই। এরই ফাঁকে চোখ গেল একবার দরজার দিকে। কাঠের দরজা, উপরটায় কাচ বসানো। কাচের ওপাশে দেখতে পেল সে ডক্টর রজার আর স্পিনোযাকে। চকচকে কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ঘড়িটা চোখের কাছে তুলল স্পিনোযা, কিছু বলল, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। রানা বুঝতে পারল, যত শিগগির সম্ভব কাজ সেরে ফিরে আসবার চেষ্টা করবে ওই সাইকোপ্যাথ।

পনেরো মিনিটে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, বলেছে রজার। কিন্তু রানার বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। এই অবস্থায় তিন মিনিটের বেশি কি করে কারও পক্ষে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব, বোঝা মুশকিল। এপাশ-ওপাশ মাথা ঠুকল রানা। ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে এয়ারফোন। সরবো-রাবার মোড়া এয়ারফোন যে সত্যিকার অর্থেই আনব্রেকেবল হাড়ে হাড়ে টের পেল সে। মেঝের সাথে কান ঘষে খসিয়ে ফেলবার চেষ্টা করল সে এয়ারফোনটা, পারল না। নিজের অজান্তেই যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার স্বাভাবিক শারীরিক তাগিদে এসব করছে সে, খেয়ালই করল না যে ঘষাঘষিতে মুখের প্লাস্টারগুলো খসে গিয়ে দরদর করে আবার নেমেছে রক্তের ধারা।

টিক টিক টিক টিক, ঢং ঢং ঢং ঢং, বিরামহীন বেজে চলেছে ঘড়িগুলো, একটা ঘণ্টা বন্ধ হওয়ার দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে শুরু হয়ে যায় আরেকটার ঘণ্টা। অসহ্য! এক মুহূর্তও স্বস্তির ব্যবস্থা নেই। স্নায়ুগুলোকে তীক্ষ্ণ চিরুনি দিয়ে আঁচড়াচ্ছে যেন কেউ। দেহের একেকটা অংশ এপিলেপটিক কনভালশনের মত আলাদাভাবে লাফাচ্ছে তড়াক তড়াক। পাগলা গারদে রোগীর উপর ইলেকট্রিক শক প্রয়োগ করলে কারও কারও হাড়গোড় ভেঙে যায় কেন বুঝতে পারল রানা। এই প্রচণ্ড শব্দের আক্রমণ ইলেকট্রিক শকের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে অনেক বেশি, কিন্তু অঙ্গহানির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

কতক্ষণ সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারল না রানা। এই অবস্থায় সময়ের হিসেব রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হঠাৎ একসময় পরিষ্কার বুঝতে পারল, অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে সে! ঘোলা হয়ে আসছে ওর কাছে সবকিছু। হোক, ভাবল রানা। যদি সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে যায়, এই যন্ত্রণার চেয়ে সেটা বরং অনেক ভাল। চরম পরাজয় হয়েছে এবার ওর, হেরে গেছে সে। এ পর্যন্ত যে-ই ওর সংস্পর্শে এসেছে, সে-ই মারা পড়েছে। যেখানেই গিয়েছে, দুষ্টগ্রহের মত অশুভ ছায়া ফেলেছে সে। মারিয়া শেষ, ইসমাইল শেষ, বিট্রিক্স শেষ, ওর ভাই হেনরী শেষ—আজ সন্ধেয় শেষ হয়ে যাবে সোহানাও। যাক সব শেষ হয়ে যাক, সেইসাথে সে নিজেও। শেষ হয়ে যাক একটা অশুভ পরিচ্ছেদ।

হঠাৎ মনে হলো, সোহানা আশা করবে ওকে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করবে, ওর স্বপ্নের রাজকুমার মাসুদ রানা যেমন করেই হোক রক্ষা ওকে করবেই। শুধু আশা নয়, বিশ্বাস করবে সোহানা—মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও রানার প্রতি ওর অটল বিশ্বাস নড়বে না একচুল। গলায় ফাঁস পরেও ভাববে, আর দেরি নেই, এই রানা পৌঁছুল বলে। কিন্তু আসলে পৌঁছুতে পারবে না রানা। নিজেই শেষ হয়ে বসে আছে সে।

হঠাৎ একজোড়া কাঁচাপাকা ভুরু দেখতে পেল রানা। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা। যেন বলছে রানাকে: তোমাকে কি শিক্ষা দিয়েছি আমি রানা? বলেছি না, ভেঙে যাবে, কিন্তু কিছুতেই বাঁকবে না? সাবধান! বাঁকা হয়ে যাচ্ছ তুমি, রানা। তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি আমি সোহানাকে। যেমন করে পারো বাঁচাও ওকে। হাল ছেড়ো না। চারপাশে চেয়ে দেখো, উপায় আছেই কিছু না কিছু। সব সমস্যারই সমাধান আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। না, স্যার। কোনও উপায় নেই, আমি পারলাম না। যদি পারেন, ক্ষমা করে দেবেন।

কোমল হয়ে এল বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি। রানা! তোমাকে হারাতে খুব খারাপ লাগবে আমার। খুবই কষ্ট হবে। বুড়ো মানুষটাকে এত দুঃখ দেবে? চারপাশটায় একটু দেখোই না চেয়ে, নিশ্চয়ই উপায় আছে কিছু। তোমার নাগালের মধ্যেই।

ঝট্ করে দেয়ালের দিকে ফিরল রানা ঘোর কাটিয়ে উঠে। মৃগী রোগীর মত থরথর করে কাঁপছে ওর সারা শরীর, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে হাত-পা আপনাআপনি স্নায়বিক ঝাঁকুনি খেয়ে। দুই এক সেকেন্ডের বেশি কোনদিকে স্থির থাকতে চাইছে না চোখের দৃষ্টি। তবু চাইল এদিক ওদিক: কিছুই চোখে পড়ল না ওর। কোন উপায় নেই কোনদিকে। এমনি সময়ে কোনরকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ তীব্রতম হয়ে উঠল মাথার ভেতর শব্দের যন্ত্রণা। মস্ত একটা ঘড়ি প্রচণ্ড শব্দে সময়-সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়েছিল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল রানা আবার—মনে হলো, মস্ত এক মুগুর দিয়ে পিটাচ্ছে কেউ ওর কানের উপর। একেকটা ঘন্টার শব্দে লাফিয়ে আধহাত শূন্যে উঠে যাচ্ছে ওর শরীরটা।

বারোটা বেজে এবং বাজিয়ে দিয়ে থামল ঘড়িটা। তীব্র যন্ত্রণার একচুল পরিমাণ উপশম হতেই খানিকটা ঝিমিয়ে নিতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময়ে আবার মনের ভেতর কথা বলে উঠল কেউ: কই, দেখলে না?

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, কথা বলছে আর কেউ না, ওর নিজেরই অবচেতন মন। এই মনের কথা জীবনে কখনও উপেক্ষা করেনি সে। খামোকা ভরসা দেবে না এ মন কাউকে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছে মনটা রানাকে, স্পষ্ট ভাষা জানা নেই বলে স্পষ্ট করে বলতে পারছে না।

আবার ফিরল রানা দেয়ালের দিকে। এইবার চোখে পড়ল ফুটো দুটো। চোখে আগেই পড়েছিল, কিন্তু সচেতন মনে তার কোন ছাপ পড়েনি। কিসের ফুটো? দেয়ালের গায়ে এইরকম ফুটো সৃষ্টি হওয়ার কি কারণ? চিন্তাশক্তি

এতই ত্রাস পেয়েছে রানার যে এই কারণটা বুঝতেই পেরিয়ে গেল ওর অনেকক্ষণ সময়। ওটা যে কনসীলড ওয়েরিঙের একটা প্লাগ পয়েন্ট, সে কথা মাথায় এল প্রবল আর এক ঝাঁকুনি খেয়ে দেয়ালের সাথে মাথাটা ঠুকে যেতেই। বহু কষ্টে উঠে বসল রানা।

হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ইলেকট্রিক কেবলের দুই মাথা খুঁজে পেতেই পেরিয়ে গেল এক যুগ। তারের দুই মাথা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল রানা দু'দিক থেকেই খানিকটা করে তার বেরিয়ে রয়েছে। আশার আলো জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। তারের দুই মাথা সকেটের দুই ফুটোর মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করছে সে এখন। ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সুঁইয়ে সুতো পরাবার চেষ্টা করছে যেন সে সুঁই বা সুতো কোনটার দিকে না চেয়ে। কিছুতেই ফুটো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাঁতে দাঁত চেপে মনোযোগ স্থির রাখবার চেষ্টা করছে সে কিন্তু কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। একবার পেছন ফিরে দেখে নিল, কিন্তু তার ঢোকাবার চেষ্টা করতে গেলেই হারিয়ে যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, অনুভব করতে পারছে রানা। একটা ফুটোয় তার ঢুকিয়ে দ্বিতীয়টা খুঁজছে এখন সে, সামনের দিকে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু চোখে আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, নীরবে চিৎকার করছে সে যন্ত্রণায়। হাল ছেড়ে দেয়ার ঠিক পরমুহূর্তে ঝাঁঝাল একটা নীলচে-সাদা আলো দেখতে পেল রানা, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

হয়তো কয়েক সেকেন্ড, কিংবা হয়তো কয়েক মিনিট, ঠিক কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল বলতে পারবে না রানা। জ্ঞান যখন ফিরল তখন মনে হলো ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠেছে সে। অপূর্ব শান্তিময় নীরবতা বিরাজ করছে চারপাশে। অখণ্ড নীরবতা নয়, বহুদূর থেকে হালকাভাবে হট্টগোলের আওয়াজ আসছে ওর কানে। ঢং ঢং করে আরেকটা ঘড়ির ঘণ্টা শুরু হতেই সব মনে পড়ে গেল ওর। সকেটের ভেতর একই তারের দুই মাথা ঢুকিয়ে ফিউজ করে দিয়েছে সে ইলেকট্রিক লাইন, ফলে বন্ধ হয়ে গেছে শব্দের নির্যাতন। উঠে বসল রানা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। অনুভব করল টপটপ করে রক্ত পড়ছে ওর চিবুক বেয়ে, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কখন যে ঠোঁট কামড়ে কেটে ফেলেছে টের পায়নি। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সারা শরীর। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে দুচোখ ভেঙে।

মিনিট দুয়েক কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপিয়ে বেশ অনেকটা সামলে নিল রানা। তারপর মনে পড়ল ওর, ফিরে আসবে রজার আর স্পিনোযা খানিক বাদেই। এইভাবে ওকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখলে কি ঘটেছে বুঝে নিতে দেরি হবে না ওদের। চট করে চোখ গেল ওর দরজার দিকে। কেউ নেই।

শুয়ে পড়ল সে আবার। গড়াগড়ি শুরু করল মেঝের উপর। আধ-মিনিটের মধ্যেই একজোড়া মাথা দেখতে পেল সে কাচের ওপাশে। আর এক ধাপ বাড়িয়ে দিল রানা গড়াগড়ি, মাঝে মাঝে লাফিয়ে হাতখানেক শূন্যে উঠে যাচ্ছে

ওর শরীরটা, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা, কখনও টিপে বন্ধ করে রাখছে চোখ, কখনও বড় করে ফেলছে যতটা সম্ভব।

অনাবিল হাসি দেখতে পেল রানা রেভারেন্ড রজারের মুখে। সরল, মধুর হাসি। স্পিনোযার দুই চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে, হয়তো ভাবছে, রানার যন্ত্রণা আরও কোন উপায়ে বাড়ানো গেলে ভাল হত।

অভিনয় করতে গিয়ে টের পেল রানা, এতেও যথেষ্ট কষ্ট; আসল কষ্টের চেয়ে খুব কম না—কাজেই জোরেসোরে একটা লাফ দিয়ে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে মেঝের উপর পড়েই স্থির হয়ে গেল।

হাসিমুখে ঘরে ঢুকল রজার। স্পিনোযাকে ইঙ্গিত করতেই ঘড়িগুলো বন্ধ করতে শুরু করল সে। নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে অ্যামপ্লিফায়ারের সুইচ অফ করে দিল। বড় বড় ঘড়িগুলো বন্ধ করে দিয়ে রানার পাশে চলে এল স্পিনোযা, দড়াম করে একটা লাথি মারল ওর পাঁজরে। কেঁপে উঠল রানার সর্বশরীর, কিন্তু টু শব্দ না করে মনে মনে ওর বাপ-মা তুলে কয়েকটা গালি দিয়েই সান্ত্বনা খুঁজল রানা।

'উহুঁহুঁ!' মাথা নাড়ল রজার। 'ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সামলে নিতে হবে তোমার, স্পিনোযা। শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকলে চলবে না। ব্যাপারটা পছন্দ করবে না পুলিস।'

'দাগ তো পাওয়া যাবেই, স্যার। ওর মুখটা দেখুন না।' প্রতিবাদ করল স্পিনোযা।

'ওগুলো দুপুরের দাগ। পুরানো। নতুন দাগ আর চাই না। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও, এসব চিহ্নও রয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। হেডফোনটা খুলে নিয়ে প্লাস্টারগুলো আবার সাঁটিয়ে দাও জায়গামত।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে বাঁধন খুলে দেয়া হলো রানার হাত-পায়ের। এয়ারফোন খুলতে গিয়ে স্কচটেপগুলো এমনভাবে টেনে তুলল স্পিনোযা যে রানার মনে হলো চামড়া তুলে নেয়া হচ্ছে ওর গাল থেকে।

'এবার ওইটাকে···' হেনরীর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল রজার, 'গায়েব করে দেয়ার ব্যবস্থা করো। কিভাবে কি করতে হবে বলেছি, দেখো, আবার নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না। আর এটা যেমন আছে থাক এখন। আমি গিয়ে মার্সেলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আধঘন্টার মধ্যে—ও এসে ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করবে, তারপর দুজন মিলে যেমন যেমন বলেছি, লিখেও দিয়েছি, লিস্ট দেখে একে একে করবে।' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল সে রানার দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বুদ্ধি ছিল লোকটার। তিনদিনে পাগল করে তুলেছিল আমাদের। কী জীবন! চলন্ত ছায়া যেন! কী যে কার পরিণতি, কেউ বলতে পারে না।' চোখ তুলে চাইল স্পিনোযার দিকে। 'চলি, খেয়াল রেখো, কোথাও কোন ভুল না হয়।'

'ভুল হবে না, স্যার।'

লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগোল ডক্টর রজার। গুনগুন করে সুর

ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্পিনোযাও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ফিরে এল এক মিনিটের মধ্যেই—হাতে ডজনখানেক বড় বড় পেন্ডুলাম। রানার পাশ থেকে একটা তার তুলে নিয়ে ওগুলোর আইলেটের মধ্যে দিয়ে তার ঢুকিয়ে মালা গেঁথে ফেলল একটা। এবার সেই মালাটা হেনরীর কোমরে পরিয়ে দিয়ে ঘাড়ের কাছে কোটটা খামচে ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মেঝের উপর হেনরীর জুতো ঘষার শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। উঠে পড়ল সে, হাতদুটো মুঠো করল বারকয়েক, ভাঁজ করল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে এগোল দরজার দিকে।

দরজার কাছে পৌঁছুতেই মার্সিডিজের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল রানার কানে। দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখল হেনরীকে মেঝের উপর ফেলে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের কাউকে স্যালিউট করছে স্পিনোযা। নিশ্চয়ই ডক্টর রজারকে। ছায়ার মত নিঃশব্দে এগোল রানা।

স্যালিউট সেরে হাসিমুখে পেছন ফিরল স্পিনোযা হেনরীকে তুলে জানালা গলিয়ে নিচের পরিখায় ফেলবার জন্যে। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীরটা, মুখ দেখে মনে হচ্ছে জমে পাথর হয়ে গেছে। পাঁচফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা। ওর মুখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার টের পেল রানা, বুঝে গেছে স্পিনোযা—বুঝে গেছে, অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। তবু শেষ চেষ্টা করল লোকটা। ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বের করার চেষ্টা করল পিস্তলটা পকেট থেকে। কিন্তু কলজের মধ্যে মৃত্যুভয়ের ছ্যাঁকা লেগে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাত-পা, কাজ করতে পারে না ঠিকমত। এক সেকেন্ডের এদিক ওদিকেই নির্ধারিত হয়ে গেল জয়-পরাজয়। পিস্তলটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঘুসি এসে পড়ল ওর সোলার প্লেক্সাসে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ মুখ বানিয়ে বাঁকা হয়ে গেল স্পিনোযা সামনের দিকে। পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল রানা প্রায় বিনা বাধাতেই, ধাঁই করে মারল সে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর চোখ আর কানের মাঝখানে রগের উপর। প্রায় একইঞ্চি নিচু হয়ে গেল জায়গাটা, কলকল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল স্পিনোযা। দড়াম করে মারাত্মক লাথি এসে পড়ল ওর তলপেটে। উরুর পেছন দিকটা বাধল উইন্ড-সিলে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত ডিগবাজি খেয়ে জানালার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল স্পিনোযার শরীরটা। পিস্তল হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা যতক্ষণ না নিচ থেকে ঝপাৎ শব্দ কানে এল।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে নিচের দিকে চাইল রানা। ঢেউ দেখতে পেল সে পরিখার জলে, বাড়ি খাচ্ছে দুপাশের দেয়ালে। ঠিক মাঝখানটায় বুদ্বুদ উঠছে পানির নিচ থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে বামদিকে চাইল রানা। দুর্গের খিলানের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ডক্টর রজারের সাদা মার্সিডিজ।

দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল রানা। ব্রিজ পেরোতে গিয়ে আবার একবার চাইল পরিখার দিকে। বুদ্বুদগুলো ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। সুড়কি বিছানো রাস্তা ধরে দৌড়োতে শুরু করল সে খিলানের দিকে।

নয়

অস্টিনের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে হাতের পিস্তলটার দিকে চাইল রানা। ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল নিজেকে, এই নিয়ে কয়বার হাতছাড়া করতে হলো পিস্তলটা? দেখা যাচ্ছে, যার খুশি সে-ই কেড়ে নিচ্ছে এটা ওর হাত থেকে—যেন ছেলের হাতের মোয়া। যতখানি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে ওর তাতে এটাই স্বাভাবিক। আবারও যদি খোয়াতে হয় এটাকে, অবাক হওয়ার কিছুই নেই! কিন্তু গত দুইবার এটা হারিয়ে যে পরিমাণ পিট্টি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, সেটার পুনরাবৃত্তি আর চায় না সে। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, আরও একটা পিস্তল সাথে রাখা।

কাজেই সীটের নিচ থেকে বিট্রিক্সের হ্যান্ডব্যাগটা বের করে আনল রানা। ছোট্ট লিলিপুট পিস্তল, যেটা আত্মরক্ষার জন্যে দিয়েছিল সে বিট্রিক্সকে, যেটা দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যবহার করতে পারেনি বলে প্রাণ হারাতে হয়েছে ওকে এবং ওর ভাইকে, সেটা বের করে আনল রানা হ্যান্ডব্যাগ থেকে। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে ফুলপ্যান্টের ডান পা-টা উঁচু করল সে কয়েক ইঞ্চি, ব্যারেলটা নিচের দিকে রেখে গুঁজে দিল পিস্তলটা মোজার ভেতর। আরেকটু ঠেসে গোড়ালির পাশ দিয়ে জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে পিস্তলের নাকটা, তারপর মোজাটা তুলে দিল উপরে।

শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল। পুরানো শহরের দিকে চলল রানা যত দ্রুত সম্ভব। ওয়েরহাউজের রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। রাস্তায় একটা জনপ্রাণীও নেই বটে, কিন্তু ভলেনহোভেন কোম্পানীর তেতলার একটা জানালায় লোক দেখতে পেল রানা। উইন্ডো-সিলের উপর কনুই রেখে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাচ্ছে একজন তাগড়া চেহারার লোক। হাওয়া খাওয়ার উদ্দেশ্যে যে নয়, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। দালানটার সামনে দিয়ে গতি পরিবর্তন না করে এগিয়ে গেল রানা, গলির শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিল ডাইনে। ড্যামের কাছাকাছি ফিরে গিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে ডায়াল করল কর্নেল ডি গোল্ডের নাম্বারে।

'সারাটা দিন কোথায় ছিলেন আপনি?' রানার গলা শুনেই বিরক্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'কোথায় কি করে বেড়াচ্ছেন, এদিকে আমরা দুশ্চিন্তায়...'

'অত চিন্তার কি আছে? আমি তো আর ছোট্ট খোকা নই!' গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। 'আমার ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট। সবকিছু জানাবার জন্যে প্রস্তুত আমি এখন।'

'দ্যাটস্ গুড! জানান।'

'এখানে নয়। টেলিফোনে বলা যাবে না। ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারকে নিয়ে আপনি এক্ষুণি ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীতে চলে আসতে

পারবেন? আমি এখন ওখানে চলেছি।'

'ওখানে আপনি সবকিছু জানাবেন আমাদের?'

'কসম।'

'বেশ। আসছি।'

'একটা কথা…প্লেন ভ্যানে করে আসবেন। গলিমুখেই ভ্যান ছেড়ে দিয়ে হেঁটে ঢুকবেন গলিতে। প্রহরী রয়েছে ওদের তেতলার জানালায়।'

'প্রহরী?'

'হ্যাঁ। তবে ওকে অন্যমনস্ক করবার ব্যবস্থা আমি করব। আপনারা রওনা হয়ে যান।'

'সাথে আরও লোক আনব?'

'না। শুধু আপনারা দুজন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা স্টোর থেকে এক পাউন্ড নাইলন কর্ড কিনল রানা, সেই সাথে কিনল বড়সড় একটা পানির পাইপ টাইট দেয়ার ভারী রেঞ্চ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভলেনহোভেন কোম্পানীর একশো গজের মধ্যে পার্ক করে রাখল রানা অস্টিনটা—ওই গলি দিয়ে না ঢুকে তার আগের গলিটা দিয়ে ওয়েরহাউজের পেছন দিকে চলে এসেছে সে। দুই সমান্তরাল গলি কিছুদূর অন্তর অন্তর দুটো সুইপার প্যাসেজ দিয়ে পরস্পর যুক্ত, আগেই লক্ষ করেছিল রানা। প্রথম প্যাসেজ দিয়ে কিছুদূর গিয়েই একটা ফায়ার-এসকেপ দেখতে পেল সে। কিন্তু এটার সাহায্যে ছাদে উঠলে ভলেনহোভেন কোম্পানীর দালানটা বেশ অনেকটা দূর পড়ে যাবে মনে করে পুরো গলিটা খুঁজল সে কাছাকাছি আর কোন ফায়ার-এসকেপ পাওয়া যায় কিনা। পাশের গলিটাও দেখল—কিন্তু আর একটাও ফায়ার-এসকেপ চোখে পড়ল না ওর।

ফিরে এসে অপ্রশস্ত, অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাতে উঠে পড়ল রানা। পিচ্ছিল ছাতের উপর দিয়ে হেঁটে কিনারে চলে এল। ছয়সাতটা বাড়ি ডিঙোলে পৌঁছুবে সে লক্ষ্যস্থলে। এই ছাতের থেকে পাশের বাড়ির ছাতের দূরত্ব ছয়ফুট, লাফ দেয়া ছাড়া ডিঙোবার আর কোন উপায় নেই। লাফ দেয়ার মুহূর্তে যদি দয়া করে পা-টা একটু পিছলায়, তাহলেই সব খেলা শেষ—হুড়মুড় করে পড়বে গিয়ে ষাট ফুট নিচে। আবছা আঁধারে ধোঁকা লাগছে চোখে, তবু আল্লা ভরসা বলে তিন কদম দৌড়ে লাফ দিল রানা। এইভাবে টপকাতে গিয়ে চতুর্থ ছাতে এসে পিলে চমকে গেল ওর, যখন ছয়ফুট আন্দাজের লাফ দিয়ে দেখল পাশের ছাতটা আট ফুট দূরে। ভাগ্যিস ফুট দুয়েক মার্জিন রেখেই দিয়েছিল লাফটা—একেবারে কিনারে পড়েই চট করে হাঁটু ভাঁজ করে বসে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল মাঝের দিকে। আর দুটো ছাত পেরিয়ে পৌঁছে গেল সে ভলেনহোভেনের মাথায়। রাস্তার দিকে কিনারায় গিয়ে সামনে ঝুঁকে দেখল, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে, প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট নিচে জানালা দিয়ে মাথা বের করে রেখেছে লোকটা। একবার এপাশে তাকাচ্ছে, একবার ওপাশে।

স্টীলসন রেঞ্চের হাতলের শেষ মাথার ফোকরে নাইলন কর্ডের একমাথা

বাঁধল রানা শক্ত করে। তারপর হয়েস্টিং বীম থেকে বেশ কিছুটা তফাতে শুয়ে পড়ল ছাতের কিনারে বুক পর্যন্ত রাস্তার দিকে বের করে। বিশফুট আন্দাজ রেঞ্চটা নামিয়ে দোলাতে শুরু করল সে পেন্ডুলামের ভঙ্গিতে। প্রতিটা দোলের সাথে সাথেই রানার হাতের ছোট্ট একটা টান পড়ছে, ফলে ক্রমেই বাড়ছে ওটার গতিবেগ। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সারবার তাগিদ অনুভব করছে রানা, হয়েস্টিং বীমের ঠিক নিচেই পাঁচতলার যে লোডিং প্ল্যাটফর্ম, তার পাশের ভেড়ানো দরজার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছে সে। যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে দরজাটা। কেউ যদি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়, পরিষ্কার দেখতে পাবে রানাকে।

কমপক্ষে তিনসের ওজন হবে রেঞ্চটার। প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে দুলছে এখন। সাবধানে আরও কয়েক ফুট নামিয়ে দিল রানা ওটাকে। ভয় হলো কখন না জানি লোকটা আবার উপরদিকে চায়। মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শব্দ হচ্ছে, কানে গেলেই চট করে চাইবে লোকটা উপরে।

কিন্তু লোকটার খেয়াল এদিকে থাকলে তো টের পাবে! ওর সমস্ত মনোযোগ এখন গলির মুখের দিকে। গলিটা পেরিয়েই থেমে দাঁড়িয়েছে একটা নীল ভ্যান। যদিও দেখা যাচ্ছে না ওটাকে, এঞ্জিনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। এর ফলে দু'দিক থেকে সুবিধে হলো রানার। তেতলার প্রহরী ব্যাপারটা ভালমত বোঝার জন্যে মাথাটা আর একটু বের করল সামনের দিকে। আর এঞ্জিনের গুঞ্জন ঢেকে দিল ওর মাথার উপর দোদুল্যমান রেঞ্চের বাতাস কাটার শব্দ।

হঠাৎ থেমে গেল এঞ্জিনের শব্দ। রেঞ্চটা ঝুলের শেষ সীমায় পৌঁছে নেমে আসছে আবার। সড়সড় করে আরও তিনফুট আন্দাজ ঢিল দিল রানা নাইলন কর্ডে। হঠাৎ টের পেল প্রহরী যে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। কিছু একটা সন্দেহ করে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে উপরদিকে। সাথে সাথেই দড়াম করে কপালের উপর এসে পড়ল স্টীলসন রেঞ্চ। শব্দ শুনে রানার মনে হলো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে লোকটার মাথার খুলি। রশি ধরে টেনে রেঞ্চটা তুলে আনতে আনতে দেখল, জানালার চৌকাঠের উপর দুই ভাঁজ হয়ে ঝুলে রয়েছে লোকটা বেড়ার গায়ে শুকোতে দেয়া কাপড়ের মত।

কর্নেল ডি গোল্ড আর ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারকে দেখতে পেল রানা। দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে এইদিকে। ডানহাতে ওদের আরও দ্রুত আসবার ইঙ্গিত করে জুতোর মধ্যে গোঁজা পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা হয়েস্টিং বীমের উপর, তারপর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে কামড়ে ধরল দাঁতের ফাঁকে। এবার দুই হাতে বীমটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। বার দুয়েক দোল খেয়ে সামনের দিকে এগোবার সময় হাত ছেড়ে দিল রানা।

লোডিং প্ল্যাটফর্মের রেলিং নেই, কাজেই কয়েকটা কাজ একসাথে

করতে হলো রানাকে। বাম পা প্ল্যাটফর্ম স্পর্শ করবার সাথে সাথেই ডান পা দিয়ে জোরে একটা লাথি মারল সে দরজার গায়ে, দরজাটা হাঁ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বাম হাতে চট করে চৌকাঠ ধরে বাঁচল ছিটকে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে। ততক্ষণে ডানহাতে চলে এসেছে পিস্তল। দ্রুত বারতিনেক চোখ মিটমিট করে সহ্য করে নিল ঘরের উজ্জ্বল আলো, তারপর পিস্তল হাতে ঢুকল ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর বসে আছে দুইজন, দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। সোহানার পরনে ব্রেসিয়ার আর ছোট্ট জাঙিয়া, মাথার চুল মস্ত এক খোঁপায় বাঁধা। ওর নগ্ন ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরে আছে বিশাল মোটা ভলেনহোভেনের একটা থলথলে হাত, সোহানার নাভির কাছে নাক ঘষছে, আর ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসছে লোকটা অশ্লীল হাসি। ছটফট করছে সোহানা, এঁকেবেঁকে ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। কাছেই একটা চেয়ারে বসে মসৃণ হাসি হাসছে রেভারেন্ড ডক্টর নিকোলাস রজার।

দেখতে দেখতে বদলে গেল সবার চেহারা। ভলেনহোভেনের হাসিটা মুখ থেকে ধাপে ধাপে মিলিয়ে গিয়ে কদাকার ভীতির ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখের উপর। রানাকে দেখার সাথে সাথেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল নিকোলাস রজার, মুহূর্তে হাঁ হয়ে গেল মুখ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে রানার মুখের দিকে। ফ্যাকাসে হতে হতে ওর মাথার পাকা চুলের মতই সাদা হয়ে গেল ওর মুখটা। দুই পা এগিয়ে গেল রানা ঘরের ভেতর। কয়েক সেকেন্ড অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে ছিল সোহানা, রানাকে নড়ে উঠতে দেখেই এক ঝটকায় কোমর থেকে ভলেনহোভেনের হাত ছাড়িয়ে প্রায় উড়ে এসে পড়ল ওর বুকে। সোহানার বুকের ভেতর কী জোরে হাতুড়ি পিটছে টের পেল রানা। মৃদু দুটো চাপড় দিল সে ওর পিঠে, তারপর মুচকে হাসল রজারের দিকে চেয়ে।

'হ্যালো, রেভারেন্ড? পরমেশ্বরের ডাক শুনতে পাচ্ছেন?'

যা বোঝার বুঝে নিয়েছে দু'জনই। বিনা বাক্যব্যয়ে হাত তুলল দুজন মাথার উপর। পিস্তলটা দুজনের ঠিক মাঝ বরাবর তাক করে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা ডি গোল্ড আর মাগেনথেলারের অপেক্ষায়। ধুপধাপ জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সিঁড়িতে। রিভলভার হাতে হুড়মুড় করে প্রথমে ঢুকল কর্নেল, হাঁপাচ্ছে হাঁ করে; তার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার, ভাবের লেশমাত্র নেই মুখের চেহারায়, পাথর।

'এসব কি!' তাজ্জব চোখে উপস্থিত সবার মুখের উপর দৃষ্টি বোলাল ভ্যান ডি গোল্ড। 'এই দুই ভদ্রলোকের দিকে পিস্তল ধরে রেখেছেন কেন? আপনার...'

'ব্যাখ্যা করে বললেই সব বুঝতে পারবেন, কর্নেল।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রানা।

'ঘোলাটে কোন ব্যাখ্যায় চলবে না, মেজর রানা,' বলল মাগেনথেলার। 'কেন আপনি শহরের দু'জন অত্যন্ত উচ্চ সম্মানিত, নামজাদা নাগরিককে...'

'আর হাসাবেন না, ইন্সপেক্টর,' বলল রানা। 'গাল কোঁচকালেই ব্যথা লাগছে।'

'সেটারও ব্যাখ্যা দরকার।' বলল ডি গোল্ড। 'আপনার চেহারার এই হাল…'

'সব বলছি। শুরু করতে পারি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল ডি গোল্ড।

'আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল কর্নেল।

সোহানার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি জানো, মারা গেছে মারিয়া?'

'জানি। এই একটু আগেই বলছিল লোকটা।' রজারের দিকে চাইল সোহানা। 'বলছিল, আর হাসছিল। তোমার মৃত্যুর খবরও পেয়েছিলাম ওর কাছেই। ও বলছিল, ঘড়িঘরের মধ্যে…'

'আমার ব্যাপারে ভুল বলেছিল। ওর জানা ছিল না যে ইলেকট্রিক কারেন্ট ফিউজ করে দিয়ে কোনমতে বেঁচে গিয়েছি আমি এ যাত্রা ওর হাত থেকে। তবে মারিয়ার ব্যাপারে ঠিকই বলেছে ও। আমার চোখের সামনে হে-ফর্ক দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে ওকে।' ডি গোল্ডের দিকে ফিরল রানা। 'এই নিন, বিট্রিক্স শেরম্যানের হত্যাকারীকে তুলে দিচ্ছি আমি আপনার হাতে। সাইকোপ্যাথিক কিলার রেভারেন্ড ডক্টর নিকোলাস রজার। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে আমার কাছে। এ-ই হচ্ছে বিট্রিক্স শেরম্যান, হেনরী শেরম্যান আর ইসমাইল আহমেদের হত্যাকারী। এরই ইঙ্গিতে আজ দুপুরে মোরব্বার মত করে হে-ফর্ক দিয়ে কেচে মারা হয়েছে মারিয়াকে।'

'আপনার চোখের সামনে?'

'হ্যাঁ। হাত-পা বেঁধে নেয়া হয়েছিল আমার। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন তিনবার খুন করবার চেষ্টা করেছে সে আমাকেও। এই লোকই মৃত্যুপথযাত্রী নেশাখোরের হাতে তুলে দেয় নিজের বোতল—শুধু মজা দেখবার জন্যে।'

'এ-ও কি সম্ভব!' কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ডি গোল্ড রানার কথাগুলো। 'সে কি করে হবে…না, না, এটা হতেই পারে না! ডক্টর রজার? একজন ধর্মযাজক…'

'ওটা ছদ্মবেশ। আপনাদের জানা নেই, কিন্তু ইন্টারপোলের ফাইলে ওর নাম লেখা আছে। অবশ্য নিকোলাস রজার হিসেবে নয়, ওর আসল নামে। ওর আসল নাম হচ্ছে লুকা বার্যিনি। ঈস্টার্ন সিবোর্ড কোসা নোস্ট্রার প্রাক্তন সভ্য। কিন্তু মাফিয়া হজম করতে পারেনি ওকে। ব্যবসার প্রয়োজনে ছাড়া খুন করে না মাফিয়া, এমন কি ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ পর্যন্ত নেয় না যদি সেইসাথে কিছু টাকার প্রশ্ন জড়িত না থাকে। কিন্তু বার্যিনি হত্যা করে শুধু হত্যারই খাতিরে। মার্ডার ফর মার্ডারস্ সেক। আলটিমেটাম পেয়ে ইউনাইটেড স্টেটস ছেড়ে চলে আসতে হয় ওকে—মাফিয়ার হাতে খুন হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচবার এছাড়া আর কোন পথ ছিল না।'

'এসব কী বলছেন আপনি!' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে নিকোলাস রজার রানার মুখের দিকে। 'এসব অত্যন্ত অন্যায়, মানহানিকর কথাবার্তা। যার তার নামে যা খুশি তাই বলতে পারেন না আপনি, মেজর মাসুদ রানা।' মুখে যাই বলুক, রানার কথা শুনে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে ওর চেহারাটা। 'একজন নিরীহ…'

'চুপ করুন!' ধমকে উঠল রানা। 'আপনার হাতের ছাপ থেকে নিয়ে সিফ্যালিক ইনডেক্স পর্যন্ত রয়েছে আমাদের কাছে। ধোঁকাবাজি করে কোন লাভ হবে না। বোকার ভান করে কিছুতেই বাঁচতে পারবেন না আপনি, লুকা বার্যিনি। আপনার অতীত জানা আছে আমাদের, বর্তমান সম্পর্কে এবার কিছুটা আলোকপাত করা যাক। সাইকোপ্যাথ হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হবে সেটাই প্রধান নয়—আপনার বিরুদ্ধে আসল চার্জ হচ্ছে: হেরোইন ব্যবসা পরিচালনা। বড় চমৎকার সিসটেম তৈরি করে নিয়েছিলেন যাহোক। একেবারে ফুলপ্রুফ। কারও কিছু টের পাওয়ার উপায় নেই। মাল নিয়ে আসছে কোস্টার, জানা কথা, অথচ সার্চ করে পাওয়া যায় না কিছুই। বন্দরে ভিড়বার আগেই বিশেষ একটা বয়ার পাশে সমুদ্রের নিচে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে সীল করা স্টীলের বাক্স। সেই রাতেই একটা বার্জ রওনা হচ্ছে হাইলারের উদ্দেশে—যাবার পথে রশিতে রড বেঁধে তুলে আনছে বয়া, নোঙর, তারপর সেই স্টীলের বাক্স, হাইলারের একটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বাক্সটা, সেখান থেকে বিশেষভাবে চিহ্ন দেয়া পুতুলের মধ্যে করে চালান হয়ে আসছে এই ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীর ওয়েরহাউজে। কি? ঠিক বলিনি?' ভুরু নাচাল রানা ভলেনহোভেনের উদ্দেশে।

হাঁ হয়ে রয়েছে মোটা লোকটার মুখ, কোন জবাব দিতে পারল না, বারকয়েক ঢোক গিলল কেবল। কিন্তু ছটফট করে উঠল নিকোলাস রজার। বলল, 'প্রিপস্টারাস! পাগলের প্রলাপ। একটা কথাও প্রমাণ করতে পারবেন না আপনি, মেজর রানা।'

'প্রমাণ তো আপনিই দিচ্ছেন, রেভারেন্ড। আমার নাম জানলেন কি করে আপনি? বলুন?' ওকে চুপ করে থাকতে দেখে নির্দয় হাসি হাসল রানা। 'আসলে কোন প্রমাণের দরকার নেই আমার। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজহাতে খুন করতে যাচ্ছি আমি আপনাকে। যাই হোক, কি যেন বলছিলাম?' কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'অত্যন্ত নিখুঁত একটা চক্র তৈরি করে নিয়েছিল লুকা বার্যিনি। ব্যারেল অর্গানবাদক বুড়ো থেকে নিয়ে স্ট্রিপ-টীজ ডান্সার পর্যন্ত, হোটেলের ওয়েটার থেকে নাইট-ক্লাবের হোস্টেস পর্যন্ত দলের প্রত্যেকে উঠছে বসছে ওর আঙুলের ইশারায়। টুঁ শব্দ বেরোচ্ছে না কারও মুখ থেকে, জানা আছে সবার—বেরোলেই মৃত্যু অবধারিত। ইতিমধ্যে সবারই জানা হয়ে গেছে এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের আসল রূপ। নিষ্ঠার সাথে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে সবাই, কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ প্রাণের ভয়ে।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন করল ডি গোল্ড। 'কি কাজ করছে ওরা?'

'সোজা ভাষায় বলতে গেলে—পুশিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং। হেরোইনের কিছুটা অংশ রয়ে যাচ্ছে এখানে বিদেশে রপ্তানির জন্যে, কিছু চলে যাচ্ছে অ্যামস্টার্ডামের বিভিন্ন দোকানে। কিছু ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে ভ্যানে করে ভন্ডেল পার্ক এবং অন্যান্য জায়গায়। লুকা বার্যিনির মহিলা ফোর্স বিভিন্ন দোকান থেকে বিশেষ চিহ্ন দেয়া পুতুল কিনে সাপ্লাই দিচ্ছে ছোট ছোট স্টোর, হোটেল আর নাইট-ক্লাবে, ভ্যান থেকে সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে ব্যারেল-অর্গানবাদকদের—ওরা আবার বিক্রি করছে রিটেলে।'

'কিন্তু এইরকম আনন্দমেলা চলছে, আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছি না কেন?' জানতে চাইল ডি গোল্ড।

'সে প্রসঙ্গে আসছি আমি খানিক বাদেই। ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা শেষ হয়নি এখনও। বাইবেলের মধ্যে করে চালান দেয়া হচ্ছে হেরোইনের বেশ একটা মোটা অংশ। হাইলার থেকে অর্ধেকের বেশি হেরোইন চলে আসছে হিউগানট সোসাইটির চার্চে, ফাঁপা বাইবেলের মধ্যে ভরা হচ্ছে মাল। বার্যিনির মহিলা ফোর্সের এক অংশ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। বাইবেল হাতে যায় তারা চার্চে এই মহাপুরুষের কাছ থেকে দুই একটা কঠিন পংক্তির তাৎপর্য বুঝে নিতে, যখন বেরিয়ে আসে, তখন তাদের হাতে অন্য বাইবেল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয় এইসব বাইবেল বিনামূল্যে। এ ছাড়াও রয়েছে ঘড়ির পেন্ডুলাম। ক্যাসটিল লিন্ডেনে যে ঘড়ির কারখানা রয়েছে তার দোলকগুলো তৈরি এবং সাপ্লাই করা হয় চার্চের বেজমেন্টের এক আধুনিক ফ্যাক্টরি থেকে—ভেতরে পোরা থাকে হেরোইন। ঠিক বলেছি না, বার্যিনি? নাকি কিছু বাদ পড়ে গেছে বর্ণনায়?'

বারকয়েক মুখ খুলল এবং বন্ধ করল নিকোলাস রজার, কোন আওয়াজ বেরোল না মুখ থেকে।

পিস্তলটা তুলল রানা। সোজা চাইল রজারের চোখের দিকে।

'এইবার। রেভারেন্ড বার্যিনি। তুমি প্রস্তুত?'

মাথার উপর তুলে ধরা হাত দুটো কাঁপতে শুরু করল রজারের, দুই চোখে দেখা দিল মৃত্যুভীতি। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, এক্ষুণি টিপে দেবে রানা পিস্তলের ট্রিগার।

'সাবধান, মাসুদ রানা!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কর্নেল ডি গোল্ড। 'নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেয়া হবে না আপনাকে।'

'ওকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন অর্থই হয় না কর্নেল,' ওকালতি করছে যেন রানা। 'দিই শেষ করে। আপনারা বলতে পারবেন, পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেছে লুকা বার্যিনি।'

আর একটু তুলল রানা পিস্তলটা। ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হলো নিকোলাস রজারের চোখ। ঠিক এমনি সময়ে দিনের তৃতীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা পেছন থেকে।

'পিস্তল ফেলে দিন, মেজর রানা।'

হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা পিস্তলটা। খটাং করে মেঝের উপর পড়ল

সেটা। ধীরে ধীরে ঘুরল সে পেছন দিকে। একটা র‍্যাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইরিন মাগেনথেলার। ডানহাতে ধরা রয়েছে একটা লুগার। সোজা রানার বুকের দিকে তাক করা।

দশ

'ইরিন!' ভুরুজোড়া মাঝ-কপালে উঠে গেল কর্নেল ডি গোল্ডের। ব্যাপারটা কি ঘটে গেল কিছুতেই মাথার মধ্যে ঢুকছে না তার। 'হায় খোদা! তুমি কোত্থেকে···তোমার হাতে···' হঠাৎ থেমে গিয়ে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল। খটাং করে কব্জির উপর এসে পড়েছে একটা পিস্তলের বাঁট। হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিভলভার। হতবুদ্ধি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে আক্রমণকারীর মুখের দিকে। ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার! পিস্তলটা সোজা ধরা রয়েছে ডি গোল্ডের বুকের দিকে। মাথার উপর থেকে হাত নামিয়ে আনছে ভলেনহোভেন আর নিকোলাস রজার। মুহূর্তের মধ্যে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল ভলেনহোভেনের হাতে। বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল, 'এসব···এসব কি হচ্ছে, মাগেন···'

'শাট আপ,' ধমকে উঠল ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার। 'বসে পড়ো মেঝের ওপর।' দ্রুতহাতে সার্চ করল সে রানাকে, অস্ত্র না পেয়ে বলল, 'তুমিও, মাসুদ রানা। এমনভাবে বসবে যেন হাতদুটো সর্বক্ষণ দেখতে পাই আমি।'

বসে পড়ল রানা আর ডি গোল্ড। পদ্মাসনের মত পা ভাঁজ করে বসল রানা, বাহু দুটো রাখল উরুর উপর, ডানহাতটা আলতোভাবে ঝুলছে পায়ের গোড়ালির কাছে। মেঝের উপর থেকে রানার পিস্তল এবং কর্নেলের রিভলভারটা তুলে নিজের কোমরে গুঁজল মাগেনথেলার।

'এত দেরি করলে কেন, ইরিন?' অনুযোগের কণ্ঠে প্রশ্ন করল রেভারেন্ড রজার। ধকলটা পুরোপুরি সামলে নিতে পারেনি এখনও। 'আর একটু দেরি করলেই খতম হয়ে যেতে পারতাম, তা জানো?' একটা রুমাল বের করে ঘাম মুছল কপালের।

'উহ্! দারুণ জমেছিল মজাটা! প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি আমি।' সোহানার দিকে চাইল, তারপর চাইল ভলেনহোভেনের দিকে। 'যে পর্যন্ত এসে স্থগিত রাখতে হলো বাধা পড়ায়, আবার সেখান থেকেই শুরু করা যাক, কি বলেন?'

চকচকে চোখে সোহানার উপর একবার লোলুপ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লজ্জার ভান করল ভলেনহোভেন, 'সবার সামনে? তুমি আড়ালে লুকিয়ে দেখতে চেয়েছিলে, সে ছিল এক কথা···আর বার্যিনি আমার বাল্যবন্ধু, ওর সামনে কোন লজ্জা নেই, কিন্তু এত লোকের সামনে কাপড় ছাড়তে···'

ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারছে না দেখে একটু ব্যাখ্যা করল রেভারেন্ড

রজার, ওরফে লুকা বার্যিনি।

'ভলেনহোভেনটা একটু কামুক প্রকৃতির। আমিও ভেবে দেখলাম, মেরে যখন ফেলাই হবে, তার আগে যদি মিস সোহানা চৌধুরীকে একটু আনন্দ দেয়া যায়, আমার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না— তাই রাজি হয়ে গেলাম। মিস শেরম্যানকেও এইরকম আনন্দ দান করা হয়েছিল গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়ার আগে। একেই বা বঞ্চিত করি কেন? দশটা মিনিট সময় পেলেই কাজ সেরে বেরিয়ে পড়তাম আমরা এখান থেকে—কিন্তু বাধ সাধল এই হারামী লোকটা।' রানার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রজারের মুখে। 'হ্যালো, মাসুদ রানা? এবার আপনি পরমেশ্বরের ডাক শুনতে পাচ্ছেন?'

'এসব···এসব কি দেখছি, কি শুনছি, মেজর রানা?' বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল কর্নেল রানার মুখের দিকে।

'এই প্রসঙ্গে আসছিলাম আমি,' বলল রানা। 'একটু পরেই আমি আপনাকে জানাতাম কেন গত কয়েক বছর ধরে এদের কার্যকলাপের কিছুই টের পাননি আপনি। কেন হাজার চেষ্টা করেও এক কদমও এগোতে পারছে না অ্যামস্টার্ডাম-পুলিস। তার একমাত্র কারণ, আপনার পরম বিশ্বস্ত সহকারী, এখানকার নারকোটিক ব্যুরোর চীফ, শ্রীমান মাগেনথেলার বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন যেন কারও পক্ষে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়। শুনলে অবাক হবেন—আপনার প্রিয় ইন্সপেক্টর মাগেনথেলারই হচ্ছেন নাটের আসল গুরু, বাকি সবাই তার কুইন, বিশপ, নাইট, পন।'

'মাগেনথেলার?' চোখের সামনে প্রমাণ পেয়েও কথাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না কর্নেল পুরোপুরি। একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার যে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, বিশেষ করে মাগেনথেলারের মত একজন কঠোর নীতিপরায়ণ লোক যে এই কাজ করতে পারে, সেটা কর্নেলের ধারণার এতই বাইরে ছিল যে সব দেখার পরেও ভেতরে বিশ্বাস আসতে চাইছে না। 'এটা কি করে সম্ভব। এটা হতেই পারে না!'

'অথচ দেখা যাচ্ছে হয়ে বসে আছে,' মৃদু হাসল রানা। 'আপনার বুকের দিকে ধরা ওই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন ওর হাতে—ওটাকে আবার ললিপপ বলে মনে হচ্ছে না তো আপনার? আপনার রিভলভারটার দিকে হাত বাড়িয়েই দেখুন না একবার, ওই ললিপপটা যদি গর্জে না ওঠে তো আমার নাম নেই। কোন সন্দেহ নেই, কর্নেল, আপনার প্রিয় সহকর্মীই হচ্ছে গোটা ড্রাগ রিঙের পেছনের ক্রিয়েটিভ ব্রেন। সে-ই বস্। লুকা বার্যিনি হচ্ছে ওরই নিযুক্ত সাইকোপ্যাথিক মনস্টার। সম্প্রতি এই দানবকে বশে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে, তাই না মাগেনথেলার? দাবার বোর্ডের বিশপ আর রাণী—বিগড়ে গেছে দুটো গুটিই। তাই না?'

'ঠিক।' নিকোলাস রজারের দিকে চাইল মাগেনথেলার। এই এক চাহনিতেই বোঝা গেল কপালে দুঃখ আছে লোকটার। কঠোর দৃষ্টির সামনে মুখ শুকিয়ে গেল ওর। ভলেনহোভেনের সাথে সাথে সে-ও কেন পিস্তলটা বের

করেনি সেজন্যে খুব সম্ভব দুঃখ হচ্ছে ওর এখন। কিন্তু এখন আর পিস্তল বের করা যায় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, অসহায় বোধ করছে লোকটা।

ইরিনের দিকে চাইল রানা। রানার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহের বিন্দুমাত্র ছিটেফোঁটাও নেই।

'তোমার দাবার বোর্ডের রাণী একেবারেই বিগড়ে গেছে, মাগেনথেলার। তোমার উপপত্নী ঘুমোচ্ছে এখন আরেকজনের সাথে। সুযোগ পেলেই…'

'উপপত্নী!' এবার সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্য হারাল কর্নেল ডি গোল্ড। 'ইরিনকে তুমি বলছ মাগেনথেলারের কেপ্ট?'

'যাকে বলছি সে তো রাগ করছে না কথাটা শুনে। কেন? তার কারণ কথাটা স্বীকৃত সত্য। কিন্তু ইদানীং রেভারেন্ড রজারের সাথে ভাবটা তার অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আত্মার মিল পেয়েছে ও সাইকোপ্যাথ বার্যিনির মধ্যে। চমৎকার ঘোল খাইয়েছে ইরিন আপনাকে, কর্নেল। পুরোটা ব্যাপারই প্ল্যান করা। নেশার কবলে পতিত অসহায় বালিকা ছিল না ও কোনদিনই। হাতের দাগগুলোও নকল। ওর মানসিক বয়স আট বছরের শিশুর সমান নয়, খোদ শয়তানের সমান। এবং মানুষটা শয়তানের দ্বিগুণ পাজি।'

'কী জানি,' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ডি গোল্ড। 'কিছুই ঢুকছে না আর আমার মাথায়।'

'তিনটে ব্যাপারে মাগেনথেলারের প্রয়োজন ছিল ইরিনকে,' সহজ করে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'ওই রকম একটা মেয়ে যার, নিমেষে সে সন্দেহাতীত চরিত্রে পরিণত হয় সবার কাছে। মেয়েটার অবস্থার কথা জানলে যে-কেউ ধরে নেবে যে ড্রাগ রিঙ ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে একান্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে মাগেনথেলার, যেমন করে হোক প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় সে যারা ওর মেয়ের সর্বনাশ করছে তাদের ওপর। দ্বিতীয়ত, নিকোলাস রজারের সাথে মাগেনথেলারের যোগাযোগের একমাত্র সূত্র ছিল ইরিন। রজারের সাথে মাগেনথেলারের দেখা করবার তো প্রশ্নই ওঠে না, টেলিফোন বা চিঠিতেও যোগাযোগ করা নিরাপদ মনে করেনি ওরা—ইরিনের মাধ্যমে চলত আদানপ্রদান। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী যে কাজটা করত ইরিন, সেটা হচ্ছে ড্রাগ সাপ্লাই। হাইলারে গিয়ে খালি পুতুল বদলে হেরোইন ভরা পুতুল নিয়ে আসত, ভন্ডেল পার্কের ভ্যানে সে পুতুল বদলে নিত একই চেহারার আরেকটা পুতুলের সাথে। এইভাবে অপূর্ব এক পুতুল খেলা দেখাচ্ছিল সে গত তিন বছর ধরে। কিন্তু ছোট্ট একটা ভুল করেছিল এই আশ্চর্য প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। চোখে বেলেডোনা ড্রপ দিয়ে অ্যাডিক্টের মত চকচকে অথচ অন্তঃসারশূন্য ভাবটা আনবার চেষ্টা করেছিল সে! তখন বুঝিনি, কিন্তু পরে আরও দুই-একজন নেশাখোরের চোখ দেখে টের পেয়ে গেলাম আমি ওর অভিনয়। টের পেলাম, ও আসলে পালিতা কন্যা নয়, মাগেনথেলারের প্রেমিকা। বুঝলাম আপন ভাই ও স্ত্রীকে হত্যা করেছিল মাগেনথেলার এই ইরিনকে পাওয়ার জন্যেই।'

'কবে…কবে টের পেলেন যে আমি এর সাথে জড়িত?' জিজ্ঞেস করল

মাগেনথেলার। ভুরুজোড়া কৌতুকের ভঙ্গিতে সামান্য কুঁচকে আছে।

'অনেক দেরিতে,' বলল রানা। 'সবই বুঝি আমি, কিন্তু একটু দেরিতে। পুলিস কার দেয়া হয়েছিল আমাকে আপনারই বুদ্ধিতে। মনে আছে? তারপর থেকে আপনারা আর আমার ওপর নজর রাখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কারণ, গাড়িতে লুকিয়ে রাখা ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে আমার গতিবিধি নখদর্পণে রেখেছিলেন আপনি সর্বক্ষণ। কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম তখনি…'

ঠিক এমনি সময়ে ঝট করে রানার দিকে ফিরল কর্নেল ডি গোল্ড। বোকার মত প্রশ্ন করে বসল, 'তাহলে? যদি আগে থেকেই সব জানবেন, তাহলে এইরকম অরক্ষিত অবস্থায় এখানে…'

প্রমাদ গুণতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময়ে ওকে উদ্ধার করল ইরিন। হঠাৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভ্যাজর ভ্যাজর একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' সোজা চাইল মাগেনথেলারের চোখের দিকে। 'এই দুটোকে খতম করে দিলেই তো চুকে যায়। আর বাজে সময় নষ্ট না করে…'

'দাঁড়াও!' ইরিনকে পিস্তলটা একটু উপরে তুলতে দেখে বাম হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করল মাগেনথেলার। রানার দিকে এগিয়ে এল এক পা। বিস্মিত হলো রানা লোকটার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে। জরুরী পয়েন্টটা ধরতে পেরেছে সে ঠিকই। জিজ্ঞেস করল, 'সেই জন্যেই তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করেছিলে কোড ওয়ার্ড মাদাগাস্কারের কথা। তুমি জানতে যে ওই কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করে সোহানা চৌধুরীকে ওর হোটেল কামরা থেকে বের করে আনতে পারি আমরা। তার মানে…'

পরিস্থিতিটা হাতের মুঠো থেকে ফস্কে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বাধা দিল রানা মাগেনথেলারকে।

'অত মানে আর এখন খুঁজে কি লাভ? বেকায়দা মত আটকে ফেলেছ আমাদের। তোমার প্রেয়সী অস্থির হয়ে উঠেছে গুলি করবার জন্যে! খুন যখন করতেই হবে, ওকে অনুমতি দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছে লোকটা,' ইরিনের মুখে দেঁতো হাসি।

'দাঁড়াও। এক সেকেন্ড। ভাবতে দাও আমাকে। তুমি জানো যে আমিই ড্রাগরিঙের চীফ, তারপরেও এমন অরক্ষিত অবস্থায় ঢুকেছ কেন তুমি এই মৃত্যুফাঁদে?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মাগেনথেলার রানার চোখের দিকে। 'বাঁচবার পথ না থাকলে…'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি তোমার সুন্দরী প্রেমিকাকে,' জোর করে হাসি টেনে আনল রানা ওর ক্ষতবিক্ষত মুখে। ফিরল ইরিনের দিকে। 'গুলি করো, আপত্তি নেই, তবে এর মধ্যে খানিকটা "কিন্তু" রয়েছে। আমাকে আগে মারবে, না আর কাউকে—সেটা বুঝে নেয়া দরকার প্রথমে। এই ঘরে আমার চেয়েও তোমাদের বড় শত্রু আরও কেউ থাকতে পারে—দেখো তো চেনা যায় কিনা?'

অবাক দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে চাইল ইরিন। শুধু ইরিনই নয়, ঘরের প্রত্যেকেই তাই করল। রানা ছাড়া। সোজা সোহানার চোখের দিকে চাইল

রানা। মাথাটা সামান্য একটু ঝুঁকল ওর ইরিনের দিকে। সহজ ভঙ্গিতে ইরিনের দিকে চাইল একবার সোহানা। রানা বুঝল, ওর বক্তব্য পরিষ্কার অনুধাবন করতে অসুবিধে হয়নি সোহানার।

এইবার শেষ অস্ত্র ছাড়ল রানা।

'গর্দভের দল!' বলল সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। 'সহজ কথাটা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে তোমাদের! ভেবে দেখার দরকার মনে করছ না একবার, এত খবর আমি পেলাম কোত্থেকে? খবর দেয়া হয়েছে আমাকে। তোমাদেরই একজন দিয়েছে আমাকে সব খবর। এমন একজন, যার কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছি আমি ভয় দেখিয়ে। সাধারণ ক্ষমার লোভে যে ভাসিয়ে দিয়েছে তোমাদের বানের জলে। এখনও আঁচ করতে পারছ না? আরে…ভলেনহোভেন!'

তাজ্জব হয়ে চাইল সবাই ভলেনহোভেনের দিকে। মুহূর্তের জন্যে বোকা বনে গেছে যেন সবাই, বুঝে উঠতে পারল না রানার এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করা যায় কি যায় না। ভলেনহোভেনের বিস্ফারিত দুই চোখে অবিশ্বাস। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। সেই হাঁ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করল লোকটা রানার গুলি খেয়ে। ছোট্ট লিলিপুট পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে রানার হাতে—কড়াৎ করে মৃত্যু বর্ষণ করেছে। সশস্ত্র ব্যক্তিকে শুধু জখম করবার ঝুঁকি নিতে পারেনি রানা, শেষ করতে হয়েছে এক গুলিতেই। লাশটা হুড়মুড় করে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়বার আগেই খপ করে ইরিনের পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলল সোহানা, ধরেই জুডোর কায়দায় হিপ থ্রো করল। ছিটকে গিয়ে দরজার বাইরে লোডিং প্ল্যাটফর্মের উপর আছড়ে পড়ল ইরিন, পতন ঠেকাবার চেষ্টা করল কিছু একটা আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কিছুই বাধল না হাতে। রেলিং নেই লোডিং প্ল্যাটফর্মে। মর্মভেদী, তীক্ষ্ণ চিৎকার দ্রুত মিলিয়ে গেল নিচের দিকে।

এদিকে কর্নেল ভ্যান ডি গোল্ডকে মাগেনথেলারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখতে পেল রানা আড়চোখে। মাগেনথেলারের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে সে। সফল হলো কি হলো না দেখবার সময় নেই, লুকা বার্যিনিকে পিস্তল বের করবার জন্যে পকেটে হাত দিতে দেখেই ডাইভ দিল সে সামনের দিকে। পিস্তল বের করে ফেলেছে সে ঠিকই, কিন্তু সেটা ব্যবহার করবার আগেই চেয়ার উল্টে পড়ে গেল পেছন দিকে। যখন উঠে দাঁড়াল, পিস্তল অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর হাত থেকে। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে পেছন থেকে রানার বাম হাতটা গলা পেঁচিয়ে ধরায়, দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

উঠে দাঁড়িয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। দরদর করে রক্ত ঝরছে কর্নেল ডি গোল্ডের কপাল থেকে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল জখমটা মারাত্মক কিছু না। ঠিক রানার মতই পেছন থেকে ডি গোল্ডের গলা পেঁচিয়ে ধরে রয়েছে ইন্সপেক্টর মাগেনথেলার। দুজনের পিস্তল তাক করে ধরা রয়েছে দুজনের দিকে, কিন্তু গুলি করলে মারা পড়বে নিজেরই লোক।

'তুমি জানো, মাসুদ রানা, লুকা বার্যিনির মৃত্যুতে কিছুই এসে যাবে না আমার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাগেনথেলার, 'এবং আমি জানি, তোমার

জেদের জন্যে মারা পড়ুক কর্নেল, সেটা তুমি কিছুতেই চাইতে পারো না। আমি চলে যাচ্ছি। যদি বাধা দাও, মারা পড়বে ডি গোল্ড। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পারছি, বাধা না দিলেই বরং মারা পড়বে কর্নেল।'

'আমি কথা দিচ্ছি, মেজর রানা।' অনুনয়ের মত শোনাল মাগেনথেলারের কণ্ঠ। 'আমাকে যদি এখন থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে দাও, গাড়িতে উঠেই ছেড়ে দেব আমি কর্নেলকে।'

'তোমাকে যদি বিশ্বাস করতাম, তবু তোমার কথায় রাজি হতাম না আমি।'

'এটা আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন, মাসুদ রানা।' খেপে উঠল মাগেনথেলার! 'বেপরোয়া আমি এখন। তুমি বুঝতে পারছ না…'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, মাগেনথেলার। আসলে তুমিই বোঝোনি কিছু। তোমাকে পালিয়ে যেতে দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ থেকে এতদূর কষ্ট করে আসিনি আমি, হাঁদারাম! পালাবার সব পথ বন্ধ। এক পা নড়লেই গুলি খেয়ে মারা যাবে তুমি।'

'কি করে?' কেঁপে গেল মাগেনথেলারের কণ্ঠ।

'আরও একটা পিস্তল তাক করে ধরা রয়েছে তোমার দিকে।' ওর চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল রানা।

'অসম্ভব! সোহানা চৌধুরীর কাছে পিস্তল নেই।'

'কে বলল?' হাসল রানা। 'ভয়ে তোমার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে, মাগেনথেলার। অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার, আমি তোমাদের ফাঁদে ঢুকিনি, তুমিই ঢুকেছ আমাদের ফাঁদে। তুমি যে 'মাদাগাস্কার' শব্দটার সাহায্যে সোহানাকে ধরে আনবার ব্যবস্থা করবে সেটা জেনেই তোমার সামনে উচ্চারণ করেছিলাম আমি শব্দটা আজ সকালে। সোহানা যখন এসেছে, প্রস্তুত হয়েই এসেছে। চেয়েই দেখো না, অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর খোঁপাটা—তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। চারফুট তফাত থেকে মিস হবে না ওর গুলি।'

কথাটা বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারল না মাগেনথেলার কয়েক সেকেন্ড। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে যখন দেখল, চারফুট নয়, ঠিক চার ইঞ্চি দূরে স্থির হয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা লিলিপুট পিস্তলের মুখ। মুহূর্তে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য হয়ে গেল মাগেনথেলারের চেহারাটা, নিবে গেল চোখের জ্যোতি।

'কাজেই দয়া করে হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে ছেড়ে দাও কর্নেলকে। এক ইঞ্চি নড়লেই গুলি খাবে কপালের পাশে।'

হাত থেকে ছেড়ে দিল মাগেনথেলার পুলিস কোল্ট অটোমেটিকটা। এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দিয়ে রানার পিস্তলের সামনে থেকে সরে দাঁড়াল কর্নেল, পকেট থেকে বের করল দুইজোড়া হ্যান্ডকাফ। মাগেনথেলারের কোমর থেকে রানার পিস্তল আর নিজের রিভলভারটা বের করে নিয়ে রানার দিকে চাইল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে।

'আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, মেজর মাসুদ রানা। শুধু

একটা কথা জানতে চাই—সত্যিই কি আপনার চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল আপনার সহকর্মীকে হে-ফর্ক দিয়ে? সত্যিই কি মারিয়া ডুক্রজকে...'

'সত্যি।' দপ করে জ্বলে উঠল রানার দুচোখ। কিন্তু পলকের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যে কথা বলি না আমি।'

'সেক্ষেত্রে আমি মনে করি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার আপনার আছে। লুকা বার্যিনি যদি পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়ে, আমার আপত্তি নেই।'

'আমার আছে,' বলল রানা। 'হত্যা করবার নেশা নেই আমার কর্নেল। আমি সাইকোপ্যাথ নই। বিচার দেখতে চাই আমি ওদের। খানিক আগে মিথ্যে হুমকি দিয়েছিলাম আমি, ভাব দেখিয়েছিলাম যেন এক্ষুণি গুলি করতে যাচ্ছি...'

'বুঝতে পেরেছি। আপনি চাইছিলেন, স্ব-মূর্তি ধারণ করুক মাগেনথেলার। ইরিন যে র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেটা টের পেলেন কি করে?'

'টের পাইনি। আমি কেন সোহানাও বোধ হয় জানত না যে ওখানটায় লুকিয়ে রয়েছে ইরিন তামাশা দেখবার জন্যে। যাই হোক, ভালই হয়েছে—নাটকের শেষ দৃশ্যে সব শিল্পীর উপস্থিতিতে চমৎকার জমে গেল শেষটুকু।'

রানার নির্দেশে বিশালবপু ভলেনহোভেনের দুইহাতে পরাল কর্নেল দুটো হ্যান্ডকাফের একটা কড়া। খালি কড়া দুটো পরিয়ে দেয়া হলো একটা লুকা বার্যিনির, অন্যটা মাগেনথেলারের একেকটা হাতে। নিরস্ত্র করা হয়েছে দুজনকেই। দুজনে মিলে প্রাণপণ শক্তিতে টানাহেঁচড়া করলেও কয়েকফুটের বেশি নড়াতে পারবে না ওরা ভলেনহোভেনের বিপুল ধড়।

দ্রুতহাতে কাপড় পরে নিয়েছে সোহানা ইতিমধ্যে। তিনতলার প্রহরীটাকে একটা খুঁটির সাথে আচ্ছা করে কষে বেঁধে নেমে এল ওরা রাস্তায়। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ইরিনের লাশ। ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে গেল ওরা ভ্যানের উদ্দেশে। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে থামল রানা।

'আমরা বরং এখান থেকেই বিদায় নিই, কর্নেল। আমাদের কাজ শেষ। বাকিটুকু আপনি একা পারবেন না?'

'বাকিটা কি রেখেছেন, বলুন?' হাসল ডি গোল্ড। 'আমার কাজ তো শুধু ওয়েরলেসে হেডকোয়ার্টারে খবর দেয়া। আর সবই তো সেরে দিয়েছেন আপনি একাই। ঠিক আছে, যান। সকাল থেকে যে ধকল গিয়েছে আপনার উপর দিয়ে...'

'সকাল নয়, রাত দুটো থেকে। এখন কাহিল লাগছে খুব।'

'ঠিক আছে, বিশ্রাম করুন গিয়ে। আজ রাতের মধ্যেই যতগুলোকে পারি অ্যারেস্ট করে ফেলব।' রানার কাঁধের উপর হাত রাখল কর্নেল। 'অলরাইট, ব্রেভ ইয়াংম্যান। কাল দেখা হবে আবার। গুড নাইট।'

কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ড্যামের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা দুজন। দেড়শো গজ যেতে না যেতেই সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল ওরা। প্রবলবেগে ছুটে আসছে কয়েকটা গাড়ি। সাঁই সাঁই করে ওদের পাশ কাটিয়ে ভলেনহোভেন অ্যান্ড কোম্পানীর দিকে ছুটে গেল ছয়-সাতটা ট্রাক। ট্রাক ভর্তি ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিস।

পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা আর সোহানা। আবার হাঁটছে। বেশ কিছুদূর হাঁটবার পর সোহানা বলল, 'মারিয়ার জন্যে বড় কষ্ট লাগছে, রানা। কিছুতেই ভুলতে পারছি না ওকে।'

'এইজন্যেই আমাদের সার্ভিসে কারও সাথে মাখামাখি করতে বারণ করা হয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রানার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সোহানা, 'তুমি এই বারণ মেনে চলো?'

'চেষ্টা করি।'

'তাই বুঝি এড়িয়ে চলো আমাকে?'

'চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কই?'

'পারো না?'

খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল রানা।

'না।'

* * * *